শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

SHESH PRISTHAY DEKHOON
[TURN TO BACK PAGE]
A novel by Bimal Mitra
Published by: Ananda
Publishers Private Limited
Calcutta-9

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : শ্রীঅজিত গুপ্ত

প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

পূর্বপাঠ

১৯৪৫ সালের ৫ই আগস্ট হিরোশিমা সহরের মাথার ওপর প্রথম আণবিক বোমা পড়ে। এ আজ থেকে আটাশ বছর আগেকার ঘটনা। আর ঠিক সেই একই তারিখে এই কলকাতা সহরে এক বিত্তবান সংসারের বংশধর হয়ে জন্মগ্রহণ করে এই কাহিনীর নায়ক লোকনাথ।

এই লোকনাথের জন্ম আর সেই আটাশ বছর আগের আণবিক বোমার পতনের মধ্যে কোনও যোগসূত্র ছিল কিনা কে জানে, তবে লোকনাথ যখন বড় হলো তখন পৃথিবীর এই চরমতম পাপের বিবরণ পড়ে তার নিজের মনেও এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। তার মনে হলো আটাশ বছর আগে মানুষ যে-পাপ করেছে তার জন্যে কারোর-না-কারোর অশৌচ পালন করা অপরিহার্য। তাই সমগ্র মানুষ-জাতির হয়ে সে একদিন এক মহা-অশৌচ ব্রত আরম্ভ করলে। আড়াই হাজার বছর আগে যেমন আর এক দেশের আর এক রাজপুত্র বিলাস ঐশ্বর্য সিংহাসন সব কিছু ত্যাগ করে পথে নেমেছিলেন, এই লোকনাথও এ-যুগে তেমনি আর একবার ঐশ্বর্য আরাম নিরাপত্তা ত্যাগ করে একদিন পথে নামলো। উদ্দেশ্য দু'জনেরই একঃ মানুষের কল্যাণ!

সে-যুগে কপিলাবস্তু নগরের রাজপুত্র অক্লান্ত তপস্যার পর নির্বাণ লাভ করেছিলেন। সিদ্ধার্থ একদিন তথাগত বুদ্ধদেব হতে পেরেছিলেন।

কিন্তু লোকনাথ? এ-কাহিনীর লোকনাথ কি শেষ পর্যন্ত লোকনাথ হতে পেরেছিল? এ যুগে কেউই কি তা পারে? এই বিজ্ঞান-সর্বস্ব জড়বাদী আণবিক যুগে তা পারা কি সম্ভব?

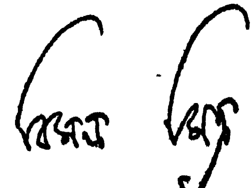
লোকনাথের এই অশৌচ-পালনের কৃচ্ছ্রসাধনের কাহিনীই 'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন' এর কাহিনী। এই সংগ্রামে সাফল্য এসেছিল না তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হলো লোকনাথের সংগ্রাম। যে মানুষ নারায়ণকে সারথি করে সে কখনও অক্ষৌহিণী সেনাকে ভয় করে না। সংগ্রামও কখনও একদিনে বা একযুগে শেষ হয় না। আর সে সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত জয় হবে না পরাজয় হবে বর্তমান কালও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। কারণ বিচারকের চূড়ান্ত রায় কখনও প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা থাকে না, থাকে শেষ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে।

তাই লোকনাথ সত্যিই লোকনাথ হতে পেরেছে কি না তা জানতে গেলে মহাকালের মহা-ইতিহাসের শেষ পৃষ্ঠা দেখতে হবে। সে মহাকালেরও শেষ পৃষ্ঠা, ইতিহাসেরও শেষ পৃষ্ঠা। অর্থাৎ আমাদের এই বিশ্বস্রষ্টার যে বিরাট পাণ্ডুলিপি আমরা পড়ছি তারই শেষ পৃষ্ঠা।

সেই শেষ পৃষ্ঠাতেই লেখা আছে জয় কারঃ নারায়ণের না অক্ষৌহিণী সেনার।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গের সতর্কতার জন্যে জানাই যে সম্প্রতি ৮০ খানিরও বেশি উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নামযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠক-মহলে আমার জনপ্রিয়তার ফলেই এই দুর্ঘটনা সম্ভব হয়েছে। ওনামে কোনও দ্বিতীয় লেখক নেই। একজন পুরো দাগী আসামীরই এই কীর্তি। পাঠক-পাঠিকাবর্গের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন এই যে, একমাত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাড়া আমার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে। আমার বই কেনবার আগে তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে সেদিকে দৃষ্টি দেন।



এই লেখকের এ-যাবৎ লেখা বইয়ের সম্পূর্ণ তালিকা

এর নাম সংসার
চার চোখের খেলা
সাহেব বিবি গোলাম
সাহেব বিবি গোলাম (নাটক)
একক দশক শতক
একক দশক শতক (নাটক)
কড়ি দিয়ে কিনলাম
বেগম মেরী বিশ্বাস
শ্রেষ্ঠ গল্প
সখী সমাচার
সাহিত্য বিচিত্রা
মিথুন লগ্ন
নফর সংকীর্তন
ও হেনরির গল্প (অনুবাদ)
ইয়ার্লিং (অনুবাদ)
মন কেমন করে
অন্যরূপ
নিশিপালন
কন্যাপক্ষ
সরস্বতীয়া
বরনারী (জাবালি)
চলো কলকাতা
বেনারসী
কুমারী ব্রত
আমি
রাগ ভৈরব
আসামী হাজির
দু চোখের বালাই
পরস্ত্রী
কলকাতা থেকে বলছি
গল্পসম্ভার
গুলমোহর
রানী সাহেবা
কথাচরিত মানস
কাহিনী সপ্তক
এক রাজা ছয় রানী
প্রথম পুরুষ
মৃত্যুহীন প্রাণ
টক ঝাল মিষ্টি
পুতুল দিদি
মনে রইলো
হাতে রইল তিন
দিনের পর দিন
শনি রাজা রাহু মন্ত্রী
তোমরা দু'জন মিলে
তিন ছয় নয়
নিবেদন ইতি
রং বদলায়
সুয়ো রানী
নবাবী আমল
নট্‌নী
স্ত্রী
বিনিদ্র
কেউ নায়ক কেউ নায়িকা
যে যেমন
চাঁদের দাম এক পয়সা
ফুল ফুটুক
লজ্জাহরণ

একজন বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক বলেছেন, 'গল্প দিয়ে তো গল্প লেখা অনেক সহজ কিন্তু গল্প না দিয়ে গল্প লিখতে ক'জন পারেন ?'

এ যেন অনেকটা সেই 'চুল না ভিজাবি সিনান করিবি ভাবিনি ভাবের দেহা।' চুল ভিজিয়ে স্নান করতে তো সবাই পারে, কিন্তু চুল না ভিজিয়ে স্নান ? সারা জীবন কেবল গল্প-উপন্যাসই লিখে এলাম, কিন্তু তবু কি শুধু পাঠকদের গল্পই শুনিয়েছি ? ছোট-বেলায় পড়েছি কথা-সরিৎ-সাগর, তারপর 'ঠাকুরমার ঝুলি', তারপর বঙ্কিমচন্দ্র, তারপর রবীন্দ্রনাথ, আর তারপর শরৎচন্দ্র। এ-সব পড়বার সময় কখনও মনে হয়নি যে গল্প পড়ছি। বরাবর পড়বার সময় এই উপলব্ধিটা হয়েছে যে এ-সব আমারই কথা, তফাত শুধু এই যে এটা অন্যলোকের কলমে লেখা হলেও আসলে এর একমাত্র নায়ক আমিই। আমি ছাড়া আর কেউ নয়।

কিন্তু এবার এই উপন্যাস লেখবার সময় কেবল মনে হচ্ছে, এই যার কথা আমি এবার লিখছি, যার নাম শ্রীলোকনাথ রায়, যে এই সেদিন পর্যন্তও অটো-ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কস্-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিল, যার সঙ্গে এক ক্লাশে একই স্কুলে বহু বছর পড়ে এসেছি, যে এম-এতে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হয়েছিল, বড়লোকের ছেলে বলে এককালে অহঙ্কারে যার মাটিতে পা পড়তো না, এ পড়বার সময় কারো কি এই ভুল হবে যে আমি শুধু গল্পই শোনাচ্ছি ?

সত্যি বলছি, এ আমার কপালেরই দোষ। আমি আজ পর্যন্ত যা-কিছু লিখেছি, সেই সব কিছুর সম্বন্ধে পাঠকদের একটি চিরস্থায়ী জিজ্ঞাসা—এটা কি সত্যি ঘটনা ?

প্রত্যেকবার এই প্রশ্ন শুনে আমার অত্যন্ত খারাপ লাগে।

প্রত্যেকবারই ভয় হয়, হয়ত সত্যিই আমি গল্প লিখে ফেলেছি। নইলে, এমন প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগবে কেন? এবারও যদি এই উপন্যাস পড়ে কেউ প্রশ্ন করে বসেন, এও কি সত্যি ঘটনা? আমার এখন থেকেই ভয় করছে, হয়ত এবারও সেই একই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। লেখকরা কাল্পনিক উপন্যাসকে মহত্ত্বের মর্যাদা দেবার জন্যে সেকালে গল্পের শুরুতে ব্র্যাকেটে লিখে জানিয়ে দিত যে এটা 'সত্য ঘটনামূলক কাহিনী,' কিন্তু এ-যুগে সে-নিয়ম উল্টে গেছে। এ-যুগে বানানো গল্পও সত্য-ঘটনামূলক কিনা এ-প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে লেখককে নাজেহাল হতে হয়।

না, এ উপন্যাস গল্পের উপন্যাস নয়। কারণ লোকনাথ রায়ের জীবনেই কোনও প্রচলিত গল্পের উপাদান নেই। লোকনাথকে নিয়ে তাই গল্প লেখা যায় না।

তবু যে লোকনাথকে নিয়ে এই উপন্যাস লিখছি, এর পেছনেও একটা ছোট ঘটনা আছে। কারণ, সত্যিই লোকনাথ আমাদের মধ্যে একটা ব্যতিক্রম। এই গতানুগতিকের সংসারে আগেও বহু লোক ব্যতিক্রম হবার চেষ্টা করেছে। কেউ দাড়ি রেখে, কেউ দাড়ি কামিয়ে, কেউ গোঁফ রেখে, কেউ-বা গোঁফ না রেখে, কেউ পেট-কাটা ব্লাউজ পরে, কেউ উদ্বাস্তু হয়ে, কেউ উলঙ্গ হয়ে। ব্যতিক্রম হবার চেষ্টায় অনেকে সেকালে মেমসাহেব বিয়ে করেছে, কেউ খৃস্টান হয়েছে, আবার এখন যেমন অনেকে কমিউনিস্ট হয়, তেমনি তখন ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের দলে নাম লিখিয়ে ব্রাহ্ম হয়েছে। কেউ বাবড়ি চুল রেখেছে, কেউ বা মাথার চুল কামিয়ে ফেলেছে। কেউ বা রেখেছে লম্বা জুলফি।

কিন্তু আমাদের এই লোকনাথ সত্যি সে পথ নেয়নি। সে 'অটো-ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কস্'-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার হয়ে বেশ আরামেই ছিল। কিন্তু হঠাৎ সব ওলট-পালোট হয়ে গেল একদিন। ১৯৪৫ সালের ৫ই আগস্টের সকাল ৮টা ১৬ মিনিটের

একটা ঘটনা তার জীবনকে একেবারে অন্য খাতে বইয়ে দিলে। তার জীবন তচ্‌নচ্‌ করে দিলে।

এতদিন পরে কেন সেই লোকনাথকে নিয়ে যে গল্প লিখতে বসেছি, তারও একটা আপাত কারণ আছে বৈ কি। বর্ধমান থেকে ট্রেনে আসছিলাম। অফিসের কাজে সারাদিন ব্র্যাঞ্চ-অফিসে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না। বিকেল বেলার ট্রেনে উঠেছিলাম, উদ্দেশ্য সন্ধ্যের মধ্যেই কলকাতায় ফিরতে পারবো। ট্রেনে যখন উঠেছিলাম তখন তাতে বেশ ভিড়ই ছিল। আমি উঠলাম আর কামরা থেকে অনেক লোক বর্ধমানেই নেমে গেল। বাকি রইলাম শুধু আমরা তিনচারজন যাত্রী। পরস্পরের কারো সঙ্গেই কোনও কথা নেই। খানিকক্ষণ জানালার বাইরে চেয়ে আকাশ দেখা গেল। তাতেও ক্লান্তি এল। তারপর সঙ্গে আনা বইটা একবার পড়তে চেষ্টা করলাম। তাও খানিকপরে আর ভালো লাগলো না।

পাশের বেঞ্চে এক অচেনা ভদ্রলোক বসে ছিলেন চুপ করে। তাঁর হাতের কাছে একটা ইংরিজী খবরের কাগজ ভাঁজ করা পড়ে ছিল।

বললাম—আপনার খবরের কাগজটা একবার নিতে পারি?

ভদ্রলোক কাগজটা তাড়াতাড়ি আমার দিকে সবিনয়ে এগিয়ে দিয়ে বললেন—নিন্ না—

সারাদিন খবরের কাগজ পড়বার সময় পাইনি। অবশ্য জানতাম পড়বার মত খবরও তেমন কিছু থাকে না কাগজে। আর কী-ই বা খবর থাকবে! সেই বাংলা দেশ, সেই শরণার্থীর ভিড়, সেই খুনোখুনি, সেই মূল্যবৃদ্ধি, সেই পলিটিক্যাল নেতাদের পরস্পরবিরোধী বক্তৃতা, আর খান্ দু'তিন মজাদার ছবি, এই সব খবরই তো আজকাল ছাব্বিশ নয়া পয়সা দিয়ে আমাদের কিনতে হয়—ওটা আমাদের আধুনিক সভ্যতার এক অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য খেসারত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই খেসারত দিয়েই তো আমরা

আমাদের আধুনিক জীবনে সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না-চিন্তা-ভাবনা-শিক্ষা-অশিক্ষা-পাপ-পুণ্য সব কিছু কিনছি।

কিন্তু হঠাৎ একটা খবরে এসে থমকে দাঁড়ালাম।

—এ কোন্ লোকনাথ ? এ কাদের লোকনাথ ? এ আমাদের সেই চেনা লোকনাথ রায়, না অন্য কেউ !

উদগ্রীব আগ্রহে খবরটা পড়তে লাগলাম ঃ

"গতকাল সন্ধ্যেবেলা ষষ্ঠীতলা রোডের চৌমাথার ওপর এক সংঘর্ষের ফলে এক অজ্ঞাত যুবক আহত হয়। নিকটবর্তী থানায় খবর দেওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে এবং আহত যুবককে হাসপাতালে পাঠানো হয়। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে উক্ত যুবকের নাম লোকনাথ……"

এই পর্যন্ত লেখার পরই লেখা আছে। "টার্ন টু ব্যাক্ পেজ্" অর্থাৎ শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন।

তাড়াতাড়ি শেষ পৃষ্ঠাটা খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও শেষ পৃষ্ঠাটা পেলাম না। এক থেকে আট পৃষ্ঠা রয়েছে, কিন্তু নয় আর দশ পৃষ্ঠা অনুপস্থিত, কেউ যেন ছিঁড়ে নিয়েছে।

যে-ভদ্রলোকের কাগজ তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—হ্যাঁ মশাই, আপনার কাগজের শেষ পৃষ্ঠাটা কোথায় গেল ?

ভদ্রলোক নিজেও খুঁজলেন। শেষ পৃষ্ঠাটা কোথায় গেল আশে-পাশে চেয়ে দেখলেন। বেঞ্চের নিচে, সুটকেসের তলায়, কোথাও নেই। বললেন—হয়ত আসবার সময় বাড়িতেই কেউ ছিঁড়ে ফেলেছে, মেয়েদের তো কাণ্ড…

একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে ভদ্রলোক ঘটনাটাকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু আমি ঘটনাটাকে অমন তাচ্ছিল্য করতে পারলাম না। কারণ লোকনাথ ছিল এককালে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ! 'অটো-ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কস্'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, এম-এতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েও যে-ছেলে রাস্তায় টো-টো করে ঘুরে বেড়িয়েছে, গাড়ি থাকতেও যে পায়ে হেঁটে কলকাতা শহর চষে

ফেলেছে, এ কি সেই লোকনাথ রায় ? আর লোকনাথ নাম তো কারো কপিরাইট নয়। হাজারটা লক্ষটা লোকনাথ থাকতে পারে, হাজারটা লক্ষটা লোকনাথ রায়ও থাকতে পারে। এই কাগজের শেষ পৃষ্ঠাটা না পেলে তো সে-রহস্যের সমাধান হচ্ছে না। এখন এর শেষ পৃষ্ঠাটা পাই কোথায় ? সেই কলকাতার হাওড়া স্টেশনে না-পৌঁছলে তো পাবার উপায় নেই !

একবার সন্দেহও হলো। লোকনাথ কার কী ক্ষতি করেছিল যে, তাকে লোকে আঘাত করবে ? সেই সরযূ ? সেই যাদুগোপাল ? সেই নিমাই শা ? সেই বকুল ?

কিন্তু অনেক দেখে, অনেক ভেবে, অনেক পড়ে একটা জিনিস সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছি যে The world does not tolerate absolute truth যারা পৃথিবীর আলো নেভাতে চেয়েছে, তাদের জন্যে সবাই আছে। তাদের জন্যে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান আছে, কমরেড স্ট্যালিন আছে, প্রাইম মিনিস্টার চার্চিল আছে। কিন্তু লোকনাথ ? লোকনাথ চেয়েছিল আলো জ্বালাতে। তা আলো জ্বালাতে চাওয়া কি সংসারে এতই বড় অপরাধ ?

অথচ আমি যে-লোকনাথের কথা ভাবছি, এ হয়ত সে লোকনাথ নাও হতে পারে ! এ হয়ত লোকনাথ দত্ত, কিংবা লোকনাথ মিত্র, কিম্বা লোকনাথ সিংহ ! যতক্ষণ না শেষ পৃষ্ঠা পাবো, ততক্ষণ তো এ সন্দেহের নিরসন হবে না। কোথায় পাবো শেষ পৃষ্ঠা ? কলকাতায় পৌঁছোবার আগে কি শেষ পৃষ্ঠা পাবার কোনও উপায় আছে ? হাওড়া স্টেশনে পৌঁছতে তো আরো এক ঘণ্টা বাকি ! এই এক ঘণ্টা কী ধৈর্য ধরে থাকতে পারবো ?

মনে পড়লো, সেই লোকনাথ। সেই লোকনাথেরই আগে কত অহঙ্কার দেখেছি। ইংরিজীতে এম-এ পাশ করেছে তখন। যাকে সামনে পায় তাকেই জানোয়ার বলে মনে করে। যেন ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে বলে সে সকলের মাথা কাটবার অধিকার পেয়ে গেছে। দেখা হলে আমাদের চিনতে পারতো না। অনেক কষ্টে

যদিই বা চিনতো শেষ পর্যন্ত তো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলতো—কী রে, কী করছিস আজকাল ?

আমি তখন ছেলে পড়িয়ে কিছু রোজগার করবার চেষ্টা করছি।

লোকনাথ একটু সহানুভূতি দেখিয়ে বলতো—তোদের জন্যে দুঃখ হয় ভাই, যা অবস্থা, তোদের কিছু দোষ নেই, তোরাই বা কী করবি—

তারপর কোনও রকম ভাবে ঘুরিয়ে নিজের প্রসঙ্গটা তুলতো। বিলেত যাবার সব ব্যবস্থা নাকি তার পাকা হয়ে গেছে। শুধু আমেরিকা যাবে, না ইংলণ্ডে যাবে, না জার্মানিতে তাই এখনও ভেবে ঠিক করতে পারেনি। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, ভাল ছাত্র, তার ওপর সুপুরুষ চেহারা। তাদের বিখ্যাত ফার্ম 'অটো-ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কস্'। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবো এমন বাসনা আমাদের ছিল না।

তা হোক, আমাদের চেনা বন্ধুদের মধ্যে একজনও যে লোকের কাছে বলবার মত ছেলে আছে, তার জন্যে আমাদের গর্ব করবার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল। আমরা নিজের-নিজের মধ্যবিত্ত দুর্দশার বেড়াজালে আটকে পড়ে যখন একই বৃত্তের চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছি, তখনও লোকনাথের জন্যে মনে মনে একটা আশা পোষণ করেছি। ভেবেছি যাক্, তবু এমন একজন জানা বন্ধু আমাদের আছে যার কথা বলতে আমাদের মাথা উঁচু হবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম পৃথিবীর চারদিকের ঘটনাগুলো এত তাড়াতাড়ি আমাদের পরিচিত ইতিহাসের চেহারা বদলে দিতে লাগলো যে, সব সময় তার নাগাল পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো আমাদের পক্ষে। তাই লোকনাথের শেষটা যখন দেখলুম, তখন সত্যিই মনে হলো মানুষ সত্যিই বড় বিচিত্র জীব। তাই ভাবছিলাম, এই মানুষকে নিয়ে সত্যিই বড় মুশকিলে পড়া গেল। সত্যিই, এর কোনও হদিস পাবার উপায় নেই।

আমি ব্যক্তিগত জীবনে ছাত্রপড়ানো দিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিলুম, তারপর শেষ হয়েছে আজকের এখানে এসে। আর লোকনাথ আরম্ভ করেছিল জজ-ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে, কিন্তু শেষ করলো কিনা এই ষষ্ঠীতলা রোডে।

আমাকে দেখলে লোকনাথ প্রথম প্রথম এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতো। কিন্তু আমিই বা ছাড়বো কেন? বললাম—কী রে, আমাকে চিনতেই পারছিস না যে!

আগেকার সে-স্বাস্থ্য আর তখন ছিল না লোকনাথের। গায়ের রং তখন একটু ময়লা হতে শুরু করেছে। পরনের জামা-কাপড়ের মধ্যেও যেন আগেকার সেই জলুস আর নেই।

কিন্তু মানুষ ভাঙবে তবু মচকাবে না।

জিজ্ঞেস করলে—তোর টিউশানি কেমন চলছে রে আজকাল?

বললাম—আমি তো ও-সব আর করি না। এখন চাকরি করছি—

—চাকরি? কীসের চাকরি? তোর তো সাহিত্যিক হবার ইচ্ছে ছিল, শেষ পর্যন্ত চাকরি করতে হলো?

যেন আমার চাকরি হওয়া, আমার পোশাক-পরিচ্ছদের বহর দেখে বিস্ময়ের ঘোর সে লুকোতে পারছে না। নিজের বিরাগ ঢাকবার দুর্বল চেষ্টা করতে গিয়ে ঠোঁটে একটু হাসি আনবার ব্যর্থ প্রয়াস করলে।

পোস্ট্‌টার নাম শুনে মাইনে একটা আন্দাজ করতে পেরেছিল সে। কিন্তু কৌতূহল বড় মারাত্মক জিনিস। সে অনেক সময় মানুষকে নির্লজ্জ করেও তোলে। অবশ্য লোকনাথের বরাবরই এই রকম ঠোঁট-কাটা কথা। আগেকার লোকনাথ বরাবরই এই রকমই ছিল। দেখলাম তার বাইরের পোশাকের পরিবর্তন হলেও ভেতরে সে সেই আগেকার মতই আছে।

জিজ্ঞেস করলে—কত পাস?

আমার বিয়ের খুঁটিনাটি সংবাদও নিলে লোকনাথ। শুধু

আমার বিয়ের খুঁটিনাটিই নয়, ছেলে-মেয়েরও খবর নিলে। শ্বশুরের নামধামও জিজ্ঞেস করলে।

বললে—মাঝখান থেকে বিয়েটা মিছিমিছি করতে গেলি কেন? তুই তো এককালে বেশ চালাক-চতুর ছিলি বলেই জানতুম!

আমি লোকনাথের এ-কথার কোনও প্রতিবাদ করলুম না। বললাম—কোন্ দিকে যাবি তুই?

লোকনাথ বললে—যাবো কিড্ স্ট্রীটে—

বললাম—তাহলে আয়—

বলে তাকে আমার গাড়ির কাছে নিয়ে এলাম। বললাম—চল্ তোকে পৌঁছে দিচ্ছি—

এতটা বোধহয় সে আশা করেনি। ভবিষ্যৎ যার অনির্দিষ্ট, তার কাছে অন্যের মধুর বর্তমান অসহ্য ঠেকাই স্বাভাবিক।

হঠাৎ বলে উঠলো—দিশি গাড়ি কিনলি কেন? ফরেন গাড়ি পেলি না বুঝি?

একটু আমতা-আমতা করে বললুম—আমি কি আর গাড়ি কিনেছি ভাই, আমার গাড়ি কেনবার ক্ষমতা কোথায়, অফিস থেকে দিয়েছে তাই চড়ি—

গাড়িতে অনিচ্ছের সঙ্গেই চড়লো লোকনাথ। চড়ে বসে ভেতরটা ভালো করে দেখতে লাগলো। তারপর বললে—অফিস থেকে দিক আর যা-ই করুক, এঞ্জিনটা তো ভালো নয়, শব্দ হচ্ছে কেন? দিশি মেশিনের এই-ই একটা দোষ—

তার কথায় মনে হলো যেন অপরাধটা এঞ্জিনের নয়, আমার। অফিস থেকে আমার গাড়ি পাওয়াটাই অপরাধ।

সেই অপরাধের পাপস্খালন হিসেবে বললাম—ভিক্ষের চাল, তার আবার কাঁড়া আর আঁকাড়া—

কথাটা লোকনাথের ভালো লাগলো।

বললে—ঠিকই বলেছিস তুই। আমাদের বাঙালীরা চিরকাল ভিক্ষে করেই চালিয়ে গেল। হয় মোগলদের, নয় ইংরেজদের,

আর নয়তো মারোয়াড়ীদের—

কিড্ স্ট্রীট এসে গিয়েছিল। একটা বিরাট ফ্ল্যাট-বাড়ির সামনে আসতেই লোকনাথ বলে উঠলো—আমি এখানে নামবো ভাই—

বলে গাড়ি থামতেই লোকনাথ নেমে চলে গেল। কোথায় গেল, কেন গেল, কীসের দরকার তার, তা জিজ্ঞেস করার সময়ও সে দিলে না। একেবারে আচম্‌কা ঝড়ের মত উদয় হয়ে এক নিঃশ্বাসে সব কিছু তোলপাড় করে দিয়ে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। বলতে গেলে ঠিক যেন ম্যাজিকের মতন।

পাঁচ

এ পর্যন্ত যা ঘটলো তা আমার চোখের সামনেই। এর পর কী ঘটলো, তা আমার জানবার কথা নয়। কিন্তু নিয়তি এমনই এক নিষ্ঠুর শক্তি যে পরে আমি সবই জানতে পেরেছি।

আর লোকনাথ রায় ছিল এমনই এক বংশের সন্তান যার জীবনের চলা-ফেরা, চাল-চলন, গতি-বিধি লোকচক্ষুর অগোচরে থাকা প্রায় অসম্ভবই একরকম। এর কাছ থেকে ওর কাছ থেকে কানে ঠিক আসবেই। লোকনাথ ছিল ঠিক যেন আকাশের মত। যেখানে যেমন অবস্থাতে যে-দেশেই যাও, আকাশকে দেখতে পাবেই। তোমাকে আকাশ দেখতে পাক আর না-পাক, তুমি আকাশকে দেখতে পাবেই।

গাড়ি থেকে নেমে লোকনাথ একটা বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর আমার গাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলো। আমার গাড়ির পেছন দিককার লাল আলো দুটো আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তখন সেখান থেকে সরে এসে লোকনাথ আবার রাস্তায় নামলো। তারপর খানিকক্ষণ সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। কোথায় যাবে ঠিক করতে পারলে না সে। তারপর আস্তে

আস্তে উত্তর দিকের রাস্তাটা ধরে এগোতে লাগলো। দু'পাশে বিরাট বিরাট বাড়ি। অনেক বাড়ির সামনে আবার বাগান। এত বড়-বড় বাড়ি অথচ কোথাও কেউ কাউকে সস্তায় বাড়ি ভাড়া দেবে না। একটা ঘরও কাউকে ছেড়ে দেবে না কেউ কলকাতায়।

মোড়ের মাথায় এসে চারদিকের আলোর জাঁকজমকে ঝক্-মক্ করে উঠলো লোকনাথ। দূর ছাই, পরের গাড়িতে ওঠবার অপমানে এতক্ষণ মন-মরা হয়ে গিয়েছিল সে। এবার চারদিকের রোশনাই দেখে যেন একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলো। হাঁটতে হাঁটতে আরো এগিয়ে চললো লোকনাথ। পার্ক স্ট্রীট পেরিয়ে একটা ছোট পায়ে-চলা-গলি দিয়ে শর্ট কাট করতে হবে। তারপর কোথায় গিয়ে থামবে লোকনাথ তা তার জানা। সন্ধ্যেবেলা সেখানে অবশ্য বেশী ভিড় থাকে! তা থাক্। তাতে লোকনাথের কোনও অসুবিধে হবে না। তাকে বেশ খাতির করে বসাবে যাদুগোপাল। গরম-গরম আলুর চপ, বেগুনি, পেঁয়াজি খাওয়াবে। পয়সা দিতে চাইলেও যাদুগোপাল তা নেবে না। লোকনাথ তার দোকানে পায়ের ধুলো দিলেই সে কৃতার্থ হয়ে যাবে।

যাদুগোপালের দোকানটা একটা সিনেমা-হাউসের পাশে। একফালি দোকান হলে কী হবে, তারই ভেতরে কাঠের বেঞ্চিতে সার-সার লোক বসে খাচ্ছে। সকলের হাতেই শালপাতার ঠোঙা।

কিন্তু তাতে লোকনাথের অসুবিধে হবে না। লোকনাথ সকলকে ডিঙিয়ে একেবারে রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকে যাবে। যাদুগোপাল কখনও কখনও ভেতরে মাল তৈরি করার তদারক করে, আবার কখনও সামনে কাউণ্টারের কাছে এসে খদ্দের সামলায়।

যাদুগোপাল তার নিজের ছেলেকে বসিয়েছে কাউণ্টারে। কাউণ্টার মানে একটা উঁচু মাচা; মাচার ওপর বসে ত্রৈলোক্য মাল বেচে উঠতে পারে না, এত মালের খদ্দের।

এদিকে ত্রৈলোক্য মাল বেচে আর ভেতর থেকে অনাথ ঝুড়ি ভর্তি গরম গরম তেলেভাজা এনে বারকোষের মধ্যে উপুড় করে ঢেলে দেয়।

খদ্দেরদের হাতে তখন সময় নেই। গপ্ গপ্ করে কয়েকটা তেলেভাজা খেয়েই তারা সিনেমার ভেতরে ঢুকে পড়বে। পনেরো মিনিটের ইন্টারভ্যাল। তার মধ্যে এতগুলো লোককে সাপ্লাই দেওয়া মুখের কথা নয়।

লোকনাথ যখন সেখানে এসে দাঁড়ালো, তখন ভেতরে ঢোকবার রাস্তা বন্ধ। সবাই সবাই-এর ঘাড়ের ওপর হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

—ফুলকপির চপ্ আছে ভাই? ফুলকপির চপ্—?

ত্রৈলোক্যকে সব দিকে কান দিতে হয়। দুহাতে কাজ, কিন্তু চোখ আর কান খোলা।

—আছে বাবু, কত দেব?

কলকাতার এই সাহেব-পাড়ার পাঁচমিশেলি গলিতে এ দৃশ্য নিত্য-নৈমিত্তিক। কিন্তু সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ভোঁ-ভাঁ। তখন পাশের রেস্টুরেণ্টে হামানদিস্তেতে নেড়ে-বিস্কুট গুঁড়ো করবার ঢক্-ঢং আওয়াজ হয়। পিচের রাস্তার ফুটপাতের ওপরেই কেউ শিল-নোড়াতে বাটনা বাটতে শুরু করে দেয়। আর যাদুগোপালের দোকানের ভেতরে তখন উনুনে আঁচ দেওয়া শুরু হয়। সেই উনুনের ধোঁয়ায় ধোঁয়া হয়ে যায় গলিটা। তাতে প্রথম প্রথম সিনেমার মালিকপক্ষ থেকে আপত্তি উঠেছিল, কিন্তু সে আপত্তি টেঁকেনি।

টেঁকেনি যে, তার কারণ লোকনাথ।

লোকনাথ তখন নতুন খদ্দের। যাদুগোপালের মুখ-চেনা মাত্র। তার মুখ ভার দেখে লোকনাথ জিজ্ঞেস করেছিল—কী, হয়েছে কী?

যাদুগোপাল কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—বাবু, আমার দোকান উঠিয়ে দেবে বলছে ওরা—

লোকনাথ বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞেস করেছিল—ওরা মানে

কারা ?

—ওই যে সিনেমার বড়বাবু। সিনেমাটার তো হাত বদল হয়েছে; এখন যে নতুন মালিক, সে পুলিশের কাছে দরখাস্ত করেছে, করপোরেশন অফিসেও চিঠি লিখে দিয়েছে—

লোকনাথ খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললে—তোমার ওপর কোনও নোটিশ দিয়েছে করপোরেশন ?

—দিয়েছে, এই দেখুন—

বলে বাক্স থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে খুলে দেখালে। লোকনাথ চিঠিটা পড়লে।

যাদুগোপাল বললে—আমি লেখাপড়া জানি না বাবু, এই পঁচিশ বছর ধরে এখানে দোকান করে পেট চালাচ্ছি, আগে কোনদিন কেউ আমার নামে নালিশ করেনি—

লোকনাথ বললে—ঠিক আছে, আমি সব ঠিক করে দেব, তোমার কিছু ভাবনা নেই—

—খরচ হবে কত ?

লোকনাথ বললে—তা আমি কী করে বলবো। করপোরেশনের লোকের সঙ্গে কথা বলবো, তবে তো বলতে পারবো। তবে করপোরেশনের মাথাওয়ালারা তো সবাই আমার বন্ধুলোক, মনে হয় টাকা লাগবে না।

যাদুগোপাল তবু তার ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা বার করতে যাচ্ছিল, কিন্তু লোকনাথই বাধা দিলে। বললে—আরে, না না। এক্ষুণি কেন, আগে আমি ওদের সঙ্গে কথা বলে আসি, তারপরে দরকার হলে টাকা নিয়ে যাবো—

কিন্তু যাদুগোপালের তখন শিয়রে সংক্রান্তি।

বললে—না বাবু, আপনি দুশো টাকা নিয়ে যান, তারপরে যদি বেশি লাগে তো আরো না-হয় চেয়ে নেবেন—

শেষ পর্যন্ত যাদুগোপাল টাকাটা আবার নিজের ক্যাশবাক্সের মধ্যে তুলে রাখলে। কিন্তু তারপর থেকে তার তেলেভাজার দোকান

যেমন রমারম চলছিল তেমনি চলতে লাগলো।

লোকনাথ শুধু একদিন এসে জিজ্ঞেস করেছিল—তোমার আর কোনও চিঠি এসেছে করপোরেশন থেকে ?

যাতুগোপাল বলেছিল—না বাবু, আর কোনও চিঠি আসেনি।

লোকনাথ বলেছিল—আর চিঠি আসবে না—আমি কল্ টিপে দিয়েছি—

পাঁচ

এ-সব গোড়াকার ঘটনা। তার পরে কতদিন লোকনাথ যাতুগোপালের দোকানে এসেছে। কত খদ্দেরই তো যাতুগোপালের দোকানে আসে। সিনেমা থেকে ইনটারভ্যালে বেরিয়ে এসে গরম-গরম তেলেভাজা খায়। দামী দামী কোটপ্যান্ট-পরা চেহারা সকলের। সবাই মান্য-গণ্য। ছেলেছোকরা বুড়োমানুষ কেউই বাদ যায় না। কিন্তু লোকনাথের আলাদা খাতির। যাতুগোপালের কাছে লোকনাথ হলো আসল বাবু।

—এই যে বাবু এসে গেছেন।

ভিড় ঠেলে লোকনাথ একেবারে রান্নাঘরের ভেতরে তার আলাদা টুলের ওপর গিয়ে বসলো। বললে—কী খবর যাতু ?

ভিড় তখন একটু পাতলা হয়ে এসেছে। যাতুগোপাল একটা প্লেটে করে কচুরি সিঙাড়া, ডাল-বাদাম নিয়ে এসে দিলে।

বললে—নিন্ বাবু, গরম-গরম খেয়ে নিন্—

লোকনাথ যেন একটু রাগ করে প্লেটটা হাতে নিলে। বললে, —আবার রোজ রোজ এসব আনো কেন বলো দিকিনি ? তুমি গরীব মানুষ, তোমারও তো লোকসান হয় এতে—

—আর বাবু, আপনার আমি কী-ই বা উপকার করতে পারি ! আমার আর সাধ্যি কতটুকু ? ভিড়ের মধ্যে কত লোক পয়সা না দিয়ে তো সরে পড়ে, একা ত্রৈলোক্য সব দিক তো সামলাতে

পারে না—

লোকনাথ বললে—বাঃ, ডাল-বাদামটা তো বেশ খেতে হয়েছে—

যাদুগোপাল সে-কথায় উত্তর না দিয়ে ফিরে এসে বললে—জানেন বাবু, সেদিন এক কাণ্ড হয়েছে—

—কাণ্ড? কীসের কাণ্ড?

যাদুগোপাল বললে—একটা মেয়ে সেদিন আমার কাছে এসেছিল—

লোকনাথ অবাক হয়ে গেল। বললে—মেয়ে? তোমার কাছে মেয়েরা আসে কেন? তেলেভাজা খেতে?

—আরে না। তেলেভাজা খেতে তো অনেক মেয়েই আসে। তাহলে আর আপনাকে বলবো কেন? এ তা নয়। আমার কাছে চাকরি চাইতে এসেছিল!

বলে ঘটনাটার অস্বাভাবিকতায় যাদুগোপাল নিজেই হেসে উঠলো হো-হো করে—

হাসি থামিয়ে বললে—আজকে আবার আসবে বলেছে—

লোকনাথ বললে—কেন তোমার এখানে চাকরি খালি আছে নাকি?

যাদুগোপাল হেসে উঠলো—কী যে বলেন। কিন্তু বড় অভাবী মেয়েটা, কোথাও কোনও চান্স পায়নি, তাই শেষে আমার কাছে এসেছে—

যাদুগোপাল কথাগুলো বললে বটে, কিন্তু তখনও হাসছে। মজার কথা বলার সময় লোকের যেমন হাসি পায় তেমনি হাসি।

যাদুগোপাল বলতে লাগলো—তাহলে বুঝুন, দেশের কী-রকম অবস্থা—

লোকনাথ বললে—তুমি হাসছো যাদুগোপাল, আমার কিন্তু মনখারাপ হয়ে যাচ্ছে—

তারপর পকেট থেকে চার আনা পয়সা বার করলে। করে

বাড়িয়ে দিলে যাদুগোপালের দিকে।

যাদুগোপাল দুটো হাতের পাতা জোড়া করে লজ্জায় জিভ কেটে ফেললে।

বললে—ছি ছি, লজ্জা দেবেন না, কী যে করেন আপনি—

—তুমি পয়সা নেবে না? বলছো কী তুমি যাদুগোপাল? তুমি কারবার করতে বসেছো, না দান-ছত্র খুলেছ? আর আমার যদি নিতেই হয়, তাহলে চার আনা পয়সা নেব কেন? চার আনা পয়সা বাঁচিয়ে তুমি আমার দুঃখ ঘোচাতে পারবে? নাও—

বলে এক ধমক দিলে লোকনাথ।

যাদুগোপালের আর আপত্তি করবার সাহস রইলো না। পয়সা ক'টা নিলে। কিন্তু মনে মনে গজ-গজ করতে লাগলো—আপনি আমার যা উপকার করেছেন বাবু, তার দেনাই আমি জীবন-ভোর শোধ করতে পারবো না—

লোকনাথ তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। বললে—যাই—

বলে সামনের গলির চলমান ভিড়ের মধ্যে নেমে পড়লো। তখন বেশ সন্ধ্যের ঘোর লেগেছে শহরের রাস্তায়। ওদিকে ডালহৌসি স্কোয়ারের অফিস ছুটি হয়েছে। হরিদ্বারের গঙ্গার সেই পাথরের নুড়ির মত মানুষের স্রোত গড়িয়ে চলেছে রাস্তায়। লোকনাথের মতনই সব চেহারা। লোকনাথেরই সব ভগ্নাংশ এক-একটা। মানে একই লোকনাথ যেন হাজারটা লোকনাথ হয়ে সারা কলকাতাময় ছড়িয়ে পড়ছে।

যাদুগোপালের দোকানের কাউন্টারে তখন ভিড়টা একটু পাতলা হয়েছে। কিন্তু সেই পাতলা-হওয়া আসলে সাময়িক। একটু পরেই আবার সিনেমা ভাঙবে। সিনেমার সামনে তখন মানুষের কিউ-এর সরীসৃপ। সেই সরীসৃপ যখন অদৃশ্য হবে, সিনেমার দরজা নতুন করে খুলবে, তখন আবার যাদুগোপাল মাল সাপ্লাই করে কুলিয়ে উঠতে পারবে না।

—বাবুজী!

নেই নেই করেও কিন্তু কেনা-বেচা নিয়ে ত্রৈলোক্য একলা-হাতে তখন নতুন করে কড়ায় মাল ছেড়েছে। এক-একটা আলু-বড়া গরম তেলের ওপর পড়তেই বিরাট ফোস্কার মতন ফুলে ওঠে আর দেখতে দেখতে হলদে রংটা গোলাপী হয়ে ওঠে।

—বাবুজী !

যাদুগোপাল বাইরের খদ্দের সামলাতে সামলাতে সামনের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেছে। সেই ড্রাইভারটা ! আর খানিক দূরে রাস্তার ওপর সেই গাড়িটাও দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটা যেমন লম্বা তেমনি বাহারে। আর গাড়ির ভেতর সেই বুড়ীটাও বসে আছে।

—বাবুজী, এখানে দাদাবাবু এসেছিল ?

—দাদাবাবু ?

কথাটা বলেই মনে পড়ে গেল। বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, লোকনাথবাবু তো ?

—হ্যাঁ, মাঈজী এসেছে, গাড়িতে বসে আছে। মাঈজী আমাকে দাদাবাবুকে খুঁজতে পাঠিয়ে দিলে—

যাদুগোপাল বললে—দাদাবাবু এখানে ছিল বটে, কিন্তু এই খানিক আগেই তো বেরিয়ে গেছে।

—এখন কোথায় গেছে বলতে পারেন বাবুজী ?

যাদুগোপাল বললে—তা তো বলতে পারবো না ড্রাইভারজী, তোমার বাবুর তো কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই।

ড্রাইভারটা আর দাঁড়ালো না। আবার যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকেই চলে গেল। চৌরঙ্গীর পাশের রাস্তা। তার ওপর অফিস ছুটি হওয়ার ভিড়।

তা ভিড় শুধু মানুষেরই নয়, গাড়ির ভিড়ও আছে। আর কত রকমের গাড়ির বাহার ! ড্রাইভারটাকে গলির মধ্যে তেলেভাজার দোকানে পাঠিয়ে দিয়ে বসুমতী দেবী গাড়ির পেছন দিককার সিটে চুপ করে বসে ছিলেন। আর মানুষ আর গাড়ির পিল্‌পিল্‌-করা স্রোতের দিকে চেয়ে দেখছিলেন।

গল্প

খুঁজলে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এ-গল্পের শেকড় পাওয়া যাবে। কিন্তু তার দরকার নেই। লোকনাথ রায়কে এ-যুগের ছেলে বলে চিহ্নিত করাই ভালো। বলতে গেলে সে হলো বাগানের শেকড়হীন অলোকলতা।

মানে বাড়িতে যখন প্রথম নাতি হলো বসুমতী দেবী বলেছিলেন —তোর কপাল ভালো রে খুকী, আমার চেয়ে তোর কপাল ভালো। আমার প্রথম মেয়ে হয়েছিল, তোর হলো প্রথম ছেলে। দেখিস, এই ছেলেই তোর কপাল ফিরিয়ে দেবে—তোর ভালো হবে—

অথচ বসুমতী দেবীর কপাল যে কিসে খারাপ তা তখনও কেউ জানতো না। অত বড় বাড়ি, অতগুলো গাড়ি, অতগুলো চাকর, ঝি, দরোয়ান যাদের বাড়িতে, তাদের যে কপাল খারাপ এ-কথা কে বিশ্বাস করবে?

লোকনাথ যখন ছোট, দু' মাস মাত্র তার বয়েস, তখন থেকেই চাকর ঝিদের হিমসিম খেয়ে যেতে হতো তাকে মানুষ করা নিয়ে। একজন ঝি ছেলেটাকে পায়ের ওপর শুইয়ে সরষের তেল মাখাতো। একদিন বাড়ির ডাক্তার তা দেখে ফেলেছে।

বললে—এঃ, এঃ, এঃ, এ কী করছো? সরষের তেল মাখাতে কে বলেছে তোমাকে?

ঝি মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে নিচু গলায় বললে—আজ্ঞে, গৌরাঙ্গদিদি—

গৌরাঙ্গদিদি! সে আবার কে?

ডাক্তারবাবু রায়-বাড়ির অনেক টাকা খেয়েছে। সহজে ছাড়বার পাত্র নয়।

জিজ্ঞেস করলে—কে গৌরাঙ্গদিদি?

সরকার মশাইকে ডাকা হলো। বুড়ী সরকার! বুড়ী সরকার

আসতেই ডাক্তারবাবু বললে—খোকাকে সরষের তেল মাখাচ্ছে কেন? কে সরষের তেল মাখাতে বলেছে?

বুড়ী সরকার সেই একই প্রশ্ন করলে। জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ গো সিদ্ধেশ্বরী, তোমার নাম সিদ্ধেশ্বরী তো?

সিদ্ধেশ্বরীর তখন এ-বাড়িতে নতুন চাকরি হয়েছে। বুড়ী সরকারকেও সিদ্ধেশ্বরী সেই একই উত্তর দিলে! গৌরাঙ্গদিদিই বলেছে।

তাহলে ডাক্ গৌরাঙ্গদিদিকে। বুড়ী সরকার সমস্ত চাকর-ঝিকে চেনে। বুড়ী সরকারের কাছে এসেই সকলকে মাসকাবারের দিন মাইনে নিতে হয় হাত পেতে।

সেই গৌরাঙ্গদিদির কাছেও শেষ পর্যন্ত খবর গেল।

আসল নাম গৌরাঙ্গমণি। তা কর্তা-মার কানেও গেছে কথাটা।

বললে—কী হয়েছে রে পুঁটি? গৌরাঙ্গকে কে ডাকছে?

—সরকার মশাই ডাকছে।

তখন কর্তা-মার মেয়ে চানের ঘরে স্নান করছে আপন মনে। তার কানে এত হৈ-চৈ পৌছোয় নি।

চানের ঘর থেকে বেরোতেই বসুমতী দেবী বলে উঠলেন—ওরে বীণা, তোর ছেলের কী সর্বনাশ হয়েছে শোন—

—কী সব্বোনাশ হলো?

—সিদ্ধেশ্বরী তোর ছেলেকে সরষের তেল মাখাচ্ছিল,—

—তা সরষের তেল তো তুমিই মাখাতে বলেছিলে মা, রোজই তো তাই-ই মাখে—।

গৌরাঙ্গমণি এতক্ষণ অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে একপাশে চুপ করে শাস্তির প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুণছিল, এবার দিদিমণির কথায় তার ধড়ে প্রাণ ফিরে এল।

বললে—আমরা তো কত ছেলে বিইয়েছি, বরাবর তো সরষের তেলই মাখিয়ে এসেছি কর্তা-মা—

বসুমতী দেবী বলে উঠলেন—তুই থাম তো, তোকে আর বেশী কথা বলতে হবে না, তোর ছেলে আর বীণার ছেলে—?

তা বটে! কা'র সঙ্গে কা'র তুলনা করছে গৌরাঙ্গমণি। বসুমতী দেবী ধমকে উঠলেন—এখন ডাক্তারবাবুকে গিয়ে তুই সওয়াল করগে যা—

ডাক্তারবাবু এ-বাড়ির পুরনো চিকিৎসক। কর্তাবাবু থেকে কর্তাবাবুর বাড়ির সবাইকে বরাবর চিকিৎসা করে আসছে।

বললে—না, সে আগে যা হয়েছে তা হয়েছে, এখন থেকে অলিভ্ অয়েল মাখাতে হবে। একেবারে খাঁটি ইটালিয়ান অলিভ অয়েল—

বুড়ী সরকার পাকা লোক। ঘর থেকে কলম আর কাগজ নিয়ে এসে বললে—লিখে দিন ডাক্তারবাবু এতে, নইলে ভুলে যাবো—

সেই থেকে ঠিক হয়ে গেল অলিভ অয়েল মাখাতে হবে। বনেদী ঘরের নাতি। তার জন্যে বরাদ্দ হয়ে গেল খাঁটি অলিভ অয়েল। শুধু খাঁটি অলিভ অয়েলই নয়, সব কিছুই খাঁটি। খাঁটি দুধ, খাঁটি দুধের ছানা, খাঁটি চাল, ডাল, তেল, নুন ; তাছাড়া আছে, খাঁটি জল-হাওয়া।

এই খাঁটি অলিভ অয়েল মেখে, খাঁটি দুধ, খাঁটি জল-হাওয়া খেয়ে যখন রায় বাড়ির বংশধর একটু একটু করে সব জিনিস দেখতে শিখলো, শুনতে শিখলো, বুঝতে শিখলো, তখন একদিন দিদিমাকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—দিদিমা, ওটা কার ছবি? ওই চশমা চোখে, বুড়ো থুথ্থুড়ো?

বসুমতী দেবী বললেন—ওই হলেন মহাত্মা গান্ধী—নমস্কার করো—

দেয়ালে টাঙানো সব সার-সার ছবির বাহার। সারা ড্রয়িং রুমটা ছবিতে সাজানো। এ-বাড়ির একমাত্র আদুরে নাতি। ছবিগুলো যখন তোলা হয়েছিল, তখন নাতি হয়নি। নাতি জন্মায়নি।

তখন যে যে মহাপুরুষ এ-বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছিল, বুদ্ধি করে তাদের সকলের ফটো তুলিয়ে রেখেছিলেন কর্তাবাবু। তা ছাড়াও ছিল অন্য অনেক মহাপুরুষের ছবি। যিশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, চৈতন্য মহাপ্রভু, এমনি অনেক।

কর্তাবাবু ছিলেন সদাশয় পুরুষ। তিনি জানতেন একদিন তাঁর গৌরবগাথা নিয়ে কলকাতা শহরে তাঁর উত্তরপুরুষ গৌরবান্বিত বোধ করবে। বিরাট ব্যবসার পত্তন করে দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ইচ্ছে ছিল বংশানুক্রমে সেই ব্যবসা চলবে। আর শুধু চলবে নয়, সেই ব্যবসার সূত্রে কর্তাবাবুর নাম অক্ষয় হয়ে বিরাজ করবে চিরটা কাল।

লোকে কাগজে বড় বড় বিজ্ঞাপন দেখে জিজ্ঞেস করবে—এই 'অটো-ইনজিনিয়ারিং কোম্পানি'টা কাদের ?

উত্তরে সবাই বলবে—আরে 'অটো-ইনজিনিয়ারিং কোম্পানি'টা কাদের তাই-ই জানেন না ? কার্তিক রায়ের নাম শুনেছেন ?

—কে কার্তিক রায় ?

—কার্তিক রায়ের নামই শোনেন নি ? আপনি হাসালেন দেখছি মশাই। নড়াইলের রায় ফ্যামিলির ছেলে। দেশের জন্যে লাখ-লাখ টাকা চাঁদা দিয়েছে। গান্ধী, জওহরলাল, শরৎ বোস, সুভাষ বোস, ওদের হাতে কম টাকা চ্যারিটি করেছে কার্তিক রায়! আসলে দানবীর কর্মবীর যাকে বলে, কার্তিক রায় হলো তাই। শেষ কালে কলকাতার মেয়রও হয়েছিল—

সেই মেয়রের ছবির এক পাশে গান্ধীজী আর একপাশে জে এম সেনগুপ্ত। কোনওটাতে বা সুভাষ বোসের সঙ্গে চা খাচ্ছেন বসে বসে। জহরলাল নেহরু যেবার লখ্‌নৌতে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন, কার্তিক রায় সেখানে গিয়েছিলেন কলকাতা থেকে স্পেশ্যাল ডেলিগেট হয়ে। সঙ্গে গিয়েছিলেন বসুমতী দেবী। জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে কর্তাবাবু আর কর্তা-মা'রও ছবি একটা রয়েছে। যেবার কার্তিক রায় জেলে গিয়েছিলেন, জেল থেকে

বেরোবার সময়কার ছবিও রয়েছে একটা। একগলা ফুলের মালা নিয়ে জেল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, সেই ছবিখানা বড় করে সকলের মাথায় টাঙানো রয়েছে।

নাতি জিজ্ঞেস করতো—ওদের সঙ্গে দাদু কেন ছবি তুলতো দিদিমা?

দিদিমা হাসতো। ছোট ছেলে তো, তখনও কম বয়েস নাতির। বুঝতে পারতো না ও-সব ছবির মূল্য। জানতো না একদিন ওই ছবি দেখে লোকে তাকে কত খাতির করবে। বুঝবে কত বড় বংশের ছেলে লোকনাথ রায়।

কিন্তু যত বয়েস বাড়তে লাগলো লোকনাথের, ততই যেন কেমন বেয়াড়া হয়ে যেতে লাগলো।

বীণা বলতো—মা, তুমিই ওকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথা খেয়ে ফেলবে দেখছি—

সত্যিই কি তাঁর নাতিকে আদর দিয়েছিলেন বসুমতী দেবী! গাড়িটার ভেতরে বসে বসে বসুমতী দেবীর সেই সব কথাই মনে পড়তে লাগলো। এত বড় 'অটো-ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ কোম্পানি'র সব কিছু দেখা-শোনা করতো জামাই।

জামাই-এর কথা মনে পড়তেই বসুমতী দেবীর মাথাটা ভারী হয়ে এল। সে-সব দিন কোথায় গেল! কর্তাবাবু লিমিটেড্ কোম্পানি তৈরি করে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন পাকা কাজ করে দিয়ে গেলেন। কর্তার যা-কিছু সম্পত্তি, যা-কিছু নাম-ডাক সবই ছিল ওই ওঁদের জন্যে। ওই যাঁদের ছবি তাঁর বাইরের ঘরের দেয়ালে টাঙানো ছিল। ওই শরৎবাবু, ওই সুভাষবাবু, ওই জওহরলাল, মতিলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, গান্ধীজী। ওঁদের কৃপাতেই এই গাড়ি বাড়ি, কারবার, ব্যাঙ্কের টাকা, সব কিছু।

যখন কার্তিক রায় 'অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্' করলেন, তখন বাড়ি ছাড়া তাঁর আর ছিল কী? কে দেবে টাকা? তখন ব্যাঙ্কই

রইল ভরসা। ব্যাঙ্ক থেকে ওভারড্রাফট-এর ভরসা দিলেন ওই ওঁরা।

একদিন বাড়ি এসেই কর্তাবাবু সোফার ওপর হেলান দিয়ে বসে পড়লেন।

বসুমতী দেবী ভেবেছিলেন কিছু বুঝি বিপদ হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলেন—কী হলো? শরীর খারাপ নাকি?

কর্তা বললেন—না, একটা খবর আছে।

—কী খবর?

—কোম্পানি রেজিস্ট্রি করে এলুম।

বসুমতী দেবী বললেন—কিন্তু টাকা? তুমি যে বললে গোড়াতেই এক লাখ টাকা লাগবে! অত টাকা কোথায় পেলে?

কার্তিক রায় বললেন—বোস সাহেব সব ব্যবস্থা করে দিলেন—

—বোস সাহেব মানে? কে বোস সাহেব?

—শরৎ বোস।

—ব্যারিস্টার শরৎ বোস?

বসুমতী দেবী দেয়ালটার ওপরে ঝোলানো ছবিটার দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘটনাটাও তাঁর মনে পড়লো। বীণার বিয়ের সময় এ-বাড়িতে যেন চাঁদের হাট বসে গিয়েছিল। খবরের কাগজে যাদের ছবি বেরোয়, তাঁরা সবাই সেদিন এ-বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁদের দেখতে পাড়ার লোক ভিড় করে এসেছিল বাড়ির ভেতরে। বর-কনে দেখতে নয়, ওই সব প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদের দেখতে। খবরের কাগজের লোকরাও এসে তাঁদের ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

সে-সব একদিন গিয়েছে···

হঠাৎ বৈজু এল।

বসুমতী দেবী জিজ্ঞেস করলেন—কী রে, পেলি খোকাবাবুকে?

বৈজু বললে—না মাঈজী—

—তেলেভাজাওয়ালাটা কী বললে? আজকে দোকানে এসেছিল খোকাবাবু?

বৈজু ততক্ষণ গাড়িতে নিজের জায়গায় উঠে বসেছে। বললে, এসেছিল, তারপর আবার কোথায় গেছে তা ও লোকটা জানে না—

বসুমতী দেবী বললেন—তাহলে আর কোথায় যেতে পারে বল্ তো?

আর কোথায় যে খোকাবাবু যেতে পারে তা বৈজু কেমন করে বলবে? সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরোয় লোকনাথ। বেরিয়ে সারা কলকাতা টো টো করে ঘোরে। এমনিই অকারণে ঘুরে বেড়ায়। ওই তেলেভাজার দোকানটার কথা একদিন কী-রকম যেন অন্যমনস্কভাবে খোকা দিদিমাকে বলে ফেলেছিল। তারপর অনেকবার বসুমতী দেবী খোকার খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে ওইখানে এসে তাকে পেয়ে গিয়েছিলেন।

একদিন দিদিমা জিজ্ঞেস করেছিল—হ্যাঁ রে খোকা, তুই ওইখানে যাস কেন? ওই ঘুপচি দোকান-ঘরে? ওখানে কি ভদ্রলোকেরা যায়?

লোকনাথ হেসে বলেছিল—আমিও তো ভদ্রলোক নই দিদিমা—

দিদিমা বলেছিল—ছি ছি, তোর দাদু তো কখনও ও-সব জায়গায় পা মাড়ায়নি। তা জানিস? বড় বড় লোকের বাড়ি, বড় বড় হোটেল ছাড়া কর্তা কখনও কোথাও যায়নি। সেই বংশের নাতি হয়ে তুই কিনা ওই ছোটলোকদের সঙ্গে মেলামেশা করিস জানাশোনা কেউ দেখতে পেলে কী ভাববে বল্ দিকিনি? যত ভাববে রায়েদের অবস্থা পড়ে এসেছে—

লোকনাথ বলেছিল—তা ভাবুক গে, তাতে আমার বয়ে গেছে—

বসুমতী দেবী বলেছিলেন—তোর বয়ে যেতে পারে, কিন্তু

আমাদের বংশে যে কালি লাগবে—

লোকনাথ বলেছিল—কালি লাগুক গে দিদিমা, অত সহজে যদি বংশে কালি লাগে, তো সে-কালি লাগাই ভালো।

এ-সব কথায় বসুমতী দেবীর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠতো। এ ছেলে বলে কী! এ যে কালাপাহাড় হয়ে জন্মেছে এ-বংশে! কর্তা কার্তিক রায় ব্যবসা করে বিরাট কারবার ফেঁদে ফেলেছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন জামাই সন্তোষ রায়।

শ্বশুর রায়, জামাইও রায়।

কর্তা বলেছিলেন—এমন ছেলেকে জামাই করলাম যে আমার ব্যবসার দিকটা দেখতে পারবে। আমার মারা যাবার পরও কারবার চালু থাকবে—

কিন্তু কর্তার কোনও আশাই মেটেনি শেষ পর্যন্ত। সেই কোম্পানি, সেই অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি, যখন ফুলে-ফেঁপে বিরাট আকার ধারণ করলো, পাঁচশো লোক তখন পে-রোলে, ঠিক তখনই বিপর্যয়টা ঘটলো রায়-বংশের ইতিহাসে।

সবে মাত্র লোকনাথ জন্মেছে তখন।

একদিন বিলেত থেকে কেবল্ এল—'সন-ইন-ল' এস রায় এক্সপায়ার্ড। আপনার জামাই সন্তোষ রায় মারা গেছে—

বীণার কাছে গিয়ে খবরটা দিতে গিয়ে হু-হু করে কেঁদে উঠেছিলেন বসুমতী দেবী।

সেই বীণার ছেলে, বসুমতী দেবীর একমাত্র অবলম্বন লোকনাথের জন্যে আজ কিনা তাঁকে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে!

—তাহলে কোথায় যাবি এখন বৈজু?

বৈজু জিজ্ঞেস করলে—বাড়ি যাবো?

বসুমতী দেবী বললেন—তাই-ই চল্—

বৈজু সেই চৌরঙ্গী রোড থেকে গাড়িটা উল্টো দিকে বাড়ির পথের দিকে নিয়ে ছুটলো।

পাঁচ

মনে আছে এর পর একদিন অফিসে বসে কাজ করছি, হঠাৎ আমার চাপরাশি এসে খবর দিলে গড়পার রোড থেকে এক বাড়ির ড্রাইভার আমার সঙ্গে আমার কামরায় দেখা করতে চায়।

আমি রাজি হতেই যে ঘরে ঢুকলো তাকে দেখে চিনতে পারলুম। সেই লোকনাথদের ড্রাইভার বৈজু।

বৈজু বললে—নিচেয় গাড়িতে কর্তা-মা বসে আছেন, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান—

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠলুম। মনে আছে, আমরা ছোট-বেলায় লোকনাথের বাড়িতে ঢুকতে ভয় পেতাম এই লোকনাথের দিদিমার জন্যে। লোকনাথের বাবা সন্তোষ রায়কে আমরা বেশি দেখতে পেতাম না। কারণ তাঁর 'অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্' নিয়ে তাঁকে নাকি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে হতো। আর লোকনাথের দাদামশাই তখন বুড়ো হয়ে গেছেন। আমরা বড়দের মুখে শুনেছি, রাস্তা থেকে দেখা যেত তিনি এক মাথা সাদা চুল নিয়ে পাশের বাগানটায় পায়চারি করছেন। শীতকালের দিনে একটা কাশ্মীরী শাল গায়ে জড়ানো। আর গ্রীষ্মকালে খদ্দরের ঢোলা পাঞ্জাবি ধুতি, আর পায়ে একটা চপ্পল। কার্তিক রায় জীবনে একবার জেল খেটেছিলেন। সেই কারণেই বোধহয় সে যুগে যাঁরা যাঁরা ইংরেজদের জেলখানায় কিছুদিন কাটিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই লোকনাথদের বাড়িতে অনেক অভ্যর্থনা পেয়েছেন। যেমন শরৎ বোস, মহাত্মা গান্ধী, বেহারের রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মাদ্রাজের শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। আরো কত বিখ্যাত-বিখ্যাত সব লোক এককালে লোকনাথদের বাড়িতে এসে উঠতেন। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা আর ফটোগ্রাফাররা এসে লোকনাথদের বাড়ির

সামনে ভিড় করতো। লোকনাথের দাদামশাই কার্তিক রায় তাঁদের সকলের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে দিতেন। শুধু তাই নয়, তাঁর 'অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্'-এর লাভের অঙ্ক থেকে কত টাকা কংগ্রেস-ফাণ্ডে তিনি চাঁদা দিয়েছেন, তার বোধহয় কোনও হিসেবও নেই কোনও কংগ্রেস অফিসের খাতায়।

দেশবন্ধু ফরিদপুরে যাবেন কংগ্রেসের প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সে। যাবার আগে হঠাৎ কিছু টাকার দরকার পড়লো। টেলিফোন করলেন কার্তিক রায়কে। বললেন—কার্তিক, আমার কিছু টাকা চাই যে—

কার্তিক রায় শুধু জিজ্ঞেস করলেন—কত ?

অর্থাৎ দেশবন্ধু টাকা চাইছেন এইটেই বড় কথা। কেন, কী বৃত্তান্ত, টাকা নিয়ে তিনি কী করবেন, কী বাবদ খরচ করবেন তা জানবারও দায় নেই কার্তিক রায়ের। আর দেশবন্ধুরও তা জানাবার দায় নেই।

ওদিক থেকে দেশবন্ধু শুধু বললেন—এই ধরো আট-দশ হাজারের মতন ? দিতে পারবে ?

কার্তিক রায় উত্তরে বললেন—আপনার বাড়িতে টাকা নিয়ে আমার লোক দুপুর বারোটার মধ্যে পৌঁছে যাবে—

বাস, ওই পর্যন্ত !

এ শুধু দেশবন্ধুর একলার ব্যাপারেই নয়। শরৎ বোস, জে এম সেনগুপ্তের ব্যাপারেও সেই একই রকম। আসামে যেবার চা-বাগানে ধর্মঘট হলো, জে এম সেনগুপ্ত সাহেব নিজের সর্বস্ব দিলেন। কার্তিক রায়ের কাছে এসেও হাত পাতলেন। বললেন, —আমাকে কিছু দাও কার্তিক—

কার্তিক রায় বললেন—কত দেব ?

সেনগুপ্ত সাহেব বললেন—যত দিতে পারো—

সেদিন 'অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্'-এর অ্যাকাউণ্টেণ্ট-এর কাছে টেলিফোন করে যা-কিছু পাওয়া গিয়েছিল, সব তুলে দিয়ে

দিয়েছিলেন সেনগুপ্ত সাহেবের স্ট্রাইক ফাণ্ডে। সে যুগের লেবার-লীডাররা এখনকার মত পরের ধনে পোদ্দারি করতেন না। একদিকে কোম্পানির টাকা খেয়ে অন্যদিকে লেবারদেরও সর্বনাশ করতেন না। নিজেরাও সর্বস্ব ত্যাগ করে লেবারদের জন্যে ফকির হয়ে যেতেন দেশপ্রিয় জে এম সেনগুপ্ত সাহেবের মত!

আমরা এসব গল্প শুনতাম বড়দের কাছে।

জিজ্ঞেস করতাম—তারপর?

কিন্তু জীবনের লড়াই-এর ক্ষেত্রে নেমে আমরা সবাই যখন সংসারের তাড়নায় যে যার কাজকর্মে আপাদমস্তক ডুবে আছি, তখন লোকনাথদের অতীত ঐশ্বর্যের কিম্বদন্তীর জলুস আমাদের আর তখন আকর্ষণ করতো না। তখন বাইরে বাইরে আমরা যতই প্রোলেটেরিয়েটের গুণগান করি না কেন, মনে মনে আমরা সবাই-ই এক-একটা কার্তিক রায় হতে চাইতাম। আমরাও চেষ্টা করতাম আমাদের যুগের যারা ভি-আই-পি, তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজেরাও কোনও অলিখিত কৌশলে কেমন করে এক-এক-একজন ভি-আই-পি হতে পারি। সেই সময়ে হয়ত রাস্তায়-ঘাটে দৈবাৎ এক-আধদিন লোকনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। রাস্তা দিয়ে ধুতি-পাঞ্জাবি কিম্বা শার্ট পরে চটি পায়ে দিয়ে ফটাফট করে সে চলেছে। এক-একদিন আমাদের গাড়িতেও উঠতো। যে ছেলে এককালে মটর-গাড়ির কারবারির বংশে জন্মগ্রহণ করেছিল, তার পক্ষে এই পায়ে হেঁটে বেড়ানোটাকে আমরা কোনও ইজম্‌ দিয়েই ব্যাখ্যা করতে পারতাম না। ভাবতাম হয়ত লোকনাথ পাগল হয়ে গেছে, কিম্বা হয়ত ওইটেই ওর স্টাইল। এককালে যেমন ঐশ্বর্য থাকাটাই ছিল স্টাইল, হাবে-ভাবে চাল-চলনে ঐশ্বর্যের বহিঃপ্রকাশটাই ছিল কাম্য, পরে আমাদের ছোটবেলাতেই সেটা বদলে গেল। তখন থেকে লোকের ধারণা হলো প্রপার্টি মানেই চোরাই মাল। অর্থাৎ পৃথিবীতে যে যে বড়লোক হয়েছে, তারা সবাই নাকি চোর। চুরি করা ছাড়া নাকি অর্থবান হওয়া যায় না।

সুতরাং চেহারার মধ্যে একটা সর্বহারার ছাপ দিতে হবে। সেটা কী করলে সম্ভব ? মাথার চুলে তেল দিও না, ফরসা ধোপ-দুরস্ত কাপড়-জামা পোর না। দাড়ি রোজ না কামালেই ভালো হয়। আর দাড়ি রাখলে তো কথাই নেই। এতদিন ধরে এ পৃথিবীতে যাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয় বলে কীর্তিত হয়ে এসেছে, আসলে তারা কেউ নাকি প্রাতঃস্মরণীয় নয়, তারা বুর্জোয়া। এতদিন ভুল করে তাদের আমরা স্মরণ করে এসেছি, পূজো করে এসেছি, অনুসরণ করে এসেছি। এবার আমাদের অন্য যুগ, এবার আমাদের অন্য আদর্শ, এবার আমাদের অন্য দেবতা।

সেই অন্য দেবতা কে ?

সেই অন্য দেবতাদের ছোট ছোট পুস্তিকা বাইরে থেকে আমদানি হয়ে আসতো কলকাতায়। আমরা উদগ্রীব হয়ে তা পড়তাম আর ভাবতাম, আমাদের পূর্বপুরুষরা কী ভুলই করে গেছেন। তারা মিছিমিছি কৃচ্ছ্র সাধন করে গেছেন, তাঁদের জীবনে ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন, মিছিমিছি সত্য-কথা বলেছেন, সত্য-আচরণ করেছেন, সত্যকে অনুসরণ করেছেন। তাঁরাই আকাশের দিকে চেয়ে একদিন অদৃশ্য দেবতাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করেছেন— কস্মৈঃ দেবায় !

অথচ তাঁরা জানতেন না যে দেবতা এই পৃথিবীর সর্বহারা-বঞ্চিত মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

লোকনাথদের গাড়ির ড্রাইভার যখন এসে আমাকে ডাকলে, তখন আমি সত্যিই অবাক হইনি। অবাক হইনি কারণ, আমি লোকনাথের খবর ততদিনে সব পেয়েছিলাম। রাস্তায় লোকনাথের সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছিল, সে আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল।

একদিন আমি তাকে বলেছিলাম—কীরে, তুই আমাদের অত এড়িয়ে যেতে চাস কেন ? আমরা কী করেছি তোর ?

লোকনাথ আমার কথা শুনে হাসতো।

—তোদের মত উঠতি বড়লোকদেরই আমার ভয় করে রে—

—আমরা উঠতি বড়লোক? বলছিস কী তুই?

লোকনাথ বলতো—উঠতি বড়লোকরাই হলো সমাজের ক্যানসার-স্পট। তারা বুর্জোয়াদের গালাগালি দেয়, কিন্তু নিজেরা যখন অনেক কষ্টে বুর্জোয়া হয়ে ওঠে, তখন সব প্রোলেটেরিয়েটদের ঘেন্না করতে শুরু করে—

প্রথম-প্রথম আমাদের মনে হতো লোকনাথ বুঝি কমিউনিস্ট হয়ে গেছে। তার হাব-ভাব-কথাবার্তা-চালচলন দেখে আমাদের সেই রকম একটা সন্দেহ করবার কারণও ছিল। কিন্তু যখন দেখতাম সে কোনও পার্টির সঙ্গে মেলামেশা করে না, কোনও সভা-সমিতিতে যায় না, তখন কেমন সন্দেহ হতে লাগলো। কাজের মধ্যে লোকনাথের কাজ ছিল রাস্তায়-রাস্তায় ট্যাং-ট্যাং করে ঘুরে বেড়ানো। সেই সকাল বেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েই লোকনাথ হাঁটতে শুরু করতো। হাঁটতে হাঁটতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তো, তখন হয়ত ট্রামে বা বাসে উঠে পড়তো। রাজাবাজারের ট্রাম ডিপোর সামনে ভোরবেলা কিছু পায়রা রাস্তার ওপর উড়ে এসে বসতো। কী যেন খুঁটে-খুঁটে খেত। এ-দৃশ্যটা দেখেই লোকনাথ ট্রাম থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পড়তো। তারপর পশ্চিম দিকের ফুটপাথের লালাজীর দোকান থেকে কিছু চানাভাজা কিনে তাদের সামনে ছড়িয়ে দিত।

বলতো—খা, খা, খা তোরা সব, খা—

আবার অনেকে দেখেছে খিদিরপুরের মনসাতলা লেনের মধ্যে লোকনাথ একলা হেঁটে হেঁটে চলেছে।

—ও দাদা, দাদা—

একজন ভদ্রলোক পেছন থেকে ডাকলো।

লোকনাথ পেছন ফিরতেই ভদ্রলোক বললে—তেত্রিশের বি বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?

কথাটা বলতে গিয়ে ভদ্রলোকের মুখের মধ্যেই যেন আধখানা

সেন্‌টেনস্‌ আটকে গেল।

—মিস্টার রায়? আপনি এখানে? এ-পাড়ায়? এই সময়ে?

লোকনাথ তো অবাক!

এই অচেনা পাড়ায় কে তাকে চিনে ফেললে?

লোকনাথ জিজ্ঞেস করলে—আপনি কে?

—আমায় চিনতে পারচেন না মিস্টার রায়? আমি কেদার সরকার। অটো-ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌-এর অ্যাকাউনটেণ্ট—কেদার সরকার—

কেদার সরকার! লোকনাথ লোকটার আপাদমস্তক দেখতে লাগলো। চাকরি নেই আর কেদার সরকারের। কেনই বা থাকবে। অটো-ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌ যখন লোকনাথ ছেড়ে দিলে, তখন নিজের একান্ন ভাগ শেয়ার ওয়ার্কার্সদের দিয়ে দিয়েছিল সে। তখন যারা থাকতে চেয়েছিল, তারা থেকেছে। আর বাকিরা মোটা টাকার খেসারত নিয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। তখন যারা চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল, কেদার সরকার তাদের মধ্যে একজন। সকলকে যেমন খেসারত দেবার কথা ছিল, কেদার সরকারকেও সেই রকমই দেওয়া হয়েছিল। কেদার সরকার পেয়েছিল মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা। আর মোটা-মোটা টাকার কর্মচারী যারা তারাও মোটা টাকার খেসারত নিয়ে একদিন বাড়ি চলে গিয়েছিল। সেই টাকা নিয়ে কেউ কলকাতার শহরতলীতে দু-এক কাঠা জমি কিনে একখানা বাড়ি করেছে। কেউ-বা তারই একটা অংশ ভাড়া দিয়ে চিরস্থায়ী একটা বাঁধা আয়ের ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

কিন্তু কেদার সরকার তা করেনি।

কেদার সরকার যশোরের চিরুনির ব্যবসা করে বেশ মোটা আয় করতে আরম্ভ করেছে। বেশ হাসি-খুশি মুখ, তেলগোল চেহারা।

কয়েকটা কথার পর লোকনাথ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—অ্যাভারেজ এখন কত টাকা হয় আপনার বছরে?

—তা এখন দশ থেকে বারো হচ্ছে, পরে আরো অনেক হবে।

লোকনাথ কেদার সরকারের মুখের দিকে তাকালে। দশ-বারো হাজারের পুলক মুখখানাতে মাখানো। পরে আরো অনেক হবে, সে-আশাও রয়েছে। লোকনাথের মনে হলো চাকরি গিয়ে যেন কেদার সরকারের ভাগ্য ফিরে গেছে।

কেদার সরকার আগ বাড়িয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—আপনি এখন কী করছেন মিস্টার রায়?

—আমি?

এ পৃথিবীতে সবাইকে কিছু-না-কিছু করতেই হয়। না করলে যেন সে মানুষ নামের যোগ্য নয়।

প্রশ্নটা করেই কেদার সরকার যেন নিজের ভুলটা বুঝতে পারলে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে শুধরে নিয়ে বললে—মানে, নতুন আর কোনও প্রোজেক্টে হাত দিয়েছেন নাকি? কোনও নতুন ফ্যাক্টরি?

—তার মানে আরো টাকা, আরো অশান্তি! এই তো?

একটা নিরাসক্ত হাসি হেসে লোকনাথ বললে—সে-রকম কোনও উদ্দেশ্য থাকলে তো অটো-ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌ও তো ওয়ার্কারদের হাতে দিয়ে দিতাম না।

কেদার সরকার বললে—সত্যিই স্যার, আপনি যে কেন এতদিনকার বিজনেস ওয়ার্কারদের দিয়ে দিলেন, তা আমরা কেউ বুঝতে পারলুম না। অথচ আমাদের স্টাফ তো কখনও স্ট্রাইক করেনি—

তারপর হঠাৎ যেন খেয়াল হলো।

বললে—আপনার গাড়ি কোথায় গেল, স্যার?

—গাড়ি?

লোকনাথ বললে—গাড়ি আছে।

—তাহলে এদিকে কোথাও এসেছিলেন বুঝি ?

লোকনাথ বললে—কোথায় না এলে বুঝি এদিকে আসতে নেই ?

—না, তা বলছি না।

লোকনাথ হঠাৎ বলে উঠলো—দেখুন কেদারবাবু, আমার গাড়ি নেই শুনলে আপনি খুব খুশী হতেন, না ? বলুন হ্যাঁ, কি না ? বলুন, বলুন ?

কেদার সরকার যেন ধরা পড়ে গিয়ে ছাড়া পাবার জন্যে ছটফট করতে লাগলো।

বললে—না না, আমি তো তা বলতে চাইনি—আমি, মানে···

লোকনাথ ধমক দিয়ে উঠলো। বললে—থামুন, আমি সব বুঝি। টাকা দিয়ে গাড়ি দিয়ে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স দিয়েই আপনারা সব জিনিসের সব মানুষের বিচার করেন। তাই আমি আমার ফার্ম ছেড়ে দিয়েছি। তাই আমি এই পায়ে হেঁটে হেঁটে বেড়াচ্ছি, আমি দেখতে চাই মানুষ আজকে কত নিচেয় নেমে গেছে—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—আপনি হয়ত ভাবছেন পায়ে হেঁটে রাস্তায় বেড়িয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে সমান লেভেলে নেমে এসেছি, কিন্তু আসলে তা নয়, আসলে আপনাদের চেয়ে আজ আরো অনেক নিচেয় নেমে দাঁড়িয়েছি আমি, তা জানেন ? আমার পৈত্রিক এই প্রাণটার মত আমার পৈত্রিক বাড়ি গাড়ি সবই আছে। কিন্তু সে নাম-মাত্রই আছে, আমার দিদিমা যেদিন মারা যাবে, সেদিন তাও বিক্রি করে দেব। তখন আপনারা দূর থেকে দেখে দূর-দূর করবেন। এখন যেমন দাঁড়িয়ে একটু কথা বলছেন, সেদিন তাও বলবেন না, সেদিন আপনাদের চোখে আমি একজন ইডিয়ট হয়ে যাবো—

বলে একটু দম নিয়ে বলে উঠলো—যাই—

বলে মনসাতলা লেন ধরে সোজা সামনের দিকে চলতে লাগলো।

কেদার সরকার লোকনাথের কথাগুলো শুনে খানিকক্ষণের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তার চলে যাবার দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখতে লাগলো। সেই অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্-এর খুদে মালিক মিস্টার রায়। গাড়ি করে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় অফিসে আসতো, আর সারাদিন চরকির মত সব ডিপার্টমেণ্ট ঘুরে সুপারভাইজ করে বেড়াতো! সাব অ্যাকাউন্টেণ্ট কেদার সরকার কতদিন খাতাপত্র ভাউচার নিয়ে সই করাতে গিয়েছে মিস্টার রায়ের কাছে। তখন এই ড্রেস, এই পোশাক ছিল না মিস্টার রায়ের। নিখুঁত কামানো মুখ, ধপধপে সার্ট-টাই-সুট, আর মুখে নিখুঁত উচ্চারণের ইংরেজি।

আর আজ ?

একমুখ দাড়ি গজিয়ে গেছে সেই মুখে, পায়জামাটা ময়লা, পাঞ্জাবিটাও জায়গায় জায়গায় ফেঁসে গেছে!

—কার দিকে চেয়ে দেখছেন অমন করে ?

কেদার সরকার মুখ ফেরাতেই দেখতে পেলে। এঁর জন্যেই এই মনসাতলা লেনে আসা!

ভদ্রলোক বললে—আমিও তো ভাবছি, এত দেরি হয়ে গেল, আপনি এখনও এলেন না। তা বাইরে আসতেই দেখি আপনি দাঁড়িয়ে আছেন—

কেদার সরকার বললে—ওই যে দেখছেন ওই ভদ্রলোককে ? দেখছেন ? উনি কে জানেন ?

—কে ?

—আরে, আমি যেখানে চাকরি করতুম, সেই অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিস্টার লোকনাথ রায়—

ভদ্রলোক অবাক। বললে—বলেন কী ? ওই যে ছেঁড়া পাঞ্জাবি-পায়জামা পরা লোকটা ? তা ওর ও দশা হলো কেন ? গাড়ি-বাড়ি ওর কোথায় গেল ?

কেদার সরকারও বললে—আমিও তো তাই জিজ্ঞেস করলাম,

তা ও বললে কী জানেন ?

—বললে গাড়ি থাকলে বুঝি বেশী খাতির করতেন আপনারা ? বুঝুন ঠেলা।

ভদ্রলোক বললে—আমি যেন কোথায় আগে দেখেছি ওকে। একলা একলা আপন মনে ওই রকম ঘুরে বেড়ায়। আমি তো চিনতে পারিনি, ভাবতুম পাগল-ছাগল কেউ হবে—

কেদার সরকার বললে—অথচ কত বড় ফ্যামিলির ছেলে জানেন ? ওদের বাড়িতে একদিন মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের মত লোকেরা এসে উঠেছে। জওহরলাল নেহরু ওর বাবার ফ্রেণ্ড ছিল। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যেবার নেহরুজী প্রেসিডেন্ট, সেবার ওর দাদামশাই দিদিমা সবাই ডেলিগেট হয়ে গিয়েছেন, সে-সব ছবি ওদের ড্রয়িংরুমে টাঙানো থাকতে দেখেছি—

ভদ্রলোক সব শুনে বললে—সবই কপাল ! কিন্তু আসল কারণটা কী বলুন তো ? কারবারে তো লাভই হচ্ছিল, কারবার বন্ধ করে দেওয়ার কারণটা কী ?

কেদার সরকার বললে—কী জানি মশাই, কী কারণ।

—কোনও মেয়েমানুষ-টানুষ আছে নাকি এর পেছনে ?

কেদার সরকার বললে—তা তো কই শুনিনি !

—বিয়ে তো হয়নি এখনও ?

—না।

ভদ্রলোক বললে—তা হলে আর দেখতে হবে না। এর পেছনে নির্ঘাৎ কোনও মেয়েমানুষ আছে মশাই, ও আর দেখতে হবে না। সাধ করে কি আর ওই জিনিস থেকে দূরে আছি মশাই। এমন লাভের ব্যবসাটা লাটে ওঠালে—

কেদার সরকার বললে—না মশাই, মেয়েমানুষ নয়—

—মেয়েমানুষ নয় ? তবে কী ?

—অন্য ব্যাপার। আমি আমার অ্যাকাউন্টেন্টের কাছে

শুনেছিলুম ! আসলে বই পড়ে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

—বই ? কীসের বই ?

কেদার সরকার বললে—ওই জন্যেই তো ছেলেকে বলেছি, বেশী লেখাপড়া শিখো না বাবা। লেখাপড়া মানেই কেবল মাথার বোঝা বাড়ানো। জানেন, ওই লোকনাথ এম-এতে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট ! দু'টা পেপারে দু'টা প্রফেসার রেখেছিল কার্তিক রায় এই নাতির জন্যে ! বুড়োমানুষ, ভেবেছিল 'অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্'-এর ভিত বুঝি পাকা করে দিয়ে গেল। তারপর ওই ছেলেকে লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিকস্ থেকে গ্র্যাজুয়েট করে নিয়ে এল। একেবারে পাকাপোক্ত কাজ ! যাতে রায় বংশের ব্যবসা পুরুষানুক্রমে আরও ফুল-ফোর্সে এগিয়ে যায়। কিন্তু ছেলে যে একেবারে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

—কেন ?

—ওই যে বললাম—বই। লাইব্রেরিতে অনেক বই ছিল। সেই বই পড়েই মাথা খারাপ হয়ে গেল নাতির ! একদিন কোথাও কিছু নেই, দেয়ালের ছবিগুলো সব দুমদাম করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলে। মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু, রবি ঠাকুর, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, কারও ছবিকে আর রেহাই দিলে না ! সব মার্বেল পাথরের মেঝের ওপর আছড়ে মারতে লাগলো আর সেই পাথরের মেঝের ওপর পড়ে ছবির কাচগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেল।

তা সেই লোকনাথের দিদিমা আমার অফিসের সামনে তাঁর গাড়িতে বসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। এককালে বড়-বড় বিখ্যাত মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন বসুমতী দেবী। কার্তিক রায়ের সহধর্মিণী বসুমতী দেবীর ছবি সেকালে

'আনন্দবাজার'-এর পাতায় অনেকবার বেরিয়েছে।

খবরের কাগজের পাতায় অনেকেরই ছবি ছাপা হয় না। কিন্তু ছাপা হলে যারা নিজেদের জীবন ধন্য বলে মনে করে, বসুমতী দেবী তাদেরই মধ্যে একজন। সে যুগে খবরের কাগজের নিউজ এডিটররা কার্তিক রায়ের পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়ে আসতো। এলে ধন্য হয়ে যেত। আর যাতে ভবিষ্যতে আরও নেমন্তন্ন পায়, তার জন্যে ঘুষ হিসেবে সুযোগ পেলেই কাগজে কার্তিক রায় আর বসুমতী দেবীর ছবি ছেপে দিত।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ একবার বসুমতী দেবীকে বলেছিলেন—বহেনজী, আমি হলুম রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ঔর আপ রাজ-রাজেন্দ্রাণীজি হ্যায়—

কথাটা শুনে উপস্থিত সবাই হেসে উঠেছিল। সে-যুগে বলতে গেলে বসুমতী দেবী রাজ-রাজেন্দ্রাণীই ছিলেন। কত ঐশ্বর্য, কত খাতির, কত সম্মান, কত অতিথি-অভ্যাগত, সে-সব কথা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

লোকে বলতো—কার্তিক রায়ের সমস্ত সাফল্যের মূলে আছে তার স্ত্রী—

লোকে সত্যি কথাই বলতো। সেই কথার মধ্যে বাড়াবাড়ি তো ছিলই না, বরং কিছু কমই বলতো তারা। কারণ বাড়ির ভেতরের বেড্‌রুমের কথা তো বাইরের লোক শুনতে পেত না। সেখানে কার্তিক রায় বসুমতী দেবীর কাছে পরামর্শ নিয়েই সব কাজে হাত দিতেন।

কার্তিক রায় বলতেন—শোন, তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে দশ হাজার টাকা সেনগুপ্ত সাহেবকে দিচ্ছি—

—কেন ?

—আসামের চা-বাগানের লেবার-স্ট্রাইক চলছে। দেশপ্রিয় সাহেব কাল টাকা নিতে এসেছিলেন। আজ সকালে দেবার কথা।

শুধু চা-বাগানের লেবার-স্ট্রাইকই নয়। আরও অনেক ব্যাপারেই টাকা দিতে হতো কার্তিক রায়কে। 'অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্' যেমন কংগ্রেসের কল্যাণেই অত বড় হয়ে উঠেছিল, সেই কার্তিক রায়কেও আবার অনেক টাকা চাঁদা দিতে হতো কংগ্রেসকে। কখনও চা-বাগানের লেবার-স্ট্রাইকের জন্যে, কখনও অল-ইনডিয়া কংগ্রেস-কনফারেন্সের মিটিং-এর জন্যে, আবার কখনও ফরিদপুরে বন্যার জন্যে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বন্যা রিলিফ-ফাণ্ডের জন্যে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র হাত পেতেই রাখতেন। তিনি চাঁদা চাইলে 'না' বলতে পারতেন না কার্তিক রায়। তবু রাত্রে শোবার ঘরে এসে বসুমতী দেবীকে একবার জিজ্ঞেস করে নিতেন।

তবে এ-সব কিছুর ওপরে বসুমতী দেবীর নিজের সংসার বলেও একটা বস্তু ছিল। সেখানে তিনি একলাই সব। একটিমাত্র মেয়ে। তার ভরণপোষণ, লেখাপড়া, তার বিয়ে। সন্তোষ রায়কে যে তিনি জামাই করেছিলেন, তাও তাঁর নিজের পছন্দ। ছেলেটা দেখতে শুনতে রাজপুত্র। এম এস-সি পাশ করেছিল সায়েন্স কলেজ থেকে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নিজের হাতে তাকে কেমিস্ট্রির প্র্যাকটিক্যাল শিখিয়েছিলেন। সেই সন্তোষ প্রথম জীবনে আচার্যদেবের মতই ব্রহ্মচর্য পালন করতো। কুস্তির আখড়ায় দেহ-চর্চা করতো। সকালবেলা পাঁউরুটির টোস্টের বদলে ছোলা-ভিজে আর আখের গুড় খেতো। আর গুরুকে ভগবানের মত ভক্তি করতো।

সেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রই একদিন কার্তিক রায়ের বাড়িতে এসে হাজির।

বললেন—কইরে, কার্তিক কোথায় গেলি ?

চাপরাশির মুখে আচার্যদেবের আসার খবর পেয়ে দৌড়ে বাইরে এলেন। সঙ্গে বসুমতী দেবী। দু'জনেই এসে আচার্য রায়ের পায়ের ধুলো নিলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র বললেন—এই ছাখ্, কাকে এনেছি—

কার্তিক রায় আর বসুমতী দেবী দুজনেই পাশে-বসা ছেলেটির দিকে চেয়ে দেখলেন। রাজপুত্রের মতন চেহারা। ফরসা টক-টক করছে গায়ের রং। খদ্দরের ধপধপে সাদা পাঞ্জাবি ধুতি। ছেলেটি দু'জনের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালো।

বসুমতী দেবী অবাক হয়ে তখনও একদৃষ্টে চেয়ে দেখছেন ছেলেটির মুখের দিকে।

জিজ্ঞেস করলেন—কী নাম বাবা তোমার ?

—শ্রীসন্তোষ রায়।

—কোথায় বাড়ি ?

সন্তোষ রায় বললে—ফরিদপুরে—

—বাবা মা ?

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র মাঝখানে কথা বলে উঠলেন। বললেন—কেউ নেই, কেউ নেই, আমিই ওর বাপ-মা সব। ওর সম্বন্ধে আমাকেই তোমরা জিজ্ঞেস করো। আমি সব জানি ওর—

তারপর আচার্যদেব তার সম্বন্ধে যা বললেন, তার মর্মার্থ হলো —বন্যা ত্রাণ সমিতির কাজ করতে গিয়ে তিনি ছেলেটিকে কুঁড়িয়ে পান ফরিদপুরের এক গ্রামে। সেখান থেকেই তাঁর ভলান্টিয়াররা তাঁকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসে। এসে সায়েন্স কলেজে তাঁর হাতে তুলে দেয়। সেই থেকেই সন্তোষ তাঁর কাছে আছে। আচার্যদেব তখন কলেজ থেকে মাইনে পেতেন মাসে আটশো টাকা করে। তার থেকে চল্লিশ টাকা কেটে নিয়ে আর সবই দিয়ে দিতেন ওই সন্তোষের মত গরীব পিতৃমাতৃহীন ছাত্রদের। এই সন্তোষ রায় সেই সব গরীব অভিভাবকহীন ছাত্রদেরই একজন। এখন সে লেখাপড়া শেষ করেছে। স্কলারশিপ পেয়ে-পেয়ে এসেছে এতদিন। এখন তোরা একে একটা কাজ-টাজ দে কিছু। আমি আর কদ্দিন এদের ভার বইবো—

কার্তিক রায় বললেন—কী কাজ দেব বলুন ?

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বললেন—আরে, কী কাজ দিবি তোরা, তা

আমি কী বলবো? আমিই তো আমার বেঙ্গল কেমিক্যালে একে ঢোকাতে পারতুম। কিন্তু আমার ছেলে কি একটা রে? এই সন্তোষের মত হাজার-হাজার ছেলে আমার। তোরা তার মধ্যে একটা-দুটোর ভার নিলেই আমি বাঁচি—

তা সেই সন্তোষ রায়। সন্তোষ রায় এসে ঢুকলো অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্-এর অফিসে। আর কার্তিক রায়ের বাড়িতেই খেতে লাগলো সেদিন থেকে। এই লোকনাথেরই বাবা সন্তোষ রায়—

আমি যখন গিয়ে গাড়ির পাশে দাঁড়ালাম, বসুমতী দেবী গাড়ির দরজা খুলে দিলেন।

বললেন—ভেতরে এসো—

ভেতরে বসে বললাম—আপনি কেন কষ্ট করে আমার অফিসে এলেন, আপনি ডাকলেই তো আপনার কাছে যেতে পারতুম—

বসুমতী দেবীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। এককালের সেই গায়ের লাল রং আর নেই। এখন যেন আগের চেয়ে অনেক নিষ্প্রভ। দিনে দিনে তাঁর বয়েসও অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব তখনও এতটুকু কমেনি যেন।

বসুমতী দেবী আমার কথা শুনে বললেন—তা তো ঠিক, কিন্তু আমার যে আর অপেক্ষা করার সময় নেই বাবা। আমি এখন সেই চৌরঙ্গী থেকে আসছি—সেখানকার গলির ভেতর একটা তেলে-ভাজার দোকানে যেত না খোকা?

—যাদুগোপালের তেলেভাজার দোকান?

—হ্যাঁ, তুমি তো জানো দেখছি। খোকার মুখ থেকেই শুনতাম যাদুগোপালের কথা। অথচ তেলেভাজার দোকানে কেন অত যায় বলো তো? তেলেভাজা খেতে কি ওর ভালো লাগে?

বললাম—আসলে তেলেভাজা খেতে ভালো লাগে না, ওই সব লোকের সঙ্গে মিশতেই ওর খুব ভালো লাগে—

বসুমতী দেবী বললেন—কী জানি, আজকাল কী যে সব হয়েছে

ছেলে-মেয়েদের। ভালো ভালো লোকের সঙ্গে না মিশে মিশবে যত ছোটলোকদের সঙ্গে। আর ছোটলোকদের মত বেয়াড়া পোশাক-পরিচ্ছদ পরবে—অথচ তোমরা তো বেশ সভ্য-ভব্য হয়ে রয়েছ, এই তো তুমি সার্ট-প্যান্ট-টাই পরেছ—তোমাকে কেমন চমৎকার দেখাচ্ছে! আর ওর কী বিচ্ছিরি দাড়ি দেখেছ? দেখেছ তুমি ওর দাড়ি?

বললাম—দেখেছি।

—আচ্ছা ওরকম দাড়ি খোকা কেন রেখেছে বলো দিকিনি? ওর বাবা, ওর দাদামশাই কারো তো অমন দাড়ি ছিল না।

বললাম—তা ঠিক নয়, ওর বাবা বা দাদামশাই-এর ওরকম দাড়ি না থাকতে পারে, কিন্তু অন্য অনেক লোকের দাড়ি ছিল আগে। রবি ঠাকুরের দাড়ি ছিল, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দাড়ি ছিল। কার্ল মার্কস-এর দাড়ি ছিল, পঞ্চম জর্জের দাড়ি ছিল, আচার্য পি সি রায়ের দাড়ি ছিল, আবার পৃথিবীর অনেক লোকেরই দাড়ি ছিল না। রামমোহন রায়ের দাড়ি ছিল না, স্বামী বিবেকানন্দর দাড়ি ছিল না। সে-যুগে একটা সময় এসেছিল, যখন সবাই দাড়ি রাখতো, আবার এ-যুগে সেই রকম কিছু একটা ফ্যাশন এসেছে—

বসুমতী দেবীর বয়েস হলেও গলাটার বেশ তখনও জোর ছিল। বললেন—তা আগে সেই রকম মহাপুরুষ হ, তবে তাদের মত দাড়ি রাখ তুই! আমি তো তাই বলি খোকাকে। বলি তাদের মত গুণগুলো পেলি না, শুধু তাদের দাড়িটাই পেলি তুই—

—তা শুনে কী বলে লোকনাথ?

বসুমতী দেবী বললেন—সে যদি আমার কথার উত্তরই দেবে তো এখন এই অসময়ে তোমার কাছে এসে তোমার কাজ কামাই করি বাবা? দেখ দিকিনি, কী কপাল আমার, কোথায় কোন্ যাদুগোপালের তেলেভাজার দোকান, যাদের আমি বরাবর ছোটলোক বলে মনে করি, তাদের কাছে আমাকে এত কষ্ট করে

আসতে হয়? এও আমার কপালে লেখা ছিল! তুমি তো জানো, এককালে আমি কার সঙ্গে না মিশেছি, ওই দিল্লী বলো, মাদ্রাজ বলো, বোম্বাই বলো—সকলে একদিন আমার বাড়িতে এসে বহেনজী বলে খাতির করেছে। সেই রাজাগোপালাচারিজী থেকে শুরু করে বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কে আমার বাড়িতে আসেনি বলো? এই ইন্দিরা তখন এত ছোট ছিল, মার সঙ্গে আমার বাড়িতে এসেছে কতবার। আজ কি না ছেলের জন্যে সেই আমাকেই রাস্তায় রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতে হয়!

এ-কথার উত্তরে আমি আর কী বলবো?

বসুমতী দেবী আবার বললেন—তা যে-কথা আমি বলতে এসেছি, সেই কথা আগে বলি। তুমি একদিন আমার বাড়িতে এসো—

বললাম—কবে যাবো বলুন!

—কালই এসো না!

—কাল? কাল কখন যাবো বলুন?

—কাল সন্ধ্যেবেলা।

বললাম—নিশ্চয় যাবো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

কথা বলে বসুমতী দেবী চলে গেলেন। বৈজু গাড়িটা নিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেল। আমি খানিকক্ষণ চুপ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। একদিন যে-মানুষ দিল্লী-বোম্বাই-মাদ্রাজ করেছে, যে মানুষের বাড়িতে একদিন সারা ইণ্ডিয়ার ভি-আই-পিরা এসে উঠেছে, যে-মানুষের ছবি একদিন খবরের কাগজের ফ্রণ্ট-পাতায় ছাপা হয়েছে, সেই মানুষই আজ আমার মত সামান্য মানুষের কাছে এসে ধরনা দিচ্ছে। ভাগ্যের এও তো এক চরম ঠাট্টা। ঠাট্টাই তো।

সেই রাস্তার ওপর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার অফিসে নিজের ঘরে এসে বসলাম। মনে হলো—এ কেন এমন হলো। এমন হলো কেন? লোকনাথ কেন এমন হলো? কেন সে এত অর্থ,

এত সম্মান, এত প্রতিপত্তি, এত বড় ট্র্যাডিশনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো ? নাকি হেরে গেলে মানুষ এমনই হয়।

কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না।

যখন হয় তখন বোধহয় এমনি করেই হয়। একদিন লালাবাবু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কানে এল একটা কথা। পাশের বাড়িতে একটা ছোট মেয়ে তার বাবাকে বলছে—বাবা বেলা যায়, ওঠো—

ছোট্ট কথা। কিন্তু কথাটা কানে যেতেই সঙ্গে সঙ্গে লালাবাবু যেখানে যাচ্ছিলেন সেখানে আর গেলেন না। সংসার, অর্থ, পরিবার, সুখ, ঐশ্বর্য সব কিছু ছেড়ে সন্ন্যাসের পথে পা বাড়িয়ে দিলেন। আর পেছনে পড়ে রইল তাঁর সব কিছু। সত্যিই বেলা চলে যাচ্ছে, আর দেরি করলে চলবে না। লোকনাথের জীবনেও ঠিক তেমনি ঘটনাই হয়ত ঘটলো একদিন।

সেদিন রাত্রে বসুমতী দেবী পাশের ঘরে শুয়েছিলেন। হঠাৎ একটা চিৎকারের শব্দে চমকে উঠলেন—কে ? কে চেঁচাচ্ছে পাশের ঘরে ?

কিন্তু পাশের ঘরে তখন ১৯৪৫ সালের ৫ই আগস্টের মাঝ-রাত্রের বিভীষিকা। একদিন পৃথিবীতে বন্যা এসে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সেদিন কোথাও একখণ্ড মাটি ছিল না দাঁড়াবার মত। কোটি কোটি বছর ধরে মানুষ তিল-তিল করে তার পৃথিবীকে আবার নতুন করে তৈরি করেছে। তৈরি করেছে তার বিশ্বাস, তৈরি করেছে তার ধর্ম, তার ইতিহাস। এক এক করে এক-একজন মহাপুরুষ এসেছে আর জীবনের ওপর মানুষের বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে। মানুষ তার আস্থাকে আশ্রয় করে লিখেছে উপনিষদ, বেদ, বাইবেল, কোরাণ, গীতা। এই মানুষই রুশোর মুখ দিয়ে বলেছে— Everything is good as it comes from the hands of the author of Nature ; but everything degenerates in the hands of man' আবার এই মানুষই বার-বার

নেচারের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলে উঠলো—অয়ং অহং ভোঃ। অর্থাৎ আমিই সব। আমার ওপরে কেউ নেই।

১৯৪৫ সালের ৫ই আগস্ট। রবিবার সেটা। রবিবার দিন জাপানের সেই দ্বীপটায় সবাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে। প্রার্থনা করছে—আমাদের অর্থ দাও, ধন দাও, শত্রু জয় করবার ক্ষমতা দাও। আর দাও শান্তি। অখণ্ড অপরিমেয় শান্তি।

কলকাতায় গড়পার রোডের কার্তিক রায়ের বাড়িটাতেও সেদিন বড় শান্তির আবহাওয়া। দেয়ালের গায়ে মাদ্রাজের শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কার্তিক রায়ের দিকে চেয়ে হাসছেন। শুধু শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার নয়, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদও হাসছেন। হাসছেন মতিলাল নেহরু, হাসছেন মহাত্মা গান্ধীজী, হাসছেন আরো সবাই। কই, পারলে? পারলে তোমার সম্পত্তি ধরে রাখতে? আমরা তোমাকে পারমিট দিয়েছি, তুমিও আমাদের পার্টিকে অনেক চাঁদা দিয়েছ। কিন্তু তবু কি আমরা তোমাকে বাঁচাতে পারলুম! বাঁচাতে পারলুম তোমার অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌কে?

উনিশ শো পঁয়তাল্লিশের পাঁচুই আগস্ট, রবিবার দিন কি পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও আগে এসেছিল? যদি এসে থাকে তবে ইতিহাসে তার কোনও রেকর্ড নেই কেন? কেন যিশুখ্রীষ্ট বলেছিলেন—'তোমাদের কোনও ভাবনা নেই, আমি আছি!' কেন তথাগত বলেছিলেন—'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।' কেন সক্রেটিস বলেছিলেন—

'Be hopeful then gentlemen of the jury as to death; and this one thing hold fast that no evil can happen to a good man, whether alive or dead; even gods are not indifferent to his well-being.'

কেন তবে এসব কথা তোমরা আমাকে শিখিয়েছো?

বসুমতী দেবী ডাকলেন—কুসুম—

বিধবা হবার পর থেকেই কুসুম কর্তা-মার ঘরের ভেতরে

মেঝেতে শোয়। কখন মালিকের কী দরকার পড়ে কে বলতে পারে। শোবার আগে কুসুম বসুমতী দেবীর পায়ে হাত বুলিয়ে দেয়, মাঝরাত্রেও অনেক সময় ডাক পড়ে।

বসুমতী দেবী বলেন—এক গ্লাস জল দে তো কুসুম—

কুসুম ফ্রিজ থেকে জল এনে মাকে দেয়। খালি গ্লাসটা নিয়ে আবার সে যথাস্থানে রেখে আসে। তারপর মশারিটা গুঁজে দিয়ে আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়ে।

কিন্তু সেদিন রাত্রে অন্যরকম।

বসুমতী দেবী ডাকলেন—কুসুম—

কুসুম ধড়ফড় করে উঠে বসেছে। বললে—কী মা?

—ও ঘরে খোকা চেঁচাচ্ছে কেন? অত শব্দ হচ্ছে কীসের রে?

কুসুম যেন এতক্ষণে শুনতে পেলে। সেও কান পেতে রইল। চারদিকে দুম-দাম আওয়াজ হচ্ছে। কে যেন কী ভাঙছে। কে যেন জানলা-দরজা ভেঙে তচনচ করে ফেলছে।

বসুমতী দেবী বললেন—দেখি, উঠি, দরোয়ানকে ডাকি—

কুসুম বললে—আপনাকে উঠতে হবে না মা, আমি দেখে আসছি, দরোয়ানকে ডাকছি—

বলে কুসুম ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে গেল। বাইরে কোলাপসিবল গেট। চাবি থাকে রাসবিহারীর কাছে। রাসবিহারী কার্তিক রায়ের পুরনো বিশ্বস্ত পরিচারক। বহুদিনের পরিচয়ে এ বাড়ির নিজের লোক হয়ে গেছে সে। কিন্তু বুড়ো বয়েস হওয়ার জন্যে আর আগেকার মতন খাটতে পারে না। আগে কখনও কর্তাদের সঙ্গে, কখনও বা জামাইবাবুর সঙ্গে হিল্লি-দিল্লি ঘুরেছে, তাঁদের সেবা করেছে।

কিন্তু না, রাসবিহারীকে আর ডাকতে হলো না। অনেক আগেই সে আওয়াজ শুনে উঠে পড়েছে। উঠে চাবি খুলে ভেতরে ঢুকেছে। রাত্রে সাধারণতঃ বারান্দার আলো নিভিয়ে দেয়

রাসবিহারী। কিন্তু তখন সমস্ত বাড়ির আলো জ্বলে উঠেছে।

—কুসুম, তোর মা কোথায় রে?

কুসুম বললে—মা-ই তো আমাকে দেখতে পাঠালেন। কী হচ্ছে গো দাদাবাবুর ঘরে?

দাদাবাবুর ঘরে যে কী হচ্ছিল তা তখন কুসুমও বুঝতে পারেনি। সরকারবাবুরও ঘুম ভেঙে গেছে তখন। আউট-হাউসে বৈজু ড্রাইভার ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। তারও ঘুম ভেঙে গেছে। সেও দৌড়ে এসে দেউড়ির ভেতর ঢুকলো—

—দাদাবাবু, দাদাবাবু!

ঘরের বাইরে থেকে সরকারবাবু দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো।

—দাদাবাবু, ও দাদাবাবু—

পাঁচ

আবার স্মরণ করছি ১৯৪৫ সালের সেই ৫ই আগস্ট, রবিবার। পৃথিবীর মানুষ সত্যিই বড় নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল। ঘুমোচ্ছিল কারণ তার তো ভাবনা করার কিছু নেই। বহু যুগ আগেই নিশ্চিন্ত করে দিয়ে গেছেন মানুষের পিতা যিশুখ্রীষ্ট, তথাগত বুদ্ধদেব, নিশ্চিন্ত করে দিয়ে গেছেন ব্যাসদেব, বাল্মীকি, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ। আরো নিশ্চিন্ত করে দিয়ে গেছেন Social Contract-এর লেখক রুশো, ভলতেয়ার, সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিসটোটল। তাঁরা বলে গেছেন—আমাদের যন্ত্রণার বঞ্চনা দিয়ে যা বলে গেলাম, তারপর আর তোমাদের দুর্ভাবনা করার কিছু নেই। যত অত্যাচার আর যন্ত্রণার বিষ সব কিছু আমরা নিজেরা গলাধঃকরণ করে করে তোমাদের জন্যে অমৃত রেখে গেলাম। তোমরা অমৃতের পুত্র। আমাদের বাণীর তাৎপর্য তোমাদের জীবনে সত্য হয়ে উঠবে। আর ভয় নেই। মা ভৈঃ—

—দাদাবাবু, ও দাদাবাবু—

ভেতরে তখন আরো আওয়াজ হচ্ছে দুমদাম করে। সব পুড়ে যাক, সব ভেঙে গুঁড়িয়ে টুকরো-টুকরো হয়ে যাক। আর কারোর ওপর আমার বিশ্বাস নেই। মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু, পরমহংসদেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সবাই এতদিন আমাদের মিথ্যে কথা শুনিয়ে এসেছেন, স্তোকবাক্য দিয়ে এসেছেন। আর কাউকে বিশ্বাস নেই।

বহুদিন আগে বাড়িতে মাস্টার মশাই আসতেন পড়াতে। শুধু তো একজন মাস্টার নয়। সাতজন প্রফেসার ছিল আমার। কিন্তু সেই সাতজনের মধ্যে গোকুলবাবু ছিলেন প্রধান। পড়াতেন ইংরিজী। কই, গোকুলবাবুর কোনও কথার সঙ্গে তো আজকের ঘটনা মিললো না! এই ১৯৪৫ সালের ৫ই আগস্টের রবিবারের ঘটনা।

—দাদাবাবু, দাদাবাবু, দরজা খুলুন।

কুসুম গিয়ে বৈজুকে জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে বৈজু?

গিরিধারীও এসে দাঁড়িয়ে ছিল কাছে। সেও পুরনো আমলের লোক। জামাইবাবুর সঙ্গে বিলেত গিয়েছিল। আমাকে জন্মাতে দেখেছে। কুসুম তাকেও জিজ্ঞেস করলে—কী হয়েছে গিরিধারী?

—দাদাবাবু, দাদাবাবু—

অনেক রাত্রে একজন মিলিটারি ডিটেকটিভ এসে দরজা ঠেলতে লাগলো।

—দরজা খোল, দরজা খোল, ওপন্ দ্য ডোর—

ভেতর থেকে দরজা খুলে দিয়েছে সুইনী। আমেরিকান আর্মির মেজর। মেজর চার্লস ডবলিউ সুইনী। মেজর হলে কী হবে, বয়েসে খুবই ছোট। মাত্র চব্বিশ। মানে চব্বিশ বছরের জোয়ান ছোকরা যাকে বলে। সবে মাত্র গোঁফ-দাড়ি উঠেছে। সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে তার।

জিজ্ঞেস করলে—হোয়াট'স্ আপ্? কী চাই আপনার?

—আপনি ম্যাসাচুসেটস থেকে এসেছেন ?

—হ্যাঁ।

—আপনার নাম ?

—মেজর চার্লস ডবলিউ সুইনী।

—তাহলে আমার সঙ্গে আপনাকে একবার আসতে হবে।

—কোথায় ?

—টার্গেট এরিয়াতে।

টার্গেট এরিয়া মানে এ্যাকশান্ এরিয়া। অর্থাৎ আসল কাজে নামতে হবে। শুধু শুয়ে শুয়ে ঘুমনো আর নয়, বসে বসে আরাম করাও হয়। এবার কাজ। আসল কাজের ডাক পড়েছে এবার।

তারপর গাড়িতে উঠে চললো দুজনে। আর তারপর যথাস্থানে পৌঁছে লোকটা সুইনীর কানের কাছে মুখ এনে বললে—আপনাকে আমেরিকার জন্যে একটা টপ-সিক্রেট কাজ করতে হবে—

—কী কাজ ?

মিলিটারিতে যারা একবার কাজে ঢুকেছে, তাদের এ-ধরনের প্রশ্ন করতে নেই। তাদের কাজের একটাই নিয়ম—হয় করো, নয় মরো। দেশ নয়, মানবতা নয়, মায়া নয়, দয়া নয়। তোমার একমাত্র কাজ হুকুম তামিল করা। যারা তোমার কোনও ক্ষতি করেনি, যাদের তুমি চেন না, যাদের তুমি দেখনি, হুকুম হলে তাদের ওপরই তোমায় বোমা ফেলতে হবে।

তা বোমা ফেলার কাজ শিখছে তখন সব পাইলট। ছোট ছোট দলে পাইলটরা রাতের অন্ধকারে ফ্লোরিডার আকাশে চলে যায়। বড় ধরা বাঁধা নিয়মে শৃঙ্খলিত তাদের জীবন-যাত্রা। সে নিয়মকানুন তৈরি হয় ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসের গোপন বৈঠকে। সেখানে দফতরের কাগজপত্রে লেখা থাকে পৃথিবীর কোথায় কত লোকের বাস। কী তাদের নাম, কী তাদের ধর্ম, কী তাদের বিশ্বাস। তারা কি ভগবানে আস্থা রাখে ? না,

অনাস্থাবাদী ? তারা আমাদের পক্ষে, না বিপক্ষে ? তারা কি আমাদের ঈশ্বর বলে মানে, না মানে অন্য কোন পাওয়ারকে ? যদি সে-সব খবর জানা না থাকে তো সেখানে লোক পাঠাও। সেখানকার এ্যামবাসীতে আমাদের চর আছে, সেই চরদের সঙ্গে দেখা করো। খবর আনো তাদের কোন্ দিকে মতি-গতি। দরকার হলে সেখানকার লোকদের ঘুষ খাওয়াও। তাদের ধরে ধরে এ্যামব্যাসীতে নেমন্তন্ন করে নিয়ে এসো। লাঞ্চ খাওয়াও। তাদের সঙ্গে হেসে কথা বললেই তারা গলে যাবে। সাদা চামড়ার মানুষরা খাতির করলে তারা এমনিতেই অবশ হয়ে পড়ে। তার ওপর তাদের সঙ্গে সমান হয়ে মেশবার ভাণ করো। তারা যেন বুঝতে না পারে যে, আমরা তাদের প্রভু আর তারা আমাদের চাকর। আর তাতেও যদি তারা না গলে তো মদ গিলিয়ে দাও। ককটেল-পার্টির নাম করে তাদের কষে মদ গিলিয়ে দাও। তারা বড় সচ্চরিত্রের বড়াই করে, তারা আর্য-সভ্যতার বড়াই করে। দাও তাদের চরিত্র নষ্ট করে, দাও তাদের আর্যসভ্যতার গর্ব ধূলিসাৎ করে। দাও তাদের মাথার ওপর বোমা ফেলে—

—দাদাবাবু, দাদাবাবু—

কুসুম শুনতে পেলে দাদাবাবুর ঘরের ভেতরে তখনও দুম-দাম করে শব্দ হচ্ছে। সরকারবাবু কী করবে বুঝতে পারলে না। গিরিধারী পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে বললে—হ্যাঁ রে গিরিধারী, মাঈজী কোথায় ?

কুসুমও শুনেছিল কথাটা। গিরিধারীর হয়ে সেই-ই উত্তর দিলে—মা-ই তো আমাকে জানতে পাঠালে এখানে কীসের হট্টগোল হচ্ছে—

কথা শেষ হবার আগেই বসুমতী দেবী একেবারে সশরীরে ঘটনাস্থলে এসে হাজির।

—কী হয়েছে রে এখানে গিরিধারী ? খোকার ঘরের ভেতরে কী হচ্ছে ?

সরকারবাবু বললে—আজ্ঞে, সেই জন্যেই তো আমি দরজা ঠেলছি ঘরের, কেউ জবাব দিচ্ছে না—

—ঘরে আর কে আছে ?

—আজ্ঞে, খোকাবাবু ছাড়া ঘরে আর কে থাকবে ?

—তাহলে দরজা খুলছে না কেন শুনি ? লাইব্রেরির ভেতর একলা কী করছে খোকা ?

লাইব্রেরির ভেতরে খোকা কী করছে, তাই-ই যদি জানতে পারা যাবে, তাহলে এতক্ষণ এত হৈ-চৈ বা হচ্ছে কেন ?

বসুমতী দেবী বললেন—তাহলে দরজা ভাঙো—

শেষ পর্যন্ত তা-ই ভাঙতে হলো। সেকালের বর্মা-টিকের দরজা, কর্তা কার্তিক রায় ভালো ঠিকেদার দিয়ে সে-সব জানালা-দরজা তৈরি করিয়েছিলেন। মজবুত মাল-মশলা দিয়ে তৈরি বাড়ি। কর্তা টাকারও কার্পণ্য করেননি, টাকার অভাবও কখনও ছিল না তাঁর।

শেষ পর্য্যন্ত শাবলের ঘায়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো দরজা।

বহুদিন আগে কার্তিক রায় যখন এ-পাড়ায় বাড়ি করেন, তখন সমস্ত দামীদামী মাল-মশলা দিয়ে এ-বাড়ি বানিয়েছিলেন। বানিয়েছিলেন এই আশায় যে বংশপরম্পরায় এ-বাড়ি উত্তরপুরুষের কাছে রায় বংশের ঐশ্বর্যের পীঠস্থান হয়ে থাকবে। একদিন সবাই আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে দেখাবে। বলবে—এই কার্তিক রায়ের বাড়ি গো, এইখানেই অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌-এর গোড়াপত্তন হয়।

বসুমতী দেবীর এখন না-হয় বয়েস হয়েছে। এখন না-হয় সব দেখেশুনে তিনি নির্বাক হয়ে গেছেন। দরকারে-অদরকারে এখানে-সেখানে খোকার ভালোর জন্যে ছুটে বেড়ান। কিন্তু সেদিন তো আর এমন ছিলেন না। সেদিনকার ছবিও তা তাঁর বাড়ির দেওয়ালে-দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে। যেবার মতিলাল নেহরু লখ্‌নো-কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, সেবার কার্তিক রায় আর

বসুমতী দেবী দুজনে এখানকার কংগ্রেসের ডেলিগেট হয়ে গিয়েছিলেন। সে কী খাতির সেখানে বসুমতী দেবীর!

সেদিন সমস্ত কনফারেন্সের মধ্যে সকলের চোখ পড়েছিল বসুমতী দেবীর দিকে। জওহরলালজী বসুমতী দেবীকে নমস্কার করছেন, সেই ছবিটা সেদিনও তাঁর ড্রয়িংরুমে ঝুলছে!

তারপর?

তারপর তো কতদিন কেটে গেছে। পৃথিবী তো তারপর কতবার কক্ষ-পরিবর্তন করেছে নিঃশব্দে। রায় পরিবারের প্রাসাদ-সৌধের চূড়োটা দু-দুবার ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। তবু তিনি এ-পরিবারের মর্যাদাকে ধ্বসে পড়তে দেননি। উঁচু করে রেখে দিয়েছেন রায়বংশের জয়ধ্বজা! প্রথম যখন স্বামী মারা গেলেন, তখন তিনি কিছুক্ষণের জন্যে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। ভেবেছিলেন তিনিও হয়ত ভেঙে পড়বেন সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু না।

সরকারবাবুকে ডেকে আনিয়ে বলেছিলেন—ফ্যাক্টরির ক্যাশিয়ারকে আমার কাছে একবার ডেকে আনুন তো—

সত্যিই সেদিন বসুমতী দেবীর আচরণ দেখে সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। মানুষটা অমন পাথরের মত কঠিন হতে পারলো কেমন করে, এইটে ভেবেই সবাই চমকে উঠেছিল। সবাই ভেবেছিল টাকাই হয়ত এমন করে সেদিন বসুমতী দেবীকে চাঙ্গা করে রাখতে সাহায্য করেছিল। বসুমতী দেবীও জানতেন সে-কথা। কিন্তু অন্য লোকে কী বলে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার তাঁর সময় ছিল না তখন। ফ্যাক্টরির ক্যাশিয়ার আসতেই বলেছিলেন—কাল থেকে রোজ এক ঘণ্টার জন্যে আমি অফিসে যাবো, সবাইকে বলে দেবেন—

অমন যে মেয়ে বীণা, সে-ও অবাক হয়ে গিয়েছিল।

বলেছিল—মা, তুমি যাবে ফ্যাক্টরিতে?

বসুমতী দেবী বলেছিলেন—কেন যাবো না, আমিও তো

কোম্পানির একজন ডিরেক্টর—

বীণা বলেছিল—কিন্তু তুমি অর্ডার দিলেই অফিসের ফাইল-পত্র তো সমস্তই বাড়িতে এসে দিয়ে যাবে ওরা—

বসুমতী দেবী বলেছিলেন—তা দিয়ে যাবে, কিন্তু তাতে ওরা কেউ তো বুঝতে পারবে না যে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টার নেই—আমি নিজে অফিসে গেলে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ফাঁকটা ধরা পড়বে না—

—কিন্তু তাহলে তুমিই কি কোম্পানির নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টার হবে?

বসুমতী দেবী বলেছিলেন—আমি কেন ম্যানেজিং ডিরেক্টার হবো। সন্তোষ লনডন থেকে ফিরলে সে-ই ম্যানেজিং ডিরেক্টার হবে—আমার তো ছেলে নেই, জামাই-ই আমার ছেলে—

তা তা-ই হলো। কার্তিক রায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে সন্তোষ রায়ই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টার হলো। কোম্পানি যেমন চলছিল আবার তেমনি চলতে লাগলো। অটো-ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কস্-এর স্টাফ জানতেই পারলো না যে মিস্টার রায় আর নেই। অটো-ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ বরাবর ইণ্ডিয়ার বাইরে থেকে পার্টস্ আনিয়েছে। এখানে বোম্বাইতে তাদের ফ্যাক্টরি। সেই গাড়ির ইস্টার্ন রিজিয়নের ডিস্ট্রিবিউটার অটো-ইনজিনিয়ারিং-ওয়ার্কস্। এখানে গাড়ি শুধু বিক্রিই হয় না, গাড়ি মেরামতও হয়। গাড়ির ফরেন পার্টস্ও বিক্রি হয়। সন্তোষ তখন ছোট। সন্তোষ জানতোও না যে অত শিগ্রি তাকে সমস্ত কিছুর ভার নিতে হবে।

কিন্তু পৃথিবী কি কারোর জন্যে আটকে থাকে? জুলিয়াস সিজার মারা যাবার পর কি রোম-সাম্রাজ্যই আটকে থেকেছে? রোম-গ্রীস-ঈজিপ্ট, কেউ-ই তো থেমে নেই। অত বড় যে পার্শিয়ান সাম্রাজ্য, তাও রয়েছে। হয়তো তাদের ভূগোল বদলিয়েছে, ইতিহাস বদলিয়েছে। হয়তো তাদের নামও বদলে গেছে কালক্রমের ঘুর্ণাবর্তে। বড় বড় ইতিহাসের বইতে তার

উত্থান-পতনের কাহিনী নিয়ে হয়ত বড়-বড় পরিচ্ছেদও লেখা হয়েছে। সেই ইতিহাস পড়ে মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশ করে বড় বড় চাকরিও পেয়েছে হয়ত অনেকে। কিন্তু থেমে থাকেনি পৃথিবী। যিশুখৃষ্ট, তথাগত বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, মহম্মদ, পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, চৈতন্যদেব—সবাই পৃথিবীর গতিকে সোজা পথে চালাতে চেয়েছে, কিন্তু পৃথিবী কি সেই সোজা পথেই চলেছে বরাবর?

কার্তিক রায় মারা যাবার পর অটো-ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌ও সেই তার নিজের বাঁকা-পথেই চলেছে। কিন্তু তা বলে থেমে থাকেনি কখনও। কারণ থেমে থাকা নিয়ম নেই বলেই সে থেমে থাকেনি।

কিন্তু এবার থামলো।

থেমে যাওয়া না হলেও থেমে থাকলো। এই লোকনাথই তাকে চিরকালের মত থামিয়ে দিলে।

কিন্তু কেন থামলো তার কারণ বলতেই এই কাহিনী লেখা।

মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিংশশতাব্দী কতটুকু? ইতিহাসের বই পড়তে পড়তে লোকনাথেরও একদিন সেই উপলব্ধি হলো। একদিন জলে-জলময় ছিল এই পায়ের তলার আশ্রয়। সেদিন নিয়ম করে পুব দিকে সূর্য উঠতো, আর পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ডুবতো নিয়ম করেই। হাজার হাজার বছর এমনি করে কাটবার পর একদিন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এই ঘূর্ণাবর্তের ফলে একটা ভূখণ্ড জেগে উঠলো সেই জলের অভ্যন্তর ভেদ করে। সে আমাদের এই হিমালয়। ধীরে ধীরে সেই ভূখণ্ডের ওপর জেগে উঠলো জড় আর জীব-জগৎ। গাছ, পালা, লতা, গুল্ম, তার সঙ্গে জন্ম নিল জীবন। সরীসৃপ, পাখি, দ্বিপদ, চতুষ্পদ। তারপরে জন্ম নিলে মানুষ। একেবারে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের শেষতম সৃষ্টি। সে জন্ম নেবার পর

ঊর্ধ্ব-অধঃ চেয়ে দেখলে। চেয়ে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। সে নিজেকেই প্রশ্ন করলে—কে সে? কে তাকে সৃষ্টি করলে? কী তার উদ্দেশ্য! কেন সে জন্ম নিলে? কোথায় তার শেষ?

লোকনাথ নিজেকেও একদিন এই প্রশ্নই করলে।

একদিন ছোটবেলাতেই দিদিমাকে লোকনাথ জিজ্ঞেস করলে—আমি কে দিদিমা?

বসুমতী দেবী তো অবাক।

বললেন—এ আবার কী কথা? তুই কে মানে?

লোকনাথ বললে—মানে, আমি কোত্থেকে এলুম দিদিমা? আমি কোথায় ছিলুম?

বসুমতী দেবী আরো অবাক।

মেয়েকে ডেকে বললেন—ওরে বীণা, তোর ছেলে কী জিজ্ঞেস করছে গ্যাখ্—

বীণা ঘরে এসে দাঁড়ালো—কী জিজ্ঞেস করছে?

বসুমতী দেবী মেয়েকে বুঝিয়ে বললেন সব। তারপর বললেন—তোর ছেলে খুব ইনটেলিজেণ্ট হবে রে। এই বয়েসেই ওর এত জ্ঞান!

কিন্তু লোকনাথ নাছোড়বান্দা। বলতো—বলো না দিদিমা, আমি কে?

বসুমতী দেবী বলতেন—কে আবার, আমার নাতি, বীণার ছেলে! তোর বাবা সন্তোষ রায়ের তুই একজন বংশধর—

—তা তো জানি, কিন্তু আমি কোত্থেকে এলুম?

বীণা বলতো—কোত্থেকে আবার আসবি? আকাশ থেকে!

—আর তুমি? তুমি কোত্থেকে এলে?

—আকাশ থেকে!

—দিদিমা কোত্থেকে এল?

—দিদিমাও আকাশ থেকে এসেছে!

—আর আমার বাবা?

—বাবাও আকাশ থেকে এসেছে।

লোকনাথ সেই জবাব শুনে তারপর থেকে সেই ছেলেবেলাতেই মাঝে-মাঝে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতো। ওই আকাশ, ওই সামনের আকাশ থেকে? এই গড়পারের পাড়ার সব লোকই কি তবে আকাশ থেকে এসেছে? ট্রাম-রাস্তার ওপর যে-সব বাড়িগুলো রয়েছে, ওই সব বাড়ির মানুষগুলোও কি তাহলে আকাশ থেকে এসেছে? তারপর এক-একদিন বৈজুর সঙ্গে ছাদে উঠতো। ছাদে উঠে অনেক দূরে চেয়ে দেখতো। ওই তো কত বাড়ি। কত কারখানা। কারখানার মাথায় কত চিমনি থেকে কত ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ওর আড়ালে কত লোক আছে। লোকে-লোকে লোকারণ্য। লোক ভর্তি কলকাতা শহরে। কলকাতা পেরিয়ে আর একটা কলকাতা আছে। তার ওপারে আর একটা কলকাতা। আর একটা। আরো আরো কত কলকাতা। পৃথিবী ভর্তি কলকাতাগুলো সারা পৃথিবীময় কিল্‌বিল্ করছে।

বৈজুকে জিজ্ঞেস করতো—হ্যাঁ রে বৈজু, ওই যত সব লোক, ওরা কোত্থেকে এসেছে রে?

বৈজু বলতো—গাঁ থেকে—

—গাঁ? গাঁ মানে?

বৈজু বলতো—গাঁ মানে গাঁও।

গাঁ আর গাঁও-এর তফাতটা বুঝতে পারতো না লোকনাথ। জিজ্ঞেস করতো—তুই কোত্থেকে এসেছিস রে বৈজু?

—আমি? আমি এসেছি বেহার থেকে।

—বেহার? সে কোথায়?

বৈজু বলতো—সে অনেকদূর। সেখানকার ছাপরা জিলা থেকে আমি এসেছি—

দিদিমাকে এসে লোকনাথ বলতো—জানো দিদিমা, বৈজুটা কিছ্ছু বোঝে না, একেবারে বোকা।

—কেন? কী করেছে ও?

—ও বলে কী জানো? ও বলে ও বেহারের ছাপরা জেলা থেকে, এসেছে, কী বোকা ও। আমরা সবাই এসেছি আকাশ থেকে আর ও কি না এসেছে ছাপরা জেলা থেকে। ও কিছ্ছু জানে না—কী বোকা!

বসুমতী দেবী মেয়েকে বলতেন—তোর ছেলে দেখছি খুব ইন্‌টেলিজেণ্ট হবে, জানিস, ও আমাদের বংশের নাম রাখবে—কর্তার মত বুদ্ধি-সুদ্ধি হয়েছে ওর—

তা এ তো গেল একেবারে ছোটবেলার ব্যাপার।

তারপর একটু বড় হবার পর হঠাৎ একদিন দেখলে বাড়িসুদ্ধ সবাই কাঁদছে। বাইরে থেকেও অনেক লোক এসে জড়ো হয়েছে। লোকনাথ এ-ঘর থেকে ও-ঘরে গেল। সকলের মুখই গম্ভীর।

মার কাছে গিয়ে লোকনাথ জিজ্ঞেস করলে—তোমাদের কী হয়েছে মা?

বীণা লোকনাথকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো।

লোকনাথ নিজের মাথাটা মা'র হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগলো—কাঁদছো কেন মা? কী হয়েছে তোমার বলো না?

মা তখন কাঁদবে না ছেলের কথার উত্তর দেবে!

আর সহ্য হলো না লোকনাথের। সে দৌড়ে গেল অন্য ঘরে। সেখানেও কান্না! দিদিমা কাঁদছে। বাড়ির সরকারবাবু, রাসবিহারী, ঝি, দরোয়ান, কুসুম, ঠাকুর সবাই কেমন কান্নার মতন মুখ করে আছে। কোথাও কোনও আনন্দ নেই। নিরাভরণ নিঃস্বতার ছায়া সর্বত্র। এমন তো কোনদিন হয় না।

খানিক পরে কে একজন তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতেই লোকনাথ ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম এমনই এক জিনিস যা সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে সব সুখ-দুঃখের অতীত করে দেয়। কিন্তু সেই এক-

ঘুমেই সে যেন এক যুগ পরিক্রমা করে এসেছিল সেদিন। একদিনের ঘুমের মধ্যে যে এমনভাবে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসে তা বোধ হয় সেই-ই প্রথম বার উপলব্ধি করেছিল সে।

সে এক নতুন পৃথিবী যেন। নতুন আবিষ্কারের মত সমস্ত বাড়িটার চেহারা তখন আরো বদলে গেছে। আরো অনেক লোকের ভিড় জমে গেছে বাড়িতে। নতুন নতুন মুখ সব, নতুন নতুন মানুষ। তারই মধ্যে এক ফাঁকে একেবারে রঙ্গমঞ্চের মধ্যে গিয়ে সে হাজির হয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখে তার বাবা শুয়ে আছে বড় বারান্দাটার নিচে—

বাবাকে সেই অবস্থাতে শুয়ে থাকতে দেখেই লোকনাথ ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়েছিল সেইদিকে।

হঠাৎ কে এসে ধরে ফেললে তাকে।

বসুমতী দেবী দেখতে পেয়েছিলেন। বললেন—ওকে এখেনে কে আনলে? এই রঘু, এই গিরিধারী, এই বৈজু—

একগাদা নাম বলে গেলেন বসুমতী দেবী। যে হোক একজন ছেলেটাকে ধরুক। যেন বুঝতে না পারে যে, ওর বাবা মারা গেছে! এদিকে বসুমতী দেবী তার মেয়েকে দেখতে ব্যস্ত, লনডন থেকে প্লেনে করে জামাই-এর ডেড-বডি এসে গেছে। এ সময়ে তাঁর অনেক কাজ। বাড়িতে এত লোক থাকতে খোকাকে সামলাতে হবে কিনা তাঁকে নিজেকেই?

কিন্তু মজাটা হলো তার পরেই। গিরিধারীকে প্রথম দিন থেকেই ব্যস্ত-বিরক্ত করে তুলেছিল খোকাবাবু।

লোকনাথ জিজ্ঞেস করেছিল—বাবা ওখানে শুয়ে আছে কেন রে, বল্ না! বল্ না তুই।

গিরিধারী প্রথমে বলতে চায়নি। কেন বাবু ওখানে বারান্দার ওপর শুয়ে আছে, তার কী কারণ কে বলবে।

শেষকালে অনেক পীড়াপীড়ির পর গিরিধারী বললে—বাবু মারা গেছে—

—মারা গেছে মানে কী রে?

গিরিধারী বললে—মারা গেছে মানে বাবু আর খাবে না দাবে না, কথা বলবে না, জাগবে না, বাবুর আর নিঃশ্বাস পড়বে না। বাবুকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হবে।

—কেন? পুড়িয়ে ফেলবে কেন বাবাকে? বাবার লাগবে না?

—না, মারা গেলে আর কিছু লাগে না।

—কিন্তু কেন মারা গেল বাবা?

গিরিধারী ছেলেমানুষের প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইছিল না। কিন্তু খোকাবাবুও ছাড়বে না। সে-ও নাছোড়বান্দা।

সেও বলতে লাগলো—বল্ না গিরিধারী, বল্ কেন বাবা মারা গেল?

গিরিধারী কী-ই বা বলবে। যে-প্রশ্ন একদিন বহু যুগ আগে এক রাজার ছেলে তার রথের সারথিকে জিজ্ঞেস করে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, গড়পারের এক অভিজাত পরিবারের আর একটি ছেলে সেই একই প্রশ্নের মীমাংসা শুনতে চাইলে।

সন্তোষ রায় মারা গেলেন। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকলো। বহু অতিথি-অভ্যাগতের আবির্ভাব হলো—কিন্তু সেদিনকার সেই ছোট ছেলে লোকনাথের প্রশ্নের জবাব কেউ-ই দিতে পারলে না। শুধু এইটুকু বুঝলো সে যে, এ পৃথিবীতে যারাই জন্মেছে তারাই একদিন তার বাবার মত বুড়ো হবে, মারা যাবে। আরো বুঝলো যে, মানুষ যেমন জানে না কোথা থেকে সে এসেছে, তেমনি মৃত্যুর পর কোথায় সে যাবে তাও সে জানে না।

তারপর একদিন যখন আরো বয়েস বাড়লো, তখন একদিন তার মা-ও চলে গেল। সেদিনও ঠিক তেমনি। তেমনি বারান্দাটার ওপর মা শুয়ে রইল চিৎ হয়ে। মার মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরোল না। সবাই ঠিক আগেকার মত কান্নাকাটি করতে লাগলো। তবু মা-ও বাবার মত আর সাড়া-শব্দ দিলে না।

তারপর কয়েকজন লোক একটা খাট নিয়ে এসে মাকে কাঁধে করে নিয়ে কোথায় চলে গেল।

মনে আছে আর সকলের কান্না দেখে সেদিন লোকনাথের চোখ দিয়েও কান্না বেরিয়ে এসেছিল।

তারপর রইল শুধু দিদিমা। অটো-ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কস্-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিসেস বসুমতী দেবী। ফিফ্‌টিওয়ান পার্সেণ্ট শেয়ারের মালিক।

বসুমতী দেবী লোকনাথের টিচারদের বলে দিলেন—দেখুন, আমার নাতিই একদিন বড় হলে অটো-ইনজিনিয়ারিং-ওয়ার্কস্-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টার হবে, আপনারা ওকে সেইভাবে মানুষ করে তুলুন—

কিন্তু লোকনাথের সেই পাগলামি পাগলামি ভাব তখনও গেল না। একটা নতুন তত্ত্ব পেলেই সে প্রশ্নের ঝড় তুলে দেয়।

বলে—এটা কেন হলো স্যার?

মাস্টার মশাই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

বলেন—এই রকমই চিরকাল হয়ে আসছে, চিরকাল এমনি হবে। এর মধ্যে আর 'কেন' নেই।

লোকনাথ তবু খুশি হয় না, বলে—কিন্তু কেন, 'কেন' নেই? সব জিনিসেরই তো একটা কারণ থাকতে হবে?

শেষে অপারগ মাস্টারমশাইরা বলেন—তুমি আরো বড় হও, তখন আরো বই পড়বে, আরো জানতে পারবে—

প্রশ্নের জ্বালায় শেষকালে বসুমতী দেবীও অস্থির হয়ে উঠলেন।

একদিন বললেন—অত কথার উত্তর দিতে পারি নে বাপু, ছেলেমানুষ ছেলেমানুষের মত থাকবে। ছেলেমানুষের আবার অত কথা কী? এখন ছেলে বয়েস, যা বলছি তাই কর—

লোকনাথ বলতো—কিন্তু আমার যে জানতে ইচ্ছে করছে—

বসুমতী দেবী বলতেন—অত জানতে ইচ্ছে করা ভালো নয়।

ছোট ছেলে ছোট ছেলের মত থাকবে, অত ডেঁপোমি কি ভালো ?

ডেঁপোমি! সেইদিনই লোকনাথ কথাটা লিখে রাখলো তার ডায়েরিতে। কথাটা নতুন। এই রকম কত নতুন-নতুন শব্দ লিখে লিখে তার খাতার পাতা ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। নতুন নতুন কৌতূহল, নতুন নতুন প্রশ্ন, নতুন নতুন শব্দ, সমস্ত তার খাতায় লেখা থাকতো। একদিন যখন বড় হবে সে তখন এই কৌতূহল, এই প্রশ্ন, এই শব্দের সমাধান মিলবে। তখন লোকনাথ মানুষ হবে।

একদিন লোকনাথের জন্মদিন উপলক্ষে বসুমতী দেবী আমাদের কয়েকজনকে নেমন্তন্ন করলেন। আমরা মাত্র কয়েকজন। লোকনাথই নিজে আমাদের ডেকে কথাটা জানালে। দিদিমা বলেছে তাদের বাড়িতে যেতে।

সেই বোধহয় লোকনাথদের বাড়িতে আমাদের প্রথম যাওয়া। বাড়ির সামনে কম্‌পাউনড্‌ ঘেরা পাঁচিল। গেট-এ দরোয়ান। ভেতরে শ্বেত-পাথরের মেঝে। ঝাড়-লণ্ঠন। ঝকঝকে ফার্নিচার। নিবিড় অভ্যর্থনা। আমরা সবাই কৃতার্থ ধন্য হয়ে গেলাম। বিগলিত বোধ করলাম। আমরা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সব। লোকনাথের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়ি। লোকনাথ ক্লাশের ফার্স্ট বয়। তার জন্মদিন।

আমরা যা-যা উপহার নিয়ে গিয়েছিলাম, তার দিকে চেয়েও দেখলে না লোকনাথ। অল্প দামের সব উপহার আমাদের। বাবা-মা'র কাছে জোর করে চেয়ে-চিন্তে পয়সা আদায় করে কিনে-ছিলাম জিনিসগুলো। কেউ দিয়েছিলাম রবি ঠাকুরের বই, কেউ সস্তা ফাউনটেন পেন, কেউ বিদ্যাসাগরের একটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। এই রকম সব জিনিস।

লোকনাথের দিদিমা বসুমতী দেবী খুব খুশি হলেন আমাদের দেখে! বললেন—বাঃ, তোমাদের টেস্ট দেখছি খুব ভালো, চমৎকার তোমাদের পছন্দ—

কিন্তু লোকনাথ যেন কেমন খুশি হলো না। মুখ বেঁকিয়ে রইল সব সময়। সে ততক্ষণে তাদের বাড়ির ঐশ্বর্য দেখাতেই ব্যস্ত, কত বড় বাড়ি, কত বড় ঘর। অথচ তুজন মাত্র প্রাণী—দিদিমা আর নাতি। লোকনাথ যে-ঘরে বসে লেখাপড়া করে সে-ঘরে কী চমৎকার টেবিলল্যাম্প। তার ধরে টানলেই নিচে নেমে আসে, আবার ঠেলে দিলে ওপরে উঠে যায়। বই-এর শেলফের ওপর থাকে-থাকে বই সাজানো। দাদামশাই-এর বিরাট লাইব্রেরি তো ছিলই। তার দাদামশাই কার্তিক রায় বিলেত থেকে বই কিনে আনতেন। চামড়ার মলাট দিয়ে বাঁধিয়ে সোনার জলে নাম লিখিয়ে নিতেন। সেই দেখাদেখি লোকনাথকেও দিদিমা নানান বই কিনিয়ে দিয়েছে।

আর ছবি !

সেই বিখ্যাত ছবিগুলো লোকনাথ দেখাতে লাগলো। ওই ছাখ, রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে আমার দাদামশাই কথা বলছে। ওই ছাখ, মহাত্মা গান্ধী। মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় এলে আমাদের বাড়িতে উঠতেন কি না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—ওটা কে ?

লোকনাথ বললে—শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। আর এই হলো শরৎচন্দ্র বোস, সুভাষ বোস, মতিলাল নেহরু—

এই বাড়ির এই ঘরে বসেই ছবিগুলো তুলেছিল কোনও ফটোগ্রাফার। তার পাশে আরো কত মহাপুরুষের ছবি টাঙানো রয়েছে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, লোকমান্য তিলক, গোখলে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আরো কত সব মহাপুরুষ···

আমরা অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। মনে হলো লোকনাথ ধন্য। লোকনাথ সৌভাগ্যমান। আমাদের চোখে মুখে বোধহয় সেই ভাবটা ফুটে উঠেছিল। লোকনাথও তা জানতো। লোকনাথ জানতো আমরা গরীব, আমরা মধ্যবিত্ত, আর সে বড়লোকের তুলাল।

বললে—এই ছাখ, দিদিমা আমাকে জন্মদিনে এই কলমটা দিয়েছে—

—কলম ?

আগাগোড়া সোনায় মোড়া একটা ফাউনটেন্-পেন।

জিজ্ঞেস করলাম—কত দাম রে এর ?

গর্বে লোকনাথের চোখ ছুটো ঠিকরে বেরিয়ে এল।

বললে—পাঁচশো তের টাকা—

আমরা দাম শুনে চমকে উঠলাম। একটা কলমের এত দাম ? হোক না সোনার, হোক না বিলিতী জিনিস। তা বলে এত দাম ?

লোকনাথ বললে—পাঁচশো তের টাকা তো সস্তা রে। আমার দিদিমার একটা কলম আছে, সেটার দাম আটশো চল্লিশ টাকা—

আমরা যে-কজন নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম, তারা সবাই চমকে উঠলাম। বড়লোকদের কাণ্ডই আলাদা। তাদের কত সুখ, কত আরাম, কত তাদের খেয়াল। সেই খেয়াল তারা ইচ্ছামত চরিতার্থ করতেও পারে। বড়লোকরাই ধন্য এ-জগতে !

কিন্তু তবু আমাদের কৌতূহল গেল না। জিজ্ঞেস করলাম —একটা কলমের এত দাম কী করে হয় রে ?

লোকনাথ বললে—কলমের নিবটা যে হীরের—

—হীরের ?

লোকনাথ বললে—হ্যাঁ, ওই হীরের জন্যেই তো অত দাম নেয় !

আমরা আরো অবাক হয়ে গেছি তখন। কলমটার ক্যাপ খুলে কলমের নিবটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম। হীরের গয়না মেয়েরা পরে শুনেছি। তাও সব সময়ে খাঁটি হীরে নয়। ঝুটো হীরেকেও লোকে আসল হীরে বলে চালায়। কিন্তু কলমের নিব যে আবার হীরের তৈরি হতে পারে, তা তো আমরা কল্পনাও

থাকুক, মেয়েমানুষের সঙ্গে কোনও রকম সংসর্গের দোষ তো কেউ দিতে পারবে না।

কিন্তু তবু জোর করে কিছুই বলা যায় না। লোকনাথের টাকা আছে, লোকনাথ বড়লোক, লোকনাথের দিদিমা মারা গেলে সমস্ত সম্পত্তি লোকনাথ পাবে। এ তথ্য বাইরের লোকের কাছে অজানা নয়। যদি মেয়েমানুষ কেউ এসে জোটে তো তাকে দোষ দেওয়া যায় না—

বিকাশ বললে—মেয়েমানুষ থাকলে আপত্তি নেই, কিন্তু এ একেবারে যে রাস্তার মেয়েমানুষ—

জিজ্ঞেস করলাম—তুই কী করে জানলি ?

বিকাশ বললে—আমি যে নিজের চোখে দেখলুম—

—কোথায় ?

বিকাশ বললে—প্যারাগন সিনেমার পেছনে যে যাদুগোপালের একটা তেলেভাজার দোকান আছে, সেখানে। দেখলাম একটা মেয়ের সঙ্গে বসে লোকনাথ গল্প করছে।

আমি বললাম—কিন্তু যাদুগোপালের দোকানে বসে গল্প করবার জায়গা কোথায় ?

—বসে গল্প করবার জায়গা সামনে নেই, কিন্তু ভেতরে ? লোকনাথ তো একেবারে ভেতরে চলে যায়। যেখানে আলুর চপ বেগুনি রান্না হয়—দেখলুম সেখানে দুজনে বসে বেশ হেসে হেসে গল্প করছে—

—কিন্তু মেয়েটা কে ?

বিকাশ বললে—তা কে জানে। আমি কি তাদের দেখা দিয়েছি, না তারা আমাকে দেখতে পেয়েছে !

তা শুধু বিকাশই নয়, অন্য অনেক জায়গা থেকেও খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, লোকনাথ নিজেদের অফিস ছেড়ে দিয়েছে। নিজের সব শেয়ার কোম্পানির কর্মীদের দিয়ে দিয়েছে। কর্মীরাই এখন কোম্পানি চালাচ্ছে, তারাই মালিক হয়েছে। লোকনাথ নিজে

এখন বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উদ্দেশ্যহীন, গন্তব্যহীন ঘোরাঘুরিতেই তার পরিণতি।

এমনি যখন নানারকম কাহিনী নানা দিক থেকে কানে আসছে, ঠিক সেই সময়ে বসুমতী দেবী আমার অফিসে এসে হাজির হয়ে বাড়িতে যেতে বলে গেলেন।

যাদুগোপালের তেলেভাজার দোকানে সেদিন সেই মেয়েটা এসে হাজির। যাদুগোপাল তখন খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত। একা ত্রৈলোক্য সাপ্লাই করে উঠতে পারছে না। আর কারখানার ভেতরে অনাথ গরম তেলের কড়াতে কাঁচা মালগুলো ফেলছে আর তুলছে।

মেয়েটা এসে দাঁড়ালো।

যাদুগোপাল তখনও দেখেনি তাকে। প্যারাগন সিনেমা একটু পরেই আরম্ভ হবে। সুতরাং এই সময়টাতেই যত ঝামেলা যাদু-গোপালের। তারই ফাঁকে যাদুগোপালের দিকে একটু নজর পড়তেই মেয়েটা এগিয়ে গেল।

এগিয়ে গিয়ে বলল—আমি এসেছি দাদা—

যাদুগোপাল বললে—একটু দাঁড়াতে হবে ভাই, এখন কথা বলবার সময় নেই—

মেয়েটা একটু পাশে সরে গিয়ে দাঁড়ালো। বুঝলো এখন ব্যস্ততার সময়। এই সময়ে এখানে এসে সে অন্যায় করেছে। আসলে সে তো এ-দোকানের খদ্দের নয়। যে-লোক খদ্দের নয়, তাকে নিয়ে দোকানদারের কোনও মাথা-ব্যথা থাকে না। তবু যে দোকানদার তার কথা শুনেছে, তার দুঃখের কথায় কান দিয়েছে, সেইটেই বড় কথা। সংসারে তার চেয়ে বেশি কারো কাছে আশা করাই তো অন্যায়।

খানিক পরে ভিড়টা একটু পাতলা হলো। ওদিকে সিনেমার ভেতর থেকে ঘণ্টা বেজে উঠলো। খাবারগুলো কোনও রকমে গিলে খদ্দেররা দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে ঢুকলো হল-এর ভেতরে। এর পরে আবার যখন ইণ্টারভ্যাল হবে, তখন আর এক ঝোঁক ভিড় হবে। তখন ত্রৈলোক্য আর অনাথ দুজনে চার হাতে সামলাতে পারবে না, তখন খদ্দের সামলাতে যাদুগোপালকেও হাত চালাতে হবে।

মেয়েটা আস্তে আস্তে আবার এগিয়ে গেল। কাছে গিয়ে বললে—এবারে আপনার একটু হাত খালি হয়েছে দাদা ?

যাদুগোপালের নজর পড়লো আবার।

বললে—এসো, এসো ভাই, হাত কি আর খালি হবার জো আছে! সিনেমার পাড়ায় দোকান, যত বেলা বাড়বে তত খদ্দেরও জমবে—

তারপর একটু থেমে বললে—কিন্তু বাবু তো এখনও আসেনি—

—আপনি তাঁকে বলেছিলেন ?

—বলিনি আবার! সব বুঝিয়ে বলিচি। দিন-কাল যে বড় ব্যাড্ ভাই, সেই তো হয়েছে মুশকিল। নইলে একটা মেয়ের চাকরি যোগাড় করে দেওয়া লোকনাথবাবুর কাছে এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। বিরাট বড় বংশের ছেলে তো। এখনও ক্যালকাটা কর্পোরেশনে গিয়ে মেয়রকে বললেই তোমার চাকরি হয়ে যায়—

মেয়েটার যেন বিশ্বাস হলো না। বললে—বললেই চাকরি হয়ে যাবে ?

যাদুগোপাল বললে—হয়ে যাবে কি, কত লোকের চাকরি হয়ে গেছে। শুধু কর্পোরেশন ? কলকাতার সব অপিসে যে হাত আছে বাবুর। এই তো আমার নামে কেস করেছিল কর্পোরেশন, আমি নাকি ধোঁয়া ওড়াই, লোকের স্বাস্থ্য খারাপ হয় আমার তোলা উনুনের ধোঁয়া লেগে, তারপর বাবুকে বললাম—

—তারপর ?

—তারপর বাবুর কাছে একটা দরখাস্ত দিতেই সব ফয়সালা হয়ে গেল। সেই থেকে তো আমি বাবুর সাগরেদ হয়ে গেলাম।

মেয়েটা বললে—আজকে কখন আসবেন লোকনাথবাবু ?

যাদুগোপাল বললে—আসবার টাইম তো হয়ে গেছে। একটু বোস না তুমি। কিছু খাবে তুমি ভাই ? ক্ষিধে পেয়েছে ? আমার কাছে লজ্জা কোর না, একটু ঘুগনি খাবে ? কোনও লজ্জা কোর না, লজ্জা করলে নিজেই কষ্ট পাবে—

—আচ্ছা দিন।

যাদুগোপাল একটা প্লেটের ওপর ঘুগনি নিয়ে এগিয়ে দিলে।

কিন্তু মেয়েটা নেবার আগেই লোকনাথ এসে হাজির।

—এই যে, বাবু এসে গেছে !

হন্ হন্ করে লোকনাথ একেবারে সোজা কারখানার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। যাদুগোপাল সামনে এগিয়ে গেল। লোকনাথের মুখে-চোখে যেন একটা উদ্বেগের ছায়া। একে কারখানার ভেতরে কয়লার উনুনের গরম, তার ওপর মাথার ওপরে পাখা নেই। পকেট থেকে রুমালটা বের করে লোকনাথ মুখের ঘাম মুছতে লাগলো।

যাদুগোপাল বললে—সেই যার কথা আপনাকে বলেছিলুম, সেই এই—

বলে মেয়েটার দিকে দেখিয়ে দিলে।

লোকনাথ মেয়েটার দিকে চেয়ে দেখলে। বললে—আমি তো চিনতে পারছি না যাদুগোপাল, নাম কী বলো তো ? কী দরকার ?

যাদুগোপাল বললে—আপনাকে তো বলেছি ওর নাম। আপনার মনে নেই, সরযূ। সরযূ দেবী !

সরযূ দেবী? নামটা মনে করবার চেষ্টা করলে লোকনাথ। শুনেছে কি সে! আজকাল চারদিকে এত লোকের সঙ্গে পরিচয় হতে শুরু হয়েছে যে সকলের সব নামগুলো মনে রাখাই দায় হয়ে উঠেছে তার পক্ষে।

বললে—তা হবে, আমার মনে পড়ছে না—তা কী চান ইনি?

সরযূ লোকনাথের মুখের দিকে চেয়ে কাতরভাবে বললে, —আমাকে চিনতে পারছেন আপনি?

লোকনাথ এবার আরো ভালো করে চেয়ে দেখলে মেয়েটার দিকে। সাদামাঠা তেল চক্‌চকে্‌ চেহারা।

—একসঙ্গে এক-কলেজে পড়েছি আমরা স্কটিশ চার্চ কলেজে। মনে পড়ছে না?

লোকনাথ বললে—আমার সঙ্গে পড়েছেন?

—হ্যাঁ। চিনতে পারছেন না? আপনিই তো গরপাড় থেকে গাড়িতে করে কলেজে আসতেন! আমার নাম সরযূ। সরযূ সিকদার…

তবু চিনতে পারলে না লোকনাথ।

সরযূ বললে—আমি একবার আপনাদের ফ্যাক্টরিতে গিয়েছিলুম আপনার সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু সেদিন একটা এ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছিল, দু'জন লোক খুন হয়ে গিয়েছিল—

লোকনাথ যাদুগোপালের দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ হে যাদু-গোপাল, আমার সম্বন্ধে তুমি কী বলেছ এঁকে?

যাদুগোপাল হাতজোড় করে অপরাধীর মত সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলো। অর্থাৎ যা কিছু বলেছি তার জন্যে আপনি নিজগুণে ক্ষমা করুন আজ্ঞে।

লোকনাথ বললে—তা আমার সম্বন্ধে তুমি জানোই বা কী, আর আমিই বা তোমাকে কতটুকু জানিয়েছি। আর তা ছাড়া আমার গুণপনা যার-তার কাছে বলবার দরকারই বা কী?

যাদুগোপাল বললে—আজ্ঞে না, তা নয়, এর অনেক দুঃখু, অনেক কষ্ট এর—

লোকনাথ সরযূর দিকে চেয়ে দেখলে।

বললে—কষ্ট? কষ্ট কীসের?

যাদুগোপাল বললে—আজ্ঞে, কষ্টের কি শেষ আছে সরযূর? অনেক কষ্ট! আপনি যদি সব শোনেন তো আপনারও কষ্ট হবে—

—তাই নাকি?

সরযূ বললে—সত্যিই বিশ্বাস করুন, আমার অনেক কষ্ট—

লোকনাথ বললে—কষ্ট? কষ্ট কার নেই শুনি? পৃথিবী মানেই তো কষ্টের ডিপো। একটা লোক আমাকে দেখাও তো যে কষ্ট পাচ্ছে না!

যাদুগোপালের মুখে কোনও কথা বেরোল না।

লোকনাথ তার মুখের দিকে চেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলে—কই, তুমি কথা বলছো না যে! তুমি জানো এর জন্যে মানুষরাই দায়ী! কটা মানুষের কষ্ট দেখেছ তুমি হে যাদুগোপাল, জানো তুমি, এই যে তোমার এত কষ্ট, এর জন্যে কে দায়ী জানো?

যাদুগোপাল বললে—না—

লোকনাথ বললে—এই আমরা। আমরাই তোমাকে যত কষ্ট দিচ্ছি যাদুগোপাল। তোমার ভাই তোমার দেশের সম্পত্তি নিয়ে যে মামলা করেছে, করেনি? সেও তো মানুষ! অথচ তোমার ভাই হয়ে কেন সে মামলা করলে তোমার নামে?

যাদুগোপাল বললে—আমার কুষ্ঠিতে আছে, আপনি যে বলেন—

লোকনাথ বললে—রাখো, তোমার কুষ্ঠির নিকুচি করেছে। ও-সব বিশ্বাস করো না যাদুগোপাল—

যাদুগোপাল হাঁ হয়ে চেয়ে রইল লোকনাথের দিকে।

লোকনাথ বললে—হ্যাঁ, আমি যা বলছি ঠিক বলছি যাদুগোপাল,

তুমি জানো, এই যে আমি তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, আসলে আমি তোমার শত্রুতা করছি। তোমার ঘোরতর শত্রুতা করছি।

—সে কি কথা বলছেন বাবু? আপনি আমার শত্রু?

লোকনাথ বললে—হ্যাঁ, আমরা সবাই সবাইকার শত্রু। আমি যেমন তোমার শত্রু, তেমনি তুমি আমার শত্রু, এই সরযূ আমার শত্রু, আমি সরযূর শত্রু।

সরযূ এত বছর কলকাতায় আছে, আগে কখনও এমন লোক দেখেনি। এমন কথাও কখনও কারো মুখ থেকে শোনেনি। সবাই তো টাকা, চাকরি, ঘোড়া, রেস, তাস, মেয়েমানুষ আর হয়ত সিনেমা নিয়ে মাথা ঘামায়। কেউ বা কলকাতায় বাড়ি করবার বা এক কাঠা দু-কাঠা জমি কেনবার চেষ্টা করে। কী করে আরো দু'টো টাকা রোজগার করা যায়, কাকে ধরে কিছু সুবিধে আদায় করা যায়, কেবল এই চিন্তাই তো সকলের। কিন্তু এ আবার কী রকম!

যাদুগোপাল আগেই বলেছিল—খুব সুবিধের লোক নয় লোকনাথবাবু—

সরযূ জিজ্ঞেস করেছিল—খুব ধড়িবাজ বুঝি?

—আরে না, খুব ধড়িবাজ হলে তো বাঁচা যেত। খুব ধড়িবাজও নয়। আসলে যে মানুষটা কী, তার হদিস পেলুম না আজো। নইলে শুনছিস না, কলকাতায় এত ভালো-ভালো জায়গা, এত বড় বড় হোটেল থাকতে এই যাদুগোপালের এক ফালি তেলেভাজার দোকানে আসে?

—কেন আসে?

—তা জানি নে, কেন আসে। আমি তো মাঝে-মাঝে ঘুগ্‌নি আর তেলেভাজা খেতে দিই। দিতে আমারই লজ্জা করে, তা জানিস?

—কেন, লজ্জা করে কেন দাদা?

—আরে তুই কিছুই বুঝিস না। ও কি কম বড়লোকের নাতি ভেবেছিস তুই? ওদের এত টাকা আছে যে এই প্যারাগন সিনেমা-হাউসটাই কিনে নিতে পারে, তা জানিস?

সরযূ অবাক হয়ে গিয়েছিল যাছুগোপালের কথা শুনে। আসলে সরযূর সঙ্গে যাছুগোপালের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই ছিল না। আসতে যেতে বেগুনি ফুলুরি খেতে খেতে আলাপ-পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। শেষকালে আপনি থেকে নেমে 'তুমি' আর তারপর 'তুমি' থেকে 'তুই'। আর অন্য পক্ষ থেকে 'দাছু'।

প্রথম-প্রথম সিনেমার 'নাইট-শো'র সময় যখন আর কোনও খদ্দের থাকতো না, মালও থাকতো না যাছুগোপালের, তখন সরযূ বলতো—এবার আসি—

একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—হ্যাঁ রে, কোথায় বাড়ি তোদের?

—দমদম। দমদম প্যাতিপুকুর—

—অত দূর? এখান থেকে যাবি কী করে?

—কেন, বাসে নয়তো ট্রেনে! রোজ তো তাই যাই।

তারপর আস্তে আস্তে জানতে পেরেছিল মেয়েটা চাকরির খোঁজে আসে। সারাদিন ডালহৌসির অফিস-পাড়ায় ঘোরাঘুরি করে। শেষে যখন হেঁটে-হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন এই যাছুগোপালের দোকানে এসে কিছু খায়। খেয়ে রাত্রের খাওয়াটা সেরে নেয়। তারপর খায় এক গ্লাস জল। তাতেই পেট ভরে যায় তার।

এত সন্ধ্যে পর্যন্ত একটা মেয়ে একলা দোকানে বসে থাকে, তারপর পেট ভরে তেলেভাজা খায়, এ দেখে প্রথম দিকে যাছু-গোপালের সন্দেহ হয়েছিল। একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—আপনার বাড়ি কোথায়?

মেয়েটা প্রথম দিন খোলাখুলি পরিচয় দিতে চায়নি। কিন্তু বেশী দিন চেপে রাখতে পারেনি নিজেকে। বলেছিল—জানেন দাছু, আপনার দোকানে কেন আসি, কেন এতক্ষণ বসে থাকি জানেন? এখানে বসলে কেউ নজর দেয় না, অন্য জায়গায় বসে

দেখেছি সেখানে সবাই আমার দিকে এমন করে চেয়ে দেখে যেন গিলে খাবে, আমার বড় ভয় করে—

—তুমি কদ্দূর লেখাপড়া করেছ ?

—আমি বি-এ পাশ করেছি।

—বি-এ পাশ তো আজকাল সব্বাই ; তা টুকে বি-এ পাশ, না না-টুকে ?

সরযূ বললে—আমি যখন পাশ করেছি, তখন টোকাটুকি শুরু হয়নি।

—তা এতদিন চাকরি পাওনিই বা কেন ?

সরযূ বলেছিল—লেখাপড়া জানলেই কি চাকরি পাওয়া যায় ? আপনি চাকরির বাজারের হালচাল কিছুই জানেন না, তাই ও-কথা বলছেন। একজন-না-একজন মুরুব্বী চাই, আজকাল মুরুব্বী না হলে কোনও কিছু হবার উপায় নেই—

যাত্নগোপাল বলেছিল—সব লোকের কি মুরুব্বী থাকে, না থাকা সম্ভব ?

সরযূ বলেছিল—সেই চেষ্টাই তো করছি। অনেকদিন ধরে মুরুব্বী একজন ধরবার চেষ্টা করছি। কিন্তু আমাদের মত গরীব লোকরা মুরুব্বী পাবোই বা কোথায় ? কে তাঁদের সাহায্য করবে ?

বলতে বলতে মেয়েটার চোখ-মুখ সজল হয়ে উঠেছিল।

যাত্নগোপাল বড় মুশকিলে পড়লো। জীবন-যুদ্ধ যে কী বস্তু, তা যাত্নগোপালও কম জানে না। ছোটবেলায় আর দশজনের মত রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে একদিন ঘুরে বেড়িয়েছে সে। সাহেব-দের বড় হোটেলটার সামনে রোজ ট্যাক্সি ডেকে দিয়ে বকশিশ পেয়েছে। সেই বকশিশের ওপর নির্ভর করে বছরের পর বছর পেট চালিয়েছে যাত্নগোপাল। আর শুধু কি তাই ? শেয়ালদা স্টেশনে মুটে হয়ে মোট বয়েছে কতদিন। বৌবাজারে একটা বড় লোকের বাড়িতে সদাব্রত হতো, সেইখানে গিয়ে নিজের

অ্যালুমিনিয়ামের থালা নিয়ে পাতা পেড়েছে।

তারপর যেবার যুদ্ধ বাধলো, কলকাতা শহর ফাঁকা হয়ে গেল, তখনই ভাগ্য ফিরলো যাদুগোপালের। এই দোকান-ঘরটা হঠাৎ খালি হওয়াতে মাদুর আর বালিশ নিয়ে এর ভেতরে ঢুকে পড়লো।

আর কলকাতা শহরে একবার একটা আস্তানা পেয়ে গেলে কে আর তখন কাকে হটায় ?

বাড়িটার মালিকও তখন বোমার ভয়ে শহর ছেড়ে চলে গেছে। লোকটার বিরাট সম্পত্তি। অনেক ভাড়াটে। ভাড়াটেরাও তখন কে কোথায় পালিয়েছে তার হিসেব নেই। সেই সমস্তর কেয়ার-টেকার হয়ে বসে পড়লো যাদুগোপাল।

সরযূ সব শুনছিল। বললে—তারপর ?

যাদুগোপাল বললে—তারপর সেই মালিক এক বছর পরে আবার ফিরে এলো, ফিরে আসতেই আমি তার সম্পত্তি বুঝিয়ে দিলুম—ভদ্রলোক আমার ওপর খুব খুশি। তারপর মালিক এই দোকানটা আমায় দিয়ে দিলে, ভাড়া পাঁচ টাকা মাসে—

সরযূ বললে—মাত্র পাঁচ টাকা ?

যাদুগোপাল বললে—পাঁচ টাকা মানেই মুফোত। সেইদিন থেকেই বলতে গেলে আমি একটু গুছিয়ে বসতে পেরেছি দিদি, সবই ভাগ্য। আমার মুরুব্বী কে ছিল বলো তো, কেউ-ই ছিল না—ভগবানই আমার একমাত্র মুরুব্বী।—

সরযূ বললে—তাহলে আমার একটা কিছু করে দিন আপনি, আপনিই পারবেন দাদা। আমাকে আপনার ছোট বোন বলে মনে করবেন—

যাদুগোপাল বললে—আমার আর কার সঙ্গে জানা আছে বল। সারাদিন তো এই তেলেভাজা নিয়েই কেটে যায়। তেলে-ভাজার দোকানে কি কোনও ভদ্দরলোক আসে ?

তারপর কথাটা বলতেই মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল বাবুর কথা। লোকনাথবাবু।

বললে—তবে একজন ভদ্দরলোক আসে—

—কে ?

—সে ভদ্দরলোক মানে কলকাতা শহরের একজন সেরা ভদ্দরলোক।

সরযূ জিজ্ঞেস করলে—কী নাম ?

যাত্নগোপাল বললে—লোকনাথ রায়—

লোকনাথ রায় নামটা এমন একটা নাম নয় যে সরযূ তা শুনে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে।

যাত্নগোপাল বললে—নাম শুনলে তুমি চিনতে পারবে না। অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্-এর নাম শুনেছ ?

—শুনেছি। সেখানেও চাকরির চেষ্টা করেছিলাম। ওখানকার যে মালিক সে আমার সঙ্গে এক কলেজে পড়তো—

যাত্নগোপাল বললে—তাই নাকি ? কিন্তু সে তো এখন আর মালিক নেই।

—নেই ?

—না, মালিক বদলে গিয়েছে।

—কেন—

—ওই তো বাবুর খেয়াল।

সরযূ জিজ্ঞেস করলে—তাহলে অতগুলো লোক চাকরি করতো তাদের কী হলো ?

—তারাই এখন কোম্পানির মালিক। এখন আর কিছু কাজ নেই বাবুর। বাবু এখন এই আমার দোকানে আসে, এখানে-ওখানে ঘোরে আর বাড়িতে গিয়ে ঘুমোয়। সারাদিন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় টো-টো করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর সব দেখে—

সরযূ অবাক হয়ে শুনছিল যাত্নগোপালের কথা। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় এ কেমন কথা! মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি! টাকা লোকসান গেছে? কোম্পানি লালবাতি জ্বেলেছে? তবে কি কারবারে ক্ষতি হচ্ছিল? লেবার-ট্রাবল্? কর্মচারীরা

ধর্মঘট করেছিল ?

—না। সে-সব কিছুই না। দাদামশাইএর আমল থেকে বিরাট করবার চলে আসছিল। সেই কারবারের মালিক হয়েছিল নাতি। টাকা-কড়ি, বাড়ি-গাড়ি, চাকর-দরোয়ান সমস্ত কিছু আছে। কিন্তু এবার হয়ত তা-ও সব ছাড়িয়ে দেবে!

—কিন্তু আপনি এ-সব জানলেন কী করে দাহু? আপনাকে সব বলেছেন বুঝি?

যাহুগোপাল বললে—দূর, আমাকে বাবু বলবে কেন। আমি আর বাবু? আমি কি আর বাবুর সমান? আমি সব খবর পেয়েছি বাবুর ড্রাইভার বৈজুর কাছ থেকে।

—বাবুর তাহলে এখনও গাড়ি আছে?

যাহুগোপাল বললে—গাড়ি আছে কিন্তু চড়ে না বাবু। বাবুর খোঁজে মাঝে-মাঝে ড্রাইভার আসে। কী করে তারা খবর পেয়েছে বাবু নাকি এখেনে আসে—

তা এ-সব কথা অনেক আগের। অনেকদিন সরযূ এসে খুঁজে গেছে বাবুকে। এসেই জিজ্ঞেস করেছে—কী দাহু, তিনি এসেছেন?

যাহুগোপাল খদ্দেরদের সামলাবার ফাঁকে ফাঁকে উত্তর দিয়েছে —না দিদি। আসেন নি, তবে তোমার কথা বাবুকে বলে রেখেছি—

—বলেছেন?

—হ্যাঁ, বলবো না?

—তা শুনে বাবু কী বললেন?

—বাবু কিছু বলেন নি। শুধু শুনেছেন।

যাহুগোপালের তখন ব্যস্ততার শেষ ছিল না। তারই ফাঁকে কিন্তু উত্তর দিলে সব কথার।

বললে—বোস না দিদি, খেয়ে যাও—

সরযূ বললে—আজকে আর খাবো না, আমার হাতে আজ পয়সা নেই—

পয়সা নেই শুনেই যাদুগোপাল এগিয়ে এল। বললে—পয়সা দিতে হবে না তোমাকে দিদি, যখন পয়সা হবে তখন দিও, আজ কী যাবে খেয়ে যাও—

বলে জোর করে ভেতরে কারখানার সামনে একটা টুল এগিয়ে দিলে। তারপর তেলেভাজা কুচুরি হয়েছিল, তাই-ই চারখানা একটা ডিশ-এর ওপর সাজিয়ে সরযূর হাতে দিলে। তার সঙ্গে দিলে একহাতা আলু চচ্চড়ি।

—একটা সেদ্ধ কাঁচালঙ্কা দেব ? মুখের তার হবে।

—দিন।

লঙ্কাও দিলে যাদুগোপাল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরযূ একটা-একটা করে কচুরি খেতে লাগলো। অনাথ এক গ্লাস জলও দিলে। ওরা সবাই খুব খাতির করে সরযূকে। অথচ সে কে-ই বা এদের ? কেউ নয়। নিতান্ত খদ্দের হয়ে আসতে আসতে একদিন আত্মীয়ের মতন হয়ে গেছে।

এমনি প্রায়ই হতো। সেই দমদম পাতিপুকুরের কাছ থেকে রোজ একবার কলকাতার অফিস অঞ্চলে না এলে চলতো না। যে যেখানেই থাকুক, যেমন করেই থাকুক, কলকাতায় তো দিনান্তে একবার আসতেই হবে। আর অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পরই ক্ষিধে পাবে। তখন কোথায় খাবে তারা ? মাদ্রাজী হোটেলেই সবচেয়ে সস্তায় খাবার পাওয়া যায়। প্রথম-প্রথম তাই-ই খেত সরযূ। একটা বড়া কিম্বা একটা ইড্‌লি। তার সঙ্গে খানিকটা ডাল আর চাট্‌নি ফ্রি দেয়।

কিন্তু তা কেনার সাধ্যও সব দিন থাকে না অনেকের। সেই সময়েই যাদুগোপালের এই একফালি তেলেভাজার দোকানের সন্ধান পেয়েছিল সে। এখানে জিনিসটা শুধু সস্তা নয়, যাদু-গোপাল মানুষটাও বেশ ভালো। বেশ যত্ন-আত্তি করে খদ্দেরদের।

কাউকে ঠকায় না। ভেজাল তেল ব্যবহার করে না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর।

তখন থেকেই ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে।

তারপর এই চাকরির কথা প্রসঙ্গে লোকনাথবাবুর নাম শোনা।

তারপর একেবারে এই প্রথম মুখোমুখি দেখা। যাদুগোপালের মুখে যেমন শুনেছিল সে-রকম নয়। আগে দেখেছিল মানুষটাকে। তখন খুব সুন্দর চেহারা ছিল লোকনাথের। বড়লোকের ছেলে, সাধারণ গরীব ঘরের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মিশতো না। তারপর যেদিন লোকমুখে শুনলো যে সে অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্-এর তাদের সঙ্গে এক কলেজে পড়া ছেলে, সেইদিনই দেখা করতে গিয়েছিল। কিন্তু ফ্যাক্টরির সামনে পৌঁছিয়ে অবাক। একদল পুলিশ জায়গাটা ঘিরে রেখেছে। দু'একজন লোককে জিজ্ঞেস করে জেনেছিল, ভেতরে নাকি কারা খুন হয়েছিল। তারপর আর সেখানে যাওয়া হয়নি। অত বড় অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির মালিক, বোধহয় কোট-সার্ট-টাই পরা চেহারা হবে। অহঙ্কারী চাউনি। তার সঙ্গে হয়ত ভালো করে কথাই বলবে না। আবার মনে হয়েছিল—তাই কখনও হয়? অত বড়লোক যখন, তখন কলকাতার বড় বড় হোটেল রেস্টোরেন্ট থাকতে এখানে এই ঘুপচি ময়লা সস্তা যাদুগোপালের দোকানেই বা আসবে কেন? পয়সার অভাব না-থাকলে কেউ এখানে আসে?

কিন্তু না। সেই আগেকার দেখা চেহারার সঙ্গে কোনও মিল নেই। এ একেবারে অন্য মানুষ। সরযূর নিজের পোশাক-পরিচ্ছদও ওর চেয়ে অনেক ভালো বলতে হবে। একটা মোটা খদ্দরের খয়েরি রং-এর লম্বা-ঝুল পাঞ্জাবি, মাথার চুলগুলো উস্ক-খুস্ক, মুখে কোঁকড়ানো দাড়ি, যেন এখুনি ঘুম থেকে উঠে এলো।

সরযূ লোকনাথের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলো। দেখে মনে হলো এই লোকটাকেই যদি আবার সাহেবী পোশাকে সাজিয়ে

দেওয়া যায়, দিয়ে মুখের দাড়ি পরিষ্কার করে কামিয়ে, মাথার চুলে তেল মাখিয়ে চিরুনি দিয়ে ব্যাক্-ব্রাশ করে আঁচড়ে দেওয়া যায়, তো তাকে সাহেব বলে ভাবতে কারো ভুল হবে না।

যাদুগোপালের সুপারিশ শুনে লোকনাথ তার দিকে আবার চাইলে।

বললে—আমার কথায় ওর চাকরি হবে, জানলে কী করে তুমি?

যাদুগোপাল বললে—না জানলেও, আন্দাজ করতে তো পারি—

লোকনাথ বললে—বাজে কথা। আগে হলে হয়ত শুনতো, কিন্তু এখন আর কেউ শুনবে না। এখন তো সবাই জেনে গেছে, আমার চাকরি-বাকরি কিছু নেই—

সরযূ তাদের কথার মাঝখানে বললে—তবু আপনি বললে কেউ আপত্তি করতে পারবে না। আপনার কথা এড়ানো শক্ত হবে—

লোকনাথ মেয়েটার কথা শুনে অবাক হলো। মেয়েটা তো দেখছি খোশামোদ করতে ওস্তাদ হয়েছে।

বললে—কেন? আমি কে যে, আমার কথা এড়ানো শক্ত হবে?

সরযূ বললে—আমি সব শুনেছি—

—তুমি সব শুনেছ? কার কাছ থেকে শুনেছ? কী শুনেছ?

—এই দাদুই সব বলেছে আমাকে।

লোকনাথ যাদুগোপালের দিকে চাইলে।

—হ্যাঁ যাদুগোপাল, তুমি কী সব বলেছ একে? আমার কী ক্ষমতা যে মানুষের উপকার করি? পৃথিবীতে কোনও মানুষ কারো উপকার করেছে? আমাকে তার একটা উদাহরণ দেখাতে পারো?

যাদুগোপাল একটা আত্ম-পরিতৃপ্তির হাসি হাসলো। বললে—বাবু, আপনি আমার উপকার করেন নি? আপনি উপকার না

করলে আমি আজ এখানে কারবার করে খেতে-পরতে পারতুম? দোকান-ঘর তো আমি দৈব-বশে পেয়ে গেছি, কিন্তু এই সিনেমাওয়ালা আমাকে হঠাতে কম চেষ্টা করেছে, বলুন? তা আপনাকে কিছু করতেই হবে এই সরযূর জন্যে বাবু—না করলে ছাড়বো না—

লোকনাথ যাদুগোপালের মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে রইল। বললে—এ তোমার কে বলতো তো যাদুগোপাল, যে এর জন্যে তুমি এত বলছো?

যাদুগোপাল বললে—কে আবার, কেউ না। আমার কে হতে যাবে বলুন, কলকাতায় আমার আত্মীয়-স্বজন আর কে আছে!

তারপর একটু থেমে বললে—তবু আপনি এর জন্যে কিছু একটা করুন বাবু, আপনাকে করতেই হবে—

সরযূ বললে—আপনার ওপর বিশ্বাস করেই আমি এতদিন অপেক্ষা করছি—

লোকনাথ যেন চমকে উঠলো। বললে—বিশ্বাস! তুমি যদি সত্যিই কিছু কাজ করতে চাও তো কারোর ওপুর বিশ্বাস রেখো না, বিশেষ করে মানুষের দয়া মায়ার ওপরে যে বিশ্বাস রাখে, তার মতন হতভাগ্য আর কেউ নেই। মানুষের যদি দয়া-মায়া থাকতো, তো ভগবান বলে বস্তুও পৃথিবীতে থাকতো, এ পৃথিবীও তাহলে অন্যরকম হতো—

যাদুগোপাল বললে—এত সব বড়-বড় কথা আমরা বুঝতে পারিনে বাবু, আমরা সাধারণ লোক—

হঠাৎ বাইরে থেকে কে যেন ডাকলে—দাদাবাবু—

সবাই চেয়ে দেখলে। যাদুগোপাল বললে—ওই যে আপনার বৈজু এসেছে—

বৈজুর দিকে চোখ ফেরাতেই লোকনাথের মুখের চেহারা আমূল বদলে গেল।

—তুই? তুই এখানে কী করতে?

বৈজু বললে—মাঈজী এসেছে, গাড়িতে বসে আছে—

—বসে আছে তো আমি কী করবো? চলে যেতে বল্! আমার সঙ্গে দেখা করে কী হবে?

বৈজুর আর কিছু বলবার সাহস হলো না। সে চলে যাচ্ছিল। লোকনাথ তাকে আবার ডাকলে। বললে—বৈজু শোন্, দিদিমাকে বলে দিস যেন এরকম করে আমার পেছনে আর না ঘুরে বেড়ায়, বুঝলি?

বৈজু যে বুঝেছে তার ইঙ্গিত দিয়ে সে চলে গেল। লোকনাথ সরযূর দিকে চেয়ে বললে—তোমাকে যা বললুম বুঝলে তো? কেউ তোমার উপকার করবে এ-ধারণা মন থেকে দূর করে দাও। যাঁরা যাঁরা মানুষের উপকার করবার চেষ্টা করেছেন, মানুষ তাঁদেরই খুন করেছে। কারোর ভালো করার চেষ্টা করা মানুষ দেখতে পারে না। ইতিহাসে যারাই ভালো করেছে তাদের আমরা শূলে চড়িয়েছি, বিষ খাইয়েছি, গুলি করে মেরেছি। আর সেই অপঘাতে মারার যুক্তি খোঁজবার জন্যে মানুষই আবার হাজার-হাজার লক্ষ লক্ষ বই লিখেছে। আমার আশা ছেড়ে দাও, আমি তোমার কোনও উপকার করবো না—

সরযূ এ-সব কথার পুরো মানে বুঝতে পারলো না। বললে—কিন্তু আপনি তো শুনেছি অনেকের উপকার করেন।

—করেছি। আমার দাদামশাই-এর ব্যবসা যখন ছিল, তখন অনেককে সেই ফার্মে চাকরি দিয়েছি। কিন্তু সে-ফার্ম আমি ছেড়ে দিলাম। কারণ, দেখলাম তা দিয়ে আমি কারো উপকার করছি না, বরং তারাই আমার উপকার করছে—

—তার মানে?

—মানে, দেখলাম তাদের সংসার মোটামুটি চলছে বটে, কিন্তু আসল উপকার আমারই হচ্ছে। তাদের চাকরি দিয়ে আমি নিজে আরো বড়লোক হচ্ছি। আমার আরো বেশী টাকা হচ্ছে। আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাদের এক্সপ্লয়েট করছি, তাদের শোষণ করছি।

শেষকালে আমার এত টাকা হতে লাগলো যে তখন আর আমি মানুষ রইলুম না, মেশিন হয়ে গেলুম, টাকা উপায় করবার মেশিন—

যাদুগোপাল, সরযূ দুজনের কেউই লোকনাথের কথাগুলো বুঝছিল না। সেই অন্ধকার ঘুপচি তেলেভাজার দোকানের ভেতর দাঁড়িয়ে লোকনাথ যা-কখনও করে না, তাই করতে লাগলো। এমন করে বাবু তো কখনও আগে কথা বলেনি। অনাথ আর ত্রৈলোক্য তখন দোকানের খদ্দের সামলাচ্ছে। আসলে খদ্দেররা সওদা পাচ্ছে কি পাচ্ছে না, সেদিকে তখন মনও নেই যাদুগোপালের।

যাদুগোপাল বললে—কিন্তু বাবু, আমি যদি আমার এই দোকান তুলে দিই তো ওই অনাথ, ত্রৈলোক্য, ওরা কী করবে? ওরা যে বেকার হয়ে যাবে?

লোকনাথ বললে—তুমি দোকান করবার আগে ওরা কি উপোস করতো? ওরা কি না খেয়ে থাকতো?

—খোকা!

আওয়াজটা কানে যেতেই লোকনাথ চেয়ে দেখলে—দিদিমা! দিদিমা গাড়ি থেকে নেমে একেবারে দোকানের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

যাদুগোপালও দেখলে। লোকনাথবাবুর দিদিমাকে এই-ই তার প্রথম দেখা। বসুমতী দেবীর নামই কেবল শুনেছে সে। বৈজুর কাছ থেকেই বাবুর বাড়ির অনেক খবর জেনেছে। কিন্তু বসুমতী দেবীকে তার দেখা এই-ই প্রথমবার। বসুমতী দেবীর অনেক বয়েস হয়েছে বটে, কিন্তু যৌবনের, রূপের আর আভিজাত্যের জলুস যেন তখনও মুখে-চোখে-শরীরে লেগে আছে। মাথার চুলে বেশ সুস্পষ্ট পাক ধরেছে। মুখের যে-জায়গাটায় সবচেয়ে প্রথমে নজরে পড়ে, সেটা চোখ দুটো। যেন পাথরের তৈরী চোখ। অথচ স্বচ্ছ, সজীব, সজল, গভীর! সে-চোখের দিকে চাইলে

চোখ নামাতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় সে-চোখ আমাকে আঘাত দিক, আমাকে ভৎর্সনা করুক, আবার আমাকে ক্ষমাও করুক।

—খোকা!

লোকনাথ রাস্তার দিকে এগিয়ে গিয়ে একটু কড়া গলায় বললে—তুমি আবার এখানে আসতে গেলে কেন?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বসুমতী দেবী জিজ্ঞেস করলেন—তুই-ই বা এখানে এসেছিস্ কেন?

লোকনাথ বললে—এখানে মানে? আমি কি শুধু এখানে আসি? আমি তো সব জায়গাতেই যাই—

বসুমতী দেবী বললেন—তোর সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা ছিল—

—কী কথা বলো? যা বলবার বলে যাও, আমার এখন বেশী কথা শোনবার সময় নেই।

বসুমতী দেবী বললেন—তোর তো সকালে-বিকেলে কখনোই সময় নেই। আর পৃথিবীতে আর সকলের বুঝি সময় আছে?

—কী বলবে তাড়াতাড়ি বলো। খুবই জরুরী কিছু?

—জরুরী বলেই তো নিজে এখানে এলুম।

—তাহলে বলো, আমি শুনি!

বসুমতী দেবী বললেন—আমার সঙ্গে গাড়িতে আয়, আমি গাড়িতে বসে বলবো।

—কিন্তু এমন কী-ই বা কথা যে এখানে দাঁড়িয়ে বলা যাবে না?

—না, সব জায়গায় সব কথা বলা যায় না।

বলে নাতির হাত ধরে টানতে টানতে বসুমতী দেবী তাকে বড় রাস্তার গাড়ির ভেতরে নিয়ে গিয়ে তুললেন।

—দেখছি যত সব ছোটলোকদের সঙ্গে তোর মেলামেশা! যদি তোর এত ক্ষিধেই পায় তো তাহলে আর কোথাও গিয়ে খেতে পারিস নে? ওই ময়লা নোংরা তেলেভাজার দোকানে না

গেলেই নয়? কলকাতা শহরে কি ভালো হোটেলের অভাব? কোনও ভদ্রলোককে কখনও ওই সব দোকানে খেতে দেখেছিস তুই?

লোকনাথ শান্ত গলায় বললে—ভদ্রলোক তুমি কাকে বলো দিদিমা? যাদের গায়ে ফরসা দামী কোট-প্যান্ট, যাদের ব্যাগে অনেক টাকা, তারাই কি তোমার কাছে ভদ্রলোক?

বসুমতী দেবী বললেন—তর্ক করিস নি। তোর সব তাতে তর্ক। তারা ভদ্রলোক নয় তো ভদ্দরলোক ওই তোর তেলেভাজা-ওয়ালা?

তারপর একটু থেমে বলে উঠলেন—আর ওই মেয়েটাই বা কে? দেখে মনে হলো বাস্তুহারা, রিফিউজী—

—কোন্ মেয়েটার কথা বলছো তুমি?

—দ্যাখ, তুই আর ন্যাকার মত কথা বলিসনি। আমি অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, অনেক জেনেছি। মানুষ ঘেঁটেঘেঁটে আমি আজ বুড়ী হয়ে গেলুম, এখন আমাকে আর তুই জ্ঞান দিতে আসিসনি। ভেবেছিস আমি বোকা, আমি কিছু বুঝি না?

লোকনাথ বললে—দ্যাখো দিদিমা, এ-সব নিয়ে তোমার সঙ্গে ডিসকাশান করতেও আমার ঘেন্না হয়, তুমি যদি বোকা নও, তুমি যদি সবই বোঝো, তাহলে আবার জিজ্ঞেস করছো কেন?

—তা তুই যদি ওই রকম একটা রিফিউজী মেয়ে বিয়ে করে এনে বাড়িতে তুলিস তো আমি কিন্তু সেদিন সহ্য করবো না। এই তোকে বলে রাখছি—

লোকনাথ বলে উঠলো—দ্যাখো দিদিমা, তুমি এমনভাবে কথা বলছো যেন আমি তোমার ডিপেন্‌ডেন্ট, আমি তোমার টাকায় খাই, তোমার টাকায় পরি। আর তা ছাড়া এটা তুমি ভুলে যাচ্ছো দিদিমা যে আমি সাবালক, আমি অ্যাডাল্ট্, আমার নিজেরও একটা স্বাধীন মত বলে জিনিস আছে—

বসুমতী দেবী বললেন—তোর মুখ থেকে এ-সব কথা তো

হাজার বার শুনেছি, হাজার দিন শুনেছি। কিন্তু আমার কথাটাও তো তোর শোনা উচিত, আমি তো আমার নিজের জন্যে এত কথা বলছি না—আমি আর ক'টা দিনই বা বাঁচবো, আমার যাবার দিন ঘনিয়ে এসেছে। যা-কিছু তোকে বলি তা তোর ভালোর জন্যেই বলি—

লোকনাথ বলে উঠলো—গ্যাখ দিদিমা, তুমি আমার অনেক ভালো করেছ, দয়া করে আর ভালো করতে চেষ্টা কোরো না—

—খোকা, তুই বলছিস কী?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক কথাই বলছি দিদিমা। পৃথিবীতে ভালো করবার লোকের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে বলেই আমাদের এত বিপদ!

—তোর যত সব বাজে কথা। এ-সব কথা শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেছে, খোকা। জানিস্, সেদিন তোর বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো তার অফিসে—

—কোন্ বন্ধু?

—বিকাশ না কী যেন! সে বলছিল তুই নাকি কমিউনিস্ট হয়ে গেছিস!

লোকনাথ চোখ পাকিয়ে উঠে বসুমতী দেবীর দিকে চাইলে।

বললে—দিদিমা, যে-জিনিস জানো না, সে-জিনিস নিয়ে দয়া করে তুমি কথা বোল না।

—আরে আমি বলবো কেন? তোর বন্ধুই তো বলেছে।

—ওরা কি মানুষ দিদিমা? ওদের তুমি মানুষ মনে করো? টেরিলিন-টেরিকট গায়ে চড়ালেই কি কেউ মানুষ হয়?

—তাহলে বুঝি মাথার উস্কো-খুস্কো চুল, এক মুখ দাড়ি, গায়ে ময়লা জামা আর পাজামা পরে হিপি সাজলেই মানুষ হয়?

লোকনাথ সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—দেখ দিদিমা, বিকাশের সঙ্গে তোমার দেখা হলে বোল যে, ইংলণ্ডের ডিউক অব উইণ্ডসর যখন সিংহাসন ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তখন কেউ তাকে

কমিউনিস্ট বলেনি। কারণ, সে সিংহাসন ত্যাগ করেছিল একটা মেয়েমানুষের জন্যে, আর এত কথা কি, বিকাশকে বোল আড়াই হাজার বছর আগে একজন রাজার ছেলে রাজত্ব ছেড়ে, স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে বনে চলে গিয়েছিল, তার জন্যে কিন্তু তাকে এখনও কেউ কমিউনিস্ট বলে না—আর আমি সবকিছু ছাড়লেই, এই রুক্ষ চুল আর দাড়ি রাখলেই কমিউনিস্ট হয়ে যাই—

তারপর একটু থেমে আবার বললে—কিন্তু এত কথা তোমার সঙ্গে বলছিই বা কেন? আমি চলি—

বলে গাড়ির দরজাটা খুলে বেরিয়ে আসছিল। কিন্তু বসুমতী দেবী ছাড়লেন না।

বললেন—কিন্তু তুই তো বললি না ও কে? ওই মেয়েটা?

লোকনাথ বললে—দিদিমা, তুমি আমাকে এতোদিন ধরে দেখছো, তোমার অন্তত বোঝা উচিত যে, তোমার নাতি আর যাই হোক, চরিত্রহীন নয়—

—ও, তাহলে তুই চরিত্রটাও অন্তত মানিস?

লোকনাথ বললে—সে কি, চরিত্র মানবো না? চরিত্রই যদি না রইল তো মানুষের রইলোটা কী বলো তো? ভগবান আমি না-মানতে পারি, কিন্তু চরিত্র মানবো না, একথা তুমি বিশ্বাস করলে?

বলে আর দাঁড়ালো না সেখানে লোকনাথ। কলকাতার ব্যস্ত-সমস্ত অঞ্চল, চারদিক থেকে গাড়ি আর মানুষ ছুটে চলেছে যার-যার গন্তব্যস্থানের দিকে। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট হলে চলবে না। সময় মানে টাকা। সময় নষ্ট মানেই টাকা নষ্ট। ওই টাকা দিয়ে আমি প্রতিযোগিতায় তোমাকে হারিয়ে দেব। তুমি পেছনে পড়ে থাকবে আর আমি এগিয়ে যাবো আরো উজ্জ্বল সার্থকতার দিকে। তারপর যখন আমার ক্ষমতা হবে আমি তোমাদের মারবো। যারা দুর্বল, যারা পেছনে পড়ে থাকবে, তাদের খুন করবো আমরা। আমরা নতুন করে সমাজ গড়ে তুলবো। সে আমাদের নিজস্ব

সমাজ। সে-সমাজের জন্যে আমরা নতুন করে ডিকসনারি লিখবো। বিকাশরা টেরিলিন-টেরিকট পরে ভাবে দুনিয়াদারিতে তারা জিতে গেছে। দু' হাজার, আড়াই হাজার টাকার মাইনের আফিম খেয়ে ভাবে হুকুম করবার অধিকার জন্মে গেছে তাদের। এই যেমন দিদিমা, মেয়ে দেখেই ভয় পেয়ে গেছে, ভেবেছে ওকে বিয়ে করে আমি তার বাড়ির নাত-বউ করবো। তাই বিকাশকে একদিন লোকনাথ বলেছিল—Dolci পড়েছিস?

বিকাশ বলেছিল—না—

লোকনাথ রেগে গিয়ে বলেছিল—তা কেন পড়বি? তোরা যে ধরে নিয়েছিস দু হাজার টাকা মাইনের একজিকিউটিভ পোস্ট পেয়ে গেলে নিজের বাপকেও চাকর বলে ভাবার অধিকার জন্মায়। তোদের বিদ্যে তো ওই আগাথা ক্রিস্টি আর পিয়ারি ম্যাসন পর্যন্ত। জেমস্ বনড্ না কী, তা নিয়েও তোরা আবার বড়াই করিস শুনেছি। কিন্তু এটা জেনে রাখ পৃথিবীটা বদলে গেছে—

—পৃথিবী যে বদলে গেছে, সেটা কি তোর কাছে শুনে বুঝতে হবে! সে তো দেখতেই পাচ্ছি। আগে একটা সার্ট কিনেছি চল্লিশ টাকায়, এবার সেই একই সার্ট কিনেছি তেষট্টি টাকায়—

লোকনাথ রেগে গিয়েছিল—থাম্ ইডিয়ট, ওটা বদলে যাওয়া নয়। ওকে বদলে যাওয়া বলে না। বদলে গেছে কীসে জানিস? বদলে গেছে মর্যাল ভ্যালুয়েশন। তবে শোন; কী রকম বদলে গেছে সব।

বলতে গিয়ে বাধা পড়লো হঠাৎ। পেছন থেকে বসুমতী দেবী ডাকলেন—ওরে খোকা, শোন্—

কিন্তু বিকাশদের ওপর রাগটা তখনও যায়নি লোকনাথের।

বিকাশরা খায় দায়, অফিসে যায়, অফিসের এয়ার-কনডিশনড্ ঘরে বসে কাজ করে, আর নিজেদের এক-একজন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি বলে ভাবে। হোটেলের বার-এ গিয়ে বসে মদ-এর সঙ্গে সারা পৃথিবীর মুণ্ডপাত করে, টলতে টলতে বাড়িতে এসে

সন্তানের জন্ম দেয়। কলকাতার এরাই হলো মাথা। এরা মনে করে কলকাতা এদের নির্দেশেই চলেছে। এরা না থাকলে সব অচল, সব বানচাল হয়ে যেত।

আশ্চর্য! বিকাশরা বলে কি না, সে কমিউনিস্ট হয়ে গেছে।

পেছন থেকে দিদিমা আবার ডাকলে—ওরে খোকা, আজ বেশী রাত করিস নি, সকাল সকাল বাড়ি ফিরিস—

পাঁচ

যাদুগোপালের দোকানে সরযূ তখনও প্রশ্ন করে চলেছে।

—হ্যাঁ দাদু, ওই বুঝি লোকনাথবাবুর দিদিমা?

যাদুগোপাল বললে—তাই-ই তো মনে হলো। আগে তো কখনও চোখে দেখিনি, আজই প্রথম দেখলাম।

—অনেক টাকা বুঝি ওদের?

যাদুগোপাল বললে—তা যখন কলকাতা শহরের মধ্যে তার অত বড় বাড়ি, অত বড় গাড়ি, নিশ্চয় অনেক টাকার মালিক। আর টাকা না থাকলে অত লোকের খাওয়াদাওয়া, ওদের তো মাইনেও দিতে হয়। ও-সব চলছেই বা কী করে?

—তা কত টাকা আছে ওদের, আন্দাজ?

যাদুগোপাল বললে—তা বলতে পারছি নে। কয়েক লাখ টাকা নিশ্চয়ই আছে।

—এক লাখ?

সরযূ লাখ টাকার আয়তন আর সংখ্যাটাকে কল্পনায় উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলে। তারপর বললে—জানেন দাদু, একশো হাজারে তবে এক লাখ হয়।

যাদুগোপাল বললে—দূর বোকা মেয়ে, সে তো সবাই জানে!

সরযূ বললে—আমি জানতুম না দাদু! আমি যার কাছে লটারির টিকিট কিনি, সে আমাকে হিসেব বোঝাচ্ছিল।

—তুইও লটারির টিকিট কিনিস নাকি ?

সরযূ বললে—কেন, আপনি ? আপনি কেনেন না ?

যাতুগোপাল বললে—আমি এখানকার টিকিট কিনি না ভাই। এ-সব তু-তিন লাখ টাকার ওপর আমার লোভ নেই। আমি কিনি পাঞ্জাবের টিকিট, ওরা ষোল লাখ, সতরো লাখ টাকা দেয় —ওটা যদি একবার পেয়ে যাই তো আর কলকাতায় থাকছি নে, দোকান গুটিয়ে নিয়ে দেশে টাকা নিয়ে চলে যাবো, সেখানে গিয়ে একটা হোটেল খুলে রাজার হালে থাকবো, কেবল পেট ভরে খাবো আর ঘুমোব—

সরযূ বললে—বাবা বলেছে বাবাও আর কিনবে না। কিনে কিনে বাবার খুব ঘেন্না হয়ে গেছে লটারির ওপর, তবু কিন্তু লোকটা যখন টিকিট বেচতে আসে, তখন বাবা আবার না কিনেও পারে না—

হঠাৎ লোকনাথ হন-হন করে আবার দোকানে ঢুকলো।

বললে—কই, সরযূ কোথায় গেল ?

লোকনাথের চেহারা দেখেই যাতুগোপাল বুঝলে বাবু যেন খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। যাতুগোগাল জিজ্ঞেস করলে—কিছু খাবেন বাবু ? গরম ঘুগনি এখুনি কড়া থেকে নামলো—

লোকনাথ বললে—না-না, এখন আমার খাবার সময় নেই, মেজাজ বিগড়ে গেছে—

—কেন ? দেখলুম কর্তা-মা এসেছিলেন !

—ওই জন্যেই তো মেজাজ বিগড়ে গেল। কেউ কিছু পড়বে না, কেউ কিছু শিখবে না, জানবে না, খবরের কাগজ আর ডিটেকটিভ নভেল পর্যন্ত ওদের বিদ্যের দৌড়। কিন্তু টেরিলিন-টেরিকট পরে দিদিমার কাছে মাতব্বরী করবার বেলায় ওস্তাদ—

তারপর কী যেন একটা কথা মনে পড়ে গেল। বললে—দাও, একটা কাগজ দাও তো—

—কাগজ ? কত বড় কাগজ ?

—আরে একটা চিঠি লিখবো, চিঠি লেখবার কাগজ—

একটা নতুন এক্সারসাইজ-বুক থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে দিলে যাদুগোপাল।

কাগজটা হাতে নিয়ে কাঁধের ঝোলা থেকে কলম বার করে সরযূকে জিজ্ঞেস করলে—তোমার পুরো নামটা কী বলো তো?

শুধু পুরো নামই নয়, পুরো ঠিকানাটিও জিজ্ঞেস করে নিলে।

তারপর খশ্ খশ্ করে একটা লম্বা চিঠি লিখে ফেলে সরযূর দিকে সেটা এগিয়ে দিলে। বললে—এই ঠিকানায় এটা নিয়ে যাও, নিয়ে গেলেই তোমার চাকরি হয়ে যাবে—

সরযূর মুখের ভাব-ভঙ্গি দেখে একটু অবাক হয়ে গেল লোকনাথ। বললে—তুমি তো চাকরিই চেয়েছিলে আমার কাছে, চাওনি?

—হ্যাঁ, তা তো চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন, আপনি কারো উপকার করবেন না!

লোকনাথ বললে—আমি তো তোমার উপকার করলাম না, তোমার ক্ষতিই করলাম তোমাকে চাকরি দিয়ে—

—চাকরি পেলে আমার ক্ষতি হবে?

—শুধু ক্ষতি নয়, সর্বনাশও হবে, দেখে নিও। সেদিন আমার কথা মনে রেখো। ভিক্ষে দিলে মানুষের উপকার করা হয় না, সর্বনাশই করা হয়।

লোকনাথের কথার তাৎপর্য সরযূ তবু বুঝতে পারলে না। বললে—আমি আপনার কথার মানে বুঝতে পারলাম না, কিন্তু আপনি যে আমার কী উপকার করলেন তা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না। জানেন, আমার বুড়ো বাবা-মা, ভাই-বোন, সবাই পেট ভরে খেতে পায়নি এতকাল—

লোকনাথ বললে—হয়ত তাই, কিন্তু আসলে আমি যে তোমার সর্বনাশই করলাম এটা একদিন তুমি না হোক, তোমার বাবা-মা-ভাই-বোন সবাই বুঝতে পারবে—

সরযূ তাড়াতাড়ি লোকনাথের পায়ে হাত দিয়ে পায়ের ধুলো

নিতে যাচ্ছিল, কিন্তু লোকনাথ পিছু হটে এলো।

বললে—ওটি চলবে না—তুমি চাকরি চাইছিলে, তাই চিঠি দিলুম, এখন দেখো তোমার চাকরি হয় কি না—

সরযূ আর কী বলবে, যাত্নগোপালের দিকে চেয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করে চলে গেল। বললে—আমি আসি তাহলে—

সরযূ চলে গেলে লোকনাথও চলে যাচ্ছিল, যাত্নগোপাল পেছন-পেছন গিয়ে একবার ডাকলে—বাবু—

লোকনাথ পেছন ফিরে দাঁড়ালো। বললে—তোমার আবার কী যাত্নগোপাল ? তুমি কী চাও ?

যাত্নগোপাল বললে—আজকে তো কিছু খেলেন না বাবু, ভালো ঘুগনি করেছিলাম—

—ঘুগনি ?

—হ্যাঁ, আমি তো আপনাকে সন্দেশ-রসগোল্লা-চপ-কাটলেট কিছুই খাওয়াতে পারি না, সামান্য তেলেভাজা খাইয়ে যতটুকু পারি খাতির করবার চেষ্টা করি—

লোকনাথ ফিরে দাঁড়ালো। বললে—যাত্নগোপাল, তোমার দোকান তেলেভাজার দোকান, গরীব লোকেদের জন্যে দোকান। যারা বড়-বড় হোটেলে যেতে পারে না, তাদের জন্যেই তুমি এই দোকান করেছ। আমি তো এসব জেনেই তোমার এখানে আসি। তুমি কি মনে করো আমি বড় বড় হোটেলে চপ-কাটলেট খেতে যেতে পারি না ? টেরিলিন-টেরিকট পরে স্যুটেড-বুটেড হয়ে অন্য সকলের মত গাড়ি হাঁকাতে পারি না ?

যাত্নগোপাল এই প্রশ্নটাও যেমন জানে, তেমনি এর উত্তরটাও জানে। কিন্তু উত্তর দেওয়া বৃথা মনে করে চুপ করে রইল।

লোকনাথ বলতে লাগলো—কিন্তু আমি একলা চপ-কাটলেট খেলে তো চলবে না যাত্নগোপাল। সকলকে যেদিন চপ-কাটলেট খাওয়াতে পারবো, সেই দিনই ও-সব খাবো। কিন্তু ওরা তো তা বোঝে না—

—ওরা মানে ?

—ওই বিকাশ, সুধাংশু···তুমি তাদের কথা জানো না। ওরাই তো আমার দিদিমাকে বুঝিয়েছে আমি নাকি পাগল হয়ে গিয়েছি। তা আমিও বলি, বেশ করেছি আমি পাগল হয়েছি—

যাদুগোপাল বললে—আপনি ওই সরযু মেয়েটার যা করলেন বাবু, তা কেউ করে না—

—আরে আগে চাকরি হোক, তারপরে বোল।

—আজ্ঞে, আপনি যখন লিখে দিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই হবে, ও আর দেখতে হবে না।

লোকনাথ গম্ভীর হয়ে গেল। খানিক পরে বললে—তুমি জানো না যাদুগোপাল, আমি ওর ক্ষতিই করলাম। ওর যে কত বড় ক্ষতি করলাম তা তুমি এখন বুঝতে পারবে না, বুঝতে পারবে তখন, যখন আর কোনও উপায় থাকবে না—

যাদুগোপাল বললে—ও চাকরি পেয়ে গেলে, ওর বাপ-মা, ভাই-বোন খেতে পাবে আর আপনি বলছেন ওর সর্বনাশ করলেন ?

—হ্যাঁ, এখন বুঝছো না তোমরা কেউ, কিন্তু পরে বুঝবে। আমাদের দেশে যত লোক বাড়ছে যাদুগোপাল, ততই তো ভয় বাড়ছে—

—কেন ?

লোকনাথ বললে—আরে হ্যাঁ, শুধু যে ভিখিরী বাড়ছে। পপুলেশান বাড়ছে না, কেবল ভিখিরি বাড়ছে। এই যে সরযুর চাকরি হলো, এতে আর একটা ভিখিরী বাড়লো—

তারপর যেন আরো অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। নিজের মনেই বলতে লাগলো লোকনাথ—সারা পৃথিবীটাকে ওরা ভিখিরী বানিয়ে ছাড়লে যাদুগোপাল, এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আর নেই, জানো ? সমস্ত লোক হাত পেতে বসে আছে। আমাদের চাকরী দাও, আমাদের খেতে দাও, আমাদের চাল দাও, কিংবা আমাদের রাইফেল দাও, বুলেট দাও, মেশিনগান দাও—

বলতে বলতে লোকনাথ সেই জনবহুল রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে যেন নিজের মনেই বিড় বিড় করতে লাগলো।

তারপর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললে—আচ্ছা যাদুগোপাল, তুমি কিছু চাও ?

—আমি ? আমি কিছু চাই কিনা জিজ্ঞেস করছেন ?

—হ্যাঁ জিজ্ঞেস করছি, তুমিও তো একজন ভিখিরী ?

যাদুগোপাল লজ্জায় পড়লো। বললে—ভিখিরী না হলে কি আর পাঞ্জাবের লটারির টিকিট কিনি বাবু ? ওই আশাতেই তো বেঁচে আছি, একদিন লটারির টিকিট পেয়ে বড়লোক হয়ে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আরাম করে খাবো আর ঘুমোব—

লোকনাথ বললে—ও শুধু তোমার কথাই নয় যাদুগোপাল, এ তোমার আমার সকলের মনের কথা। একদিন আমেরিকা আমাদের মোটা টাকার সাহায্য দেবে, মোটা টাকার চাল গম ওষুধ ইনজেকশান দেবে, দেবে রাইফেল, বুলেট আর মেশিনগান, আর আমরা পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আরাম করে খাবো আর ঘুমোব। আসলে আমাদের সবাইকে ভিখিরী বানিয়ে দিয়েছে ওরা যাদুগোপাল, সারা পৃথিবীর লোকই আজ ভিখিরী—

যাদুগোপাল চুপ করে শুনছিল, কিন্তু কিছু বুঝতে পারছিল না।

লোকনাথ বললে—আসি, যাদুগোপাল—

—কিন্তু কাল আসছেন তো আবার ?

লোকনাথ বললে—আসবো না তো যাবো কোথায় যাদু-গোপাল। সেই সকাল বেলা বেরিয়েছি বাড়ি থেকে, তারপর গিয়েছি বেলগাছিয়া, সেখান থেকে হাওড়া, হাওড়া থেকে খিদিরপুর, খিদিরপুর থেকে এখানে।

—এবার বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন তো ?

—না, এবার যাবো টালিগঞ্জ।

—টালিগঞ্জে কেন ?

লোকনাথ এবার হাসলো। বড় মিষ্টি সে হাসি।

বললে—টালিগঞ্জে একজনকে ভালবেসে ফেলেছি যাদুগোপাল—

—আপনি ভালোবেসে ফেলেছেন? আশ্চর্য লাগছে তো! কাকে?

—সে একটা মেয়েকে যাদুগোপাল, একটা মেয়েকে!

—মেয়ে? আপনি একটা মেয়েকে ভালবেসেছেন?

—হ্যাঁ, যাদুগোপাল!

—মেয়েটা কে?

—সে তুমি চিনবে না যাদুগোপাল।

—তার নাম কী বাবু?

—বকুল!

—বকুল?

—হ্যাঁ যাদুগোপাল, সে এক আশ্চর্য মেয়ে।

বলে লোকনাথ আর দাঁড়ালো না। সেই জনবহুল গলি দিয়ে সোজা বড় রাস্তার দিকে চলতে লাগলো।

সাত

সহজ সরল স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি দিয়ে যা বোঝা যায় তা হলো অঙ্ক। অঙ্কই আমাদের শেখায় যে দুই আর দুই যোগ করলে যোগফল দাঁড়ায় চার। লোকনাথের দাদামশাই, দিদিমা সেই অঙ্কটাই জানতো। অষ্টাদশ আর উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে এক ধরনের শিক্ষা মানুষের মনে গেঁথে গিয়েছিল। সে-শিক্ষার মূল কথা ছিল ব্যক্তিগত উন্নতি। কার্তিক রায় নিজের হাতে, নিজের চেষ্টায়, নানা ঘটনার সহযোগিতায় পয়সা উপায় করে বড়লোক হলেন। তাঁর ছেলে ছিল না, জামাই-ই ছিল বলতে গেলে ছেলের মতন। জামাই-ই শ্বশুরের কারবার দেখাশোনা করতে লাগলো। তারপরে একদিন লোকনাথ জন্মালো।

লোকনাথ জন্মিয়েই দেখলে এ এক অদ্ভুত জগৎ। প্রথমতঃ

দেখলে, এখানে মানুষ জন্মায় এবং জন্মালেই একদিন বুড়ো হয় তারপর একদিন আবার মারা যায়।

কিন্তু যত তার বয়েস হতে লাগলো, তত আরো অনেক কিছু দেখতে পেলে।

প্রথম-প্রথম যখন লোকনাথ নিজের ফ্যাক্টরিতে ঢুকলো, তখন বয়েস অনেক কম। সেই কম বয়েসেই তার মনে হতো সে অন্যায় করছে। বাড়িতে এসে দিদিমাকে বলতো—দিদিমা, আমি আর ফ্যাক্টরিতে যাবো না—

বসুমতী দেবী অবাক হয়ে যেতেন।

বলতেন—কেন রে? যাবিনে কেন? কী হয়েছে তোর? শরীর খারাপ?

লোকনাথ বলতো—না, শরীর খারাপ হয়নি, আমার ভালো লাগছে না যেতে—

দিদিমা বলতো—কেন ভালো লাগছে না?

লোকনাথ বলতো—জানো দিদিমা, আমাদের রামভজনকে চেন তো তুমি?

—রামভজনকে চিনি না? সে কতকালের লোক। তাকে আমার কথা বলিস! তার কী হয়েছে?

লোকনাথ বলতো—সে আজকে আমার কাছে এসেছিল।

—কেন?

—সেই কথাই তো তোমাকে বলছি। আজ সেলস্-ট্যাক্স অফিসার আমার অফিসে এসেছিল আমার সঙ্গে কথা বলতে। তাকে খাতির করবার জন্যে তাকে নিয়ে হোটেলে গিয়েছিলাম লাঞ্চ খেতে, কত টাকার লাঞ্চ খেলুম জানো দু'জনে?

দিদিমা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে—তা তোর যেমন খুশি খেয়েছিস, তাতে আর আমাকে বলবার কী আছে?

—না, তোমার শোনা দরকার আমরা দুজনে কত টাকার লাঞ্চ খেয়েছি। যখন বিল চুকিয়ে দিলুম, তখন খেয়াল হলো

হু'জনে খেয়েছি আশি টাকার মতন—

দিদিমা বললে—তা খেয়েছিল বেশ করেছিস, শরীর রাখতে গেলে খেতে হবে না? না খেলে কাজ করবি কী করে?

লোকনাথ বললে—কিন্তু কাজ কি আমি একলাই করি দিদিমা? আমার ফ্যাক্টরিতে কি আর কেউ কাজ করে না?…

—তা ও-সব কথা ভাবলে কি চলে?

লোকনাথ বললে—কিন্তু আমি যে সেই কথাই ভাবছি দিদিমা। আমি ঠিক করেছি, রামভজনের মাইনে বাড়িয়ে দেব—

—কেন? ও কি মাইনে বাড়াবার কথা বলছিল তোকে?

লোকনাথ বললে—না, তা বলেনি, কিন্তু আজকে হু'জনের একবেলার খাই-খরচ আশি টাকা দেখে আমার মনে স্ট্রাইক করলো—রামভজন তো মাসে মাইনে পায় আশি টাকা। ঐ টাকায় ও এখানে খাবেই বা কী, আর দেশেই বা পাঠাবে কী? তাই আজকে ওর মাইনে বাড়িয়ে দেবার জন্যে আমি কেদারবাবুকে ডেকে পাঠালুম। কেদারবাবুকে চেনো তো? কেদার সরকার, আমাদের অ্যাসিসটেন্ট অ্যাকাউনটেন্ট—

—হ্যাঁ, তা তো চিনি!

—কিন্তু তুমি শুনলে অবাক হবে দিদিমা, কেদারবাবু শুনে কী বললে জানো? বললে, অমন কাজও করবেন না স্যার, ওতে ইউনিয়নের মধ্যে তুমুল গণ্ডগোল শুরু হয়ে যাবে, তখন আমি আর তা ঠেকাতে পারবো না।

অথচ আশ্চর্য, ওই কেদার সরকার। ওই কেদার সরকারই একদিন অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্-এর ইউনিয়নের সেক্রেটারি ছিল। ওরই কথায় ফ্যাক্টরির অফিসারেরা উঠতো বসতো। ওরই জন্যে কোম্পানিতে ছুটো ইউনিয়ন হতে পারেনি। এই কেদার সরকার নামে অ্যাসিসটেন্ট অ্যাকাউনটেন্ট, কিন্তু আসলে অ্যাকাউন-টেন্টের মাথার ওপর তার অবস্থান। কোথাও কিছু লেবার-ট্রাবল হলেই লোকনাথের বাবা সন্তোষ রায় ওই কেদার সরকারকে

বাড়িতে ডেকে পাঠাতেন।

সন্তোষ রায় ছিলেন মিঠে-কড়া মানুষ। শ্বশুর কার্তিক রায়ের মতন নন। অবশ্য কার্তিক রায়ের আমলও ছিল আলাদা। সে-যুগে কার্তিক রায় তো শুধু ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট নন, দেশের লোকের কাছে তিনি ছিলেন আবার কর্মবীরও বটে। ব্যবসা করা মানেই স্বদেশী করা, দেশ-সেবা করা। এই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। তিনি আজীবন খদ্দর পরতেন। বিলিতী জিনিস স্পর্শ পর্যন্ত করতেন না। তাঁর আমলে এসব লেবারও ছিল না, এসব ট্রাবলও ছিল না।

তখনকার আমলে বিজয়া-দশমীর দিন কর্মচারীরা বাড়িতে এসে কর্তা-গিন্নীকে প্রণাম করে যেত। পাতা পেতে পেট ভরে খেত, তারপর খুশি হয়ে কর্তা সকলকে বোনাস দিতেন।

লেবার-ট্রাবল বলতে গেলে শুরু হয়েছিল জামাইবাবুর আমলে।

তিনিই প্রথম ইউনিয়নের সূত্রপাত করে দেন। তখন ইংরেজরা চলে গেছে। কিন্তু গণ্ডগোল তখন থেকেই শুরু। সূত্রপাত হয়েছিল একটা ধর্মঘট দিয়ে। সেই ধর্মঘট যখন চরমে উঠেছে, তখন সন্তোষ রায় ওই কেদার সরকারকে ডেকে তার হাতে দু' হাজার টাকা দিয়ে দিলেন।

কেদার সরকার অবাক হয়ে গিয়েছিল তখন।

বলেছিল—আমাকে এত টাকা দিলেন কেন স্যার?

সন্তোষ রায় বলেছিলেন—আপনার তো মাইনে কম, এটা আপনাকে এমনি বোনাস হিসেবেই দিলুম।

—বোনাস? কীসের বোনাস?

—আপনি তো সেক্রেটারি আমাদের ইউনিয়নের। আর আপনার মাইনেও তো কম। তা আমাদের ডাইরেক্টর বোর্ডের মীটিং-এ তাই ঠিক হয়েছে আপনাকে কিছু একস্ট্রা টাকা দেবার—

তারপর একটু হেসে বললেন—দেখুন, আমাদের ইচ্ছে ছিল আপনাকে হেডক্যাশিয়ার করে দেব। আপনি কি তাতে রাজী?

কেদার সরকার চুপ করে রইল।

—আপনি যদি চান তো আপনাকে ক্যাশিয়ার করে দিতে পারি, তাতে আপনার সাতশো টাকা মাইনে বাড়বে। কিন্তু তখন আপনি তো আর ইউনিয়নের সেক্রেটারি থাকতে পারবেন না—

কেদার সরকার বলল—কিন্তু ইউনিয়ন তো আমাকেই চায়, স্যার—

—আমিও তো তাই চাই। আমি চাই আপনি ইউনিয়নেই থাকুন। আপনি থাকুন এটা কোম্পানির ডিরেক্টর-বোর্ডও চায়। কিন্তু হেড ক্যাশিয়ার হলে তো আর সেক্রেটারি থাকা চলবে না, লেবার অ্যাক্ট-এ তো সে-নিয়ম নেই—

কেদার সরকার বললে—হেড ক্যাশিয়ার বা হেড অ্যাকাউনটেণ্ট হয়েও আমার দরকার নেই স্যার, হলে ওরাও আমাকে আর বিশ্বাস করবে না—

—তাহলে আপনি এবার থেকে মাসে-মাসে মাইনে ছাড়া আমার কাছ থেকে থাউকো সাতশো টাকা নিয়ে যাবেন। সেটা আর আমার কোম্পানির হিসেবের মধ্যে লেখা থাকবে না—

—কিন্তু তা বলে মনে করবেন না স্যার যে, লেবারদের স্বার্থ আমি দেখবো না।

—তা আপনি দেখুন না। যত ইচ্ছে আপনি ওদের ভালো দেখুন। যখন যেখানে অন্যায় অত্যাচার দেখবেন, আপনি কোম্পানির নজরে আনবেন। তার জন্যেই তো আপনি ওদের সেক্রেটারি হয়েছেন।

তারপর একটু থেমে সন্তোষ রায় আবার বললেন—আর একটা কথা। আপনি বাইরের কাউকে ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট করতে দিতে পারবেন না। ওই বাইরের লোক যেখানে ঢুকেছে সেখানেই যত গণ্ডগোল বেধেছে।

—কিন্তু প্রেসিডেণ্ট তো একজন রাখতেই হবে।

—প্রেসিডেণ্ট রাখতে যদি হয়, তো আপনিই প্রেসিডেণ্ট থাকুন।

অন্য কাউকে সেক্রেটারি করে দিন। কিন্তু দয়া করে পলিটিক্যাল কোনও লীডারকে এর মধ্যে ঢোকাবেন না। তার চেয়ে আমি কোম্পানি বন্ধ করে দেব সে-ও ভালো—

সেই থেকেই কেদার সরকার এই কোম্পানির ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হয়ে ছিল। তখন থেকে কেদার সরকার একদিকে সাপ হয়ে কামড়াতো, আবার অন্যদিকে ওঝা হয়ে ঝাড়তো। তার ফলে কোম্পানির যেমন লোকসান হয়নি, লেবারদেরও তেমনি ভালো হয়েছিল।

কিন্তু সন্তোষ রায়ের মৃত্যুর পর লোকনাথের আমলেই গণ্ডগোলটা শুরু হলো।

রামভজনকে সেদিন ডেকে পাঠালো লোকনাথ।

বললে—তুমি কত মাইনে পাও রামভজন?

রামভজন এতকাল চাকরি করে আসছে। কর্তাদের আমলে তার প্রথম প্রবেশ। তারপর সুখে-দুঃখে প্রাণ দিয়ে কোম্পানির সেবা করে এসেছে। প্রভুভক্ত কুকুরের মত প্রভুর মঙ্গল-চিন্তাই কেবল করে এসেছে। তার মধ্যে কোথাও কোনওদিন কোনও ফাঁকিকে প্রশ্রয় দেয়নি সে। আজ এতদিন পরে সাহেবের মুখে এ-প্রশ্ন শুনে সে অবাক হয়ে গেল।

—বলো, কত মাইনে পাও তুমি?

—হুঁজুর, সব মিলিয়ে একশো তিরিশ।

—দেশে কত টাকা পাঠাও?

—শ'ও রুপেয়া।

—কে কে আছে তোমার দেশে?

—দুটো লেড়কা আর বিবি।

—জমি-জমা, ক্ষেত-খামার কিছু আছে?

—আছে হুঁজুর, চারটে ভৈস্ আছে আর মকান, তিন বিঘে জমিন—

লোকনাথ বললে—আচ্ছা, তুমি যাও—

কেদার সরকার লোকনাথের মুখে সব শুনে বললে—আপনি কিন্তু বড় খারাপ করলেন স্যার, ছোটলোকদের সঙ্গে আপনি নিজে কেন কথা বললেন? আমি তো আপনাকে বলেছি, যা বলতে হবে আমার থ্রু দিয়ে বলবেন। আপনি যদি হঠাৎ এখন রামভজনের মাইনে বাড়িয়ে দেন, তো অন্যরা কী ভাববে বলুন দিকিনি?

—তা আপনি এতদিন ওদের কথা আমাকে জানান নি কেন?

কেদার সরকার বললে—আপনি বলতে দিলেন কই? আমাকে তো এমনি একটা সিঙ্গল কেস নিয়ে বললে চলবে না। ট্রেড-ইউনিয়নের একটা কানুন আছে। কানুনমাফিক সব করতে হবে তো আমাকে। নতুন করে পে-স্কেল্ তৈরি করতে হবে, কিংবা ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স বাড়াতে হবে—

লোকনাথ রেগে গেল। বললে—তা যেটা করলে ভালো হয়, সেটা করবেন তো! আপনি যখন ইউনিয়নের কর্তা, তখন আপনার সাইড থেকেই তো কথাটা আগে আসা উচিত ছিল। তা নয়, আমি বলবো তবে আপনি সেটা টেক-আপ করবেন? জানেন, আজকে হোটেলে লাঞ্চ খেতে গিয়েছিলুম সেলস-ট্যাক্স্ অফিসারকে নিয়ে, সেখানে আমাদের বিল হলো আশি টাকা, তা জানেন? আমাদের ওই রামভজনের যেটা বেসিক পে—

কেদার সরকার অ্যাকাউন্টস অফিসে ছোটবেলায় সেই কর্তাদের আমল থেকে কাজ করছে। একবার মিসেস রায় যখন ম্যানেজিং-ডাইরেক্টার, তখনও কাজ করেছে। কিন্তু এই লোকনাথ রায় আসার পর থেকেই যেন অন্য রকম হয়ে গেছে। অফিসের চিরাচরিত হালচাল সব বদলে যাবার দাখিল হয়েছে। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, ডেকে পাঠায় ওয়ার্কস্-ম্যানেজারকে। জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা, মিস্টার সিন্‌হা, কোম্পানির ফিউচার কেমন?

অবাক কাণ্ড! মিস্টার সিনহা বলে—ফিউচার তো ভালোই স্যার—

লোকনাথ বলে—দেখুন, ফিউচার ভালো কি খারাপ বুঝি না, এ-কোম্পানি কি আমাদের কান্ট্রির, আমাদের দেশের, আমাদের ওয়ার্কারদের কিছু ভালো করছে মনে করেন ?

—নিশ্চয় ভালো করছে স্যার। লাস্ট-ইয়ারের ব্যালেন্স-সীট দেখেছি, অডিটার্স রিপোর্টও পড়েছি, আপনিও পড়েছেন। তাতেই তো বুঝতে পেরেছেন ফিউচার কী ব্রাইট—

লোকনাথ বললে—দেখুন, ওই ব্যালেন্স-সীট হচ্ছে অল্ ফ্রড। অ্যাকাউটেন্টস্‌দের হাতসাফাই। ও আমি বিশ্বাস করি না। ওরা দিনকে রাত করতে পারে, রাতকে দিন। কথা হচ্ছে, এই 'অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্' দেশের কিছু কল্যাণ করছে কি না—

—নিশ্চয় করছে স্যার। দেশে যত এইরকম লিমিটেড কোম্পানি গড়ে ওঠে ততই ভালো, প্রোডাকশান ততই বাড়বে। আর প্রোডাকশান বাড়লেই কান্ট্রির উন্নতি—

—কান্ট্রি ? কান্ট্রি মানে ?

ওয়ার্কস্ ম্যানেজার মিস্টার সিন্‌হা বললে—কান্ট্রি মানে আমাদের বেঙ্গল, আমাদের ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়ার উন্নতিই তো আমরা সবাই চাই।

লোকনাথ বললে—আর ইউ শিওর, কান্ট্রির উন্নতি আমরা চাই ?

—নিশ্চয়ই চাই স্যার! তা না হলে লেট মিস্টার রায় এই কোম্পানি করেছিলেন কেন? নিজের উন্নতি, নিজের প্রপার্টি করবার জন্যে তো করেননি। চেয়েছিলেন সাধারণ গরীব মানুষদের ভালো করবার জন্যে।

—সে ভালো কি হয়েছে ?

এর উত্তর কেউ দিতে পারেনি। লোকনাথ যতদিন 'অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টার ছিল, ততদিন কেউই দিতে পারেনি সে-উত্তর।

বসুমতী দেবী একদিন বলেছিলেন—তুই ওসব নিয়ে মাথা

ঘামাচ্ছিস কেন খোকা? ওই চেয়ারে আমিও তো একদিন বসেছি, কই লেবার নিয়ে আমি তো কোনও দিন মাথা ঘামাইনি। ওসব ব্যাপার আমি বরাবর মিস্টার সরকারের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলাম—

আশ্চর্য, সেই মিস্টার সরকার যখন অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ থেকে বিদায় নিলেন, তখন পঞ্চাশ হাজার টাকা নিলেন শুধু খেসারত হিসেবে। যেমন আর সবাইকে কিছু কিছু দেওয়া হয়েছিল, তেমনি।

কিন্তু ততদিনে লেবার-লীডার হিসেবে মিস্টার সরকার গাড়ি-বাড়ি-প্রপার্টি করে নিয়েছে। বেশ গুছিয়ে নিয়েছে নিজের ভবিষ্যৎ! বলতে গেলে ওপর-দিকে যারাই ছিল, তারা সবাই-ই মোটা টাকা গুছিয়ে নিয়েছে।

আর সেই রামভজন?

সেই দিনই রামভজনের খোঁজ পড়লো আবার। কোম্পানি তখন ছেড়ে দিয়েছে লোকনাথ।

রামভজনও অবাক, লোকনাথও অবাক।

রামভজন তখন একটা বস্তির মধ্যে উঠে গিয়েছে। তার কাছে লোকনাথকে আসতে দেখে বললে—হুঁজুর আপনি?

গাড়ি নেই, নেই সেই সাজ-পোশাক। তার বদলে এক মুখ দাড়ি, ময়লা পাঞ্জাবি, হাতে একটা ঝোলা।

—তুমি কেমন আছো রামভজন?

রামভজন বহু বছর ধরে কলকাতায় আছে। বহু অভিজ্ঞতা হয়েছে তার। কলকাতায় জাপানীদের বোমা পড়া দেখেছে, কলকাতা ছেড়ে পালানোর ঘটনা দেখেছে, দুর্ভিক্ষ দেখেছে, রাস্তায় রাস্তায় মানুষ মরে থাকতে দেখেছে, তারপর দেখেছে দাঙ্গা। হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সময় রামভজন মালিকের বাড়ি পাহারা দিয়েছে বন্দুক নিয়ে। সে-সব দিনের কথা মনে আছে রামভজনের। কিন্তু এমন ঘটনা কখনও দেখেনি।

—তুমি এখনও চাকরি করছো রামভজন ?

—করছি হুজুর।

—কত পাচ্ছো ? এখন তো তোমাদের নিজেদের কোম্পানি ? মাইনে কি বেড়েছে তোমার ?

রামভজন বললে—না বাড়েনি, কমে গেছে, পঞ্চাশ টাকা মাইনে কমে গেছে। ম্যানেজারবাবু বলছে—কোম্পানির লোকসান যাচ্ছে—

লোকনাথ চারদিকে চেয়ে দেখলে। মানিকতলার বস্তি এলাকা। নোংরা আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে লোকনাথ একবার রামভজনের দিকে চাইলে আর চাইলে চারদিকের বস্তির দিকে। ছোট-ছোট বাড়ি, মাথার টিনের ওপর ইঁট চাপা! আর তারপর লোকনাথ কখন যে হাত বাড়িয়ে রামভজনের হাতে টাকা গুঁজে দিয়েছে তা তার খেয়াল ছিল না। বোধহয় রামভজন কল্পনাও করতে পারেনি যে বড় সাহেব নিজে এসে তাকে অমন করে টাকা দিয়ে যাবে। তার খোঁজ-খবর নেবে। সে খেতে পাচ্ছে কি পাচ্ছে না, তা নিজের চোখে দেখে যাবে।

মনে আছে, রামভজনের চোখ দিয়ে শেষ পর্যন্ত জল গড়িয়ে পড়েছিল। সে ভাবতেও পারেনি হুঁজুর এমন করে তার আস্তানা খুঁজে তাকে বার করবে।

হাতে তখনও তার টাকাগুলো রয়েছে। এক-একটা একশো টাকার নোট। ওই রকম পাঁচখানা নোট। এ যেন ভাবতেও পারেনি রামভজন। শুধু নোটগুলো নিয়ে তখন অনুভব করতে লাগলো সে। তারপর যখন খেয়াল হলো, তখন দেখলে হুঁজুর আর নেই।

একবার যে সেলাম করবে, সেলাম করে তার মনের কৃতজ্ঞতা জানাবে, তারও উপায় রইল না আর। হুঁজুর তখন সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। রামভজন সেদিন জানতেও পারলে না যে সেই পাঁচশো টাকা লোকনাথের আশি টাকার লাঞ্চ খাওয়ার খেসারত ছাড়া আর কিছু নয়।

পাঁচ

এসব ঘটনা আগেকার। তখন লোকনাথের মনের ভেতর যে বিপ্লব চলেছে, তা বাইরের লোকের জানবার কথা নয়। বাইরে থেকে আমরা জানি লোকনাথ বিরাট অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। একদিন সে বিয়ে করবে, ভালো বংশের সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী বিদুষী মেয়ে দেখেই বাড়ির বউ করে নিয়ে আসবে তার দিদিমা।

এইটেই সাধারণ অঙ্ক। সমস্ত পৃথিবীটা এই অঙ্ক মেনেই চলছে। লোকনাথের বেলাতেও সেই অঙ্ক নিশ্চয়ই মিলে যাবে।

কিন্তু হঠাৎ একদিন বিকাশ এসে একটা খবর দিলে।

বললে—জানিস, আমাদের লোকনাথের খবর জানিস?

বললাম—কী খবর?

বিকাশ বললে—অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ তো লালবাতি জ্বেলেছে রে—

বললাম—লোকনাথের অফিস?

—হ্যাঁ।

—কেন? কী হয়েছিল? কোম্পানি ফেল মেরে গেল?

বিকাশ যেন একটা আনন্দের খবর পেয়ে ডগমগ হয়ে আছে। যেন খুশি হয়েছে বিকাশ লোকনাথের অধঃপতনে।

বললে—দেখ, যদ্দিন বাবা ছিল চলছিল, লেবার-লীডার কেদার সরকারকে আণ্ডারহ্যাণ্ড টাকা দিয়ে কোম্পানি চালিয়ে যাচ্ছিল, এখন বাবা মারা যাওয়ার পর লোকনাথ আর চালাতে পারলে না। বাবা, আজকাল ফ্যাক্টরি চালানো কি অত সহজ? কোম্পানি আমাদের যে আড়াই হাজার টাকা করে মাইনে দিচ্ছে, এ-কি মুখ দেখে? আমি আছি, তাই কোম্পানি আছে, এটা কেউ বোঝে না—

বললাম—কী, ব্যাপারটা কী? ভেতরের খবরটা কী?

বিকাশ বললে—ভেতরের খবরটা ঠিক এখনও পাইনি। মনে হচ্ছে এর পেছনে কোনও মেয়েমানুষ আছে—

—মেয়েমানুষ?

বিকাশ বললে—মেয়েমানুষ না থাকলে তিন-পুরুষের এই লিমিটেড কোম্পানি কেউ নিজের ইচ্ছেয় ছেড়ে দেয়?

বিকাশ বললে বটে কথাটা, কিন্তু আমার বিশ্বাস হলো না। মেয়েমানুষ পেছনে না থাকলেও যে কোম্পানি ওঠে, এ-ঘটনা তো কতই দেখেছি। আমি অনেক গবেষণা করেও বুঝতে পারলাম না এর কারণ কী! যারা ব্যবসার জগতের খবর রাখে, তাদের জিজ্ঞেস করলাম কারণটার কথা। কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারলে না। বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে কোলাবোরেশন, মোটা টাকার প্রফিট। বলতে গেলে লোকনাথের ব্যবসাটা ছিল মনোপলির ব্যবসা। কমপিটিশনের বালাই নেই। লোকসানেরও বালাই নেই। মটর-গাড়ির এজেন্সির সঙ্গে প্রফিটের বাঁধা রেট। নিয়ম করে শুধু সেলস-ট্যাক্স দিয়ে যাও, আর কিচ্ছু করতে হবে না তোমাকে।

কিন্তু তারপরেই হঠাৎ একদিন আচমকা বিকাশ আমার অফিসে আবার দৌড়তে দৌড়তে এল।

বললে—কী বলেছিলাম? বলিনি যে এর পেছনে একটা মেয়েমানুষ আছে?

আমি হতবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

বিকাশ বললে—লোকনাথ একটা চিঠি দিয়েছে আমাকে—

—তোর কাছে চিঠি পাঠিয়েছে?

—হ্যাঁ, লিখেছে একটি মেয়েকে চাকরি দিতে। সেই মেয়েটাই চিঠিটা নিয়ে আজ আমার কাছে একটু আগে এসেছিল—

—কী রকম দেখতে? কত বয়েস?

কোনও মহিলা সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল হলেই প্রথমে মনে ওই দুটো প্রশ্নেরই উদয় হয়। কী রকম দেখতে, আর কত বয়েস।

বিকাশ বললে—নট ব্যাড্, আর বয়েস কত আর হবে, বড় জোর ছাব্বিশ-সাতাশ, তার বেশি নয়--

—কী নাম

—সরযূ সিকদার—

—কী চায় ?

—চায় আবার কী, চাকরি।

—তুই চাকরি দিবি তাকে ? ভেকেন্সি আছে তোর ?

বিকাশ বললে—তুই কী বলিস ? তোকেই জিজ্ঞেস করছি, চাকরি দেব ? আফটার অল লোকনাথ আমাদের ক্লাশফ্রেনড, এখন তার অবস্থা যাই হোক, এককালে তো ওরা বলতে গেলে ক্যালকাটার কিং ছিল—

আমি জিজ্ঞেস করলাম—তুই তাকে চাকরি দিবি ? কী ঠিক করেছিস

বিকাশ লোকনাথের চিঠিটা পেয়ে যেন হঠাৎ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লোকনাথকেও অতিক্রম করে গেছে। প্রেস্টিজের দাঁড়িপাল্লায় উঁচু দিকটা যেন আবার এতদিন পরে প্রতিষ্ঠার ভারে বিকাশের দিকে ঝুঁকে পড়েছে !

বললে—এখনও কিছু ঠিক করিনি ভাই, তুই বল না কী করবো ? চাকরি দেব ?

—ভেকেন্সি আছে ?

—ভেকেন্সি না-থাকলেও আমি পোস্ট ক্রিয়েট করতে পারি।

বললাম--কিন্তু মেয়েটা কি কোয়ালিফায়েড ?

বিকাশ বললে—তা কোয়ালিফায়েড। আজকাল যা-যা কোয়ালিফিকেশন থাকা দরকার সে সবই তার আছে।

—কী রকম ?

—বয়েস কম, স্বাস্থ্যটা ভালো, এই দুটোই তো আজকাল সবচেয়ে বড় কোয়ালিফিকেশন।

বলে হো-হো করে হেসে উঠলো বিকাশ। আমি বিকাশের

সে-হাসি দেখে আঁতকে শিউরে উঠলাম।

বিকাশের সামনে আমি যে-কথাই বলি না কেন, আর লোকনাথকে নিয়ে আমরা যত হাসি-ঠাট্টাই করি না কেন, লোকনাথ সত্যিই ছিল আমাদের সকলের কাছে একটা রহস্য। নানা জায়গা থেকে লোকনাথ সম্বন্ধে এত রকমের খবর আমাদের কানে আসতো যে, আমরা ভাবতাম হয় লোকনাথ হয় পাগল আর নয় তো একটা মহাপুরুষ! আর তা ছাড়া আজকের যুগের মহাপুরুষ নামে যারা চলছে, তাদের আসলে শয়তান ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়। আসলে আমরা সকলেই তো শয়তান, এই আমরা যারা টেরিলিন-টেরিকট পরে সংসারী মানুষ সেজে আছি, আর যারা দেশ-সেবার নাম করে রাজনীতিকে পেশা করেছি। এই দুই দলের সঙ্গে আমাদের মধ্যে আবার আর একটা দল আছে, যারা মানুষকে আধ্যাত্মিক ভাঁওতা দিই, তারাও তো শয়তান। তফাত শুধু এই যে, লোকনাথ যে আমাদের এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কোন দলের সেইটেই ঠিক বুঝতে পারতুম না—

সেদিন হঠাৎ তার সঙ্গে সিঁথির রাস্তায় কেদার সরকারের দেখা হয়ে গেল—এ কি স্যার আপনি? আপনি এদিকে কোথায় চলেছেন?

সেই অটো-ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌-এর সাব-অ্যাকাউনটেন্ট কেদার সরকার। লেবার ইউনিয়নের সেক্রেটারি ছিল। পরে প্রেসিডেন্টও হয়েছিল। আর মাসে-মাসে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেকটারের কাছ থেকে বাঁধা-বরাদ্দ সাতশো টাকা করে ঘুষ নিয়ে যেত।

কেদার সরকারের সঙ্গে আগের দিন দেখা হয়েছিল খিদিরপুরের মনসাতলা লেন-এ, এবার আবার সিঁথিতে। কিন্তু এবার আর

পায়ে-হাঁটা মানুষ নয় কেদার সরকার। একেবারে নতুন গাড়িতে চড়ে চলেছে। লোকনাথকে দেখে নেমে এল কেদার সরকার।

বললে—কেমন আছেন স্যার?

লোকনাথের এক মুখ দাড়ি, কাঁধে ঝোলা, পায়ে চপ্পল। মিস্টার্ সরকারের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। কেদার সরকার বেশ মোটা হয়েছে এবার। গাড়িটার দিকেও চেয়ে দেখলে।

জিজ্ঞেস করলে—এই গাড়িটা—

কেদার সরকার বললে—কিনলুম। আর পায়ে হেঁটে ঘোরাঘুরি করতে পারি না আজকাল—বয়েস তো হচ্ছে।

—হ্যাঁ, আজকাল গাড়ি না হলে চলবেই বা কী করে? লেবার-ট্রাবলও তো আগেকার চেয়ে বেড়েছে।

কেদার সরকার বলে উঠলো—আর বলবেন না স্যার, চারদিকে এত লেবার-ট্রাবল যে আর পেরে উঠছি না। এই তো চীফ-মিনিস্টার কাল ডেকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু আমি কী করবো বলুন, আমার নিজের বিজনেস কে ছাখে তার ঠিক নেই, ওইসব লেবার-ট্রাবল্ সেটেল করা কি আমার দ্বারা পোষায়—

—কিন্তু ওটাও তো আপনার প্রফেশান!

—প্রফেশন নয় স্যার, বলুন মিশন।

লোকনাথ হঠাৎ বলে উঠলো—আচ্ছা মিস্টার সরকার, দেশে যেদিন আর লেবার-ট্রাবল্ থাকবে না, সেদিন আপনাদের মত লেবার-লীডাররা কী করবেন বলুন তো? তখন কি ইণ্ডিয়া ছেড়ে পাকিস্তানে যাবেন? সেখানে গিয়ে লেবার-ট্রাবল্ সৃষ্টি করবেন?

কেদার সরকার হেসে উঠলো—ঠিকই বলেছেন স্যার, দিনকাল যা পড়েছে তাতে দেখছি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে না হোক, আফ্রিকাতেও যেতে হতে পারে—

—তাই যান কেদারবাবু। আপনারা গেলে অন্ততঃ লেবাররা একটু পেট ভরে খেতে পায়। তাদের চাকরিটা অন্ততঃ বজায় থাকে, ধর্মঘটের ভয় থাকে না আর—আর আপনি শুনলে অবাক

হয়ে যাবেন, আমি শেয়ার ছেড়ে দেবার পর অটো-ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কস্-এর রামভজনের মাইনে পঞ্চাশ টাকা কমে গেছে—

কথাটা কেদারবাবুর বোধহয় ভালো লাগলো না।

বললে—এদিকে কি কোনও কাজে এসেছিলেন নাকি স্যার ?

লোকনাথ বললে—কাজ ? কেন, কাজের কথা বলছেন কেন ?

—না, মানে এদিকে তো কখনও দেখিনি কিনা আপনাকে !

লোকনাথ বললে—আমিও তো আপনাকে কখনও দেখিনি এদিকে—

কেদারবাবু বললেন—দেখবেন কী করে আমাকে ? আমি কখনও সিঁথিতে আসি, কখনও থাকি দিল্লিতে, কখনও বোম্বাইতে ; এদিকে সময় মত আসবার যে সময় পাই না মোটে, এই এখন যাচ্ছি দি ইস্টার্ণ জুট মিল-এ—

—কেন ? ও কি আপনার কোম্পানি ?

—না, কী যে বলেন, আমার কোম্পানি হতে যাবে কেন ? আমি ওখানকার লেবার ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট কিনা—

লোকনাথ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—ওখানে কোম্পানি আপনাকে কত করে মাসোহারা দেয়, মিস্টার সরকার ?

—মাসোহারা ? মাসোহারা কিসের ?

লোকনাথ বললে—মাসোহারা কিসের বুঝতে পারছেন না ? অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্-এর কাছ থেকে তো আপনি পেতেন মাসিক সাতশো টাকা করে, আমি সেই সব পুরনো খাতা দেখেছি—

—তখনকার কথা আলাদা, তখন মাইনেও তো কম নিতুম কোম্পানি থেকে।

—মাইনে কম নিতেন বলে ঘুষটা বেশি নিতেন বুঝি ?

কেদার সরকারের তখন বোধহয় খুব তাড়া ছিল কাজের। তাড়াতাড়ি আবার গাড়িতে গিয়ে উঠলো। যেতে যেতে বললে —আপনি একটা গাড়ি কিনুন স্যার, আর হাঁটবেন না, আপনার

হাঁটা মানায় না—

লোকনাথ বললে—আপনি গাড়ি চড়া ধরলেন, আর আমি হাঁটা ধরলুম—মন্দ কী। আপনার শুরু হলো আর আমার সারা—

বলে হেসে উঠলো লোকনাথ। কিন্তু কেদার সরকারের গাড়ি ততক্ষণে লোকনাথের নাকে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেল।

সত্যিই তখন কেদার সরকারের গাড়ি চড়ে বেড়াবারই দিন বটে। কেদার সরকার গাড়ি চড়ে বেড়াবে না তো লোকনাথ রায় গাড়ি চড়বে নাকি!

সরযূ সিকদারের মনে আছে সেই দিনটার কথা। সরযূর কাছে হঠাৎ কে একজন বলেছিল যে অটো-ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কস্-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টার মিস্টার লোকনাথ রায় নাকি তাদের সঙ্গে পড়তো! লোকনাথ রায়ের চেহারার বর্ণনাটাও দিয়েছিল তাকে। স্কটিশচার্চ কলেজের অনেক চেহারার মধ্যে বিশিষ্ট সেই চেহারা। অমন চেহারা একবার দেখলে ভোলা শক্ত। আসতো গাড়ি করে, আবার কলেজের পরে গাড়ি করে বাড়ি চলে যেত। বড়লোকের ছেলে বলে অহঙ্কারে বোধহয় মাটিতে পা ফেলতে লজ্জা হতো তার।

কিন্তু পেট এমনই জিনিস যে সে ইচ্ছে-অনিচ্ছে-লজ্জা-সম্ভ্রম কিছুই মানতে চায় না।

একদিন তাই ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে হাজির হলো সেই অটো-ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কস্-এর অফিসের সামনে।

কিন্তু দূর থেকে বাড়িটা দেখেই কেমন সন্দেহ হলো। অফিসটার সামনে অত পুলিশ কেন? ভয়ে ভয়ে কাছে যেতেই দেখলে অনেক মানুষেরও ভিড়। কারখানা বন্ধ। কারখানার গেটের বাইরে কারখানার কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে। কাউকেই ভেতরে যেতে দিচ্ছে না পুলিস।

আশে-পাশের লোকজনদের কাছে জিজ্ঞেস করলে—এখানে

কী হয়েছে ?

অনেক বলার পর একজন চুপি চুপি বললে—ভেতরে একজন এম্প্লয়ী খুন হয়েছে—

—খুন ?

কথাটা শুনেই চম্‌কে উঠেছিল সরযূ। ঠিক যেদিন সরযূ লোকনাথ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে এল, সেই দিনই কিনা একজন খুন হয়ে গেল ! এও তার ভাগ্য !

তারপরে আর সেখানে দাঁড়ায়নি সরযূ। তারপরে আর চাকরির খোঁজে সেখানে যায়নি।

তা সেই ঘটনার এতদিন পরে আবার সেই প্রসঙ্গ স্মরণ করতে হবে তা সরযূ তখন ভাবেনি।

কিন্তু এরকম কেন হলো ? কেন সেই মানুষটা এই অবস্থায় এসে পৌঁছলো।

কিন্তু সরযূ সেদিন জানতো না যে লোকনাথের জীবনে তখন আরো এক বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। অনেক বিপ্লব আছে যা বাইরে থেকে দেখা যায় না। যা ভেতরে ভেতরে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মত ক্রিয়া করে মানুষকে একেবারে নিঃস্ব করে দেয়। মানুষকে নিঃসহায় নিরবলম্ব করে পথের ধুলোয় নামিয়ে আনে। বাইরের জাঁক-জমকের আড়ালে প্রচণ্ড দারিদ্র্যের আঘাতে সে জর্জরিত হয়ে ওঠে।

আর শুধু সরযূই বা কেন, কেউই তো তা জানতো না। নিজের দিদিমা হয়ে বসুমতী দেবীই কি তা জানতে পেরেছিলেন ?

কিন্তু সেই সময়েই একটা ঘটনাতে হঠাৎ বসুমতী দেবী একদিন চম্‌কে উঠলেন। একদিন একটা মেয়ে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলো।

বসুমতী দেবী প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন—আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? কে সে? কোথা থেকে আসছে?

কুসুম বললে—তা জানি নে, দারোয়ান বলছে খোকাবাবুর সঙ্গে তার দরকার—

—খোকাবাবুর সঙ্গে? তা খোকাবাবু যদি বাড়িতে থাকে তো দেখা করতে বল্ গিয়ে—

কুসুম বললে—দাদাবাবু তো নেই—

—খোকা নেই, তবু আমার সঙ্গে দেখা করবে?

—হ্যাঁ।

তারপর মেয়েটিকে সামনে আনতে বললেন। মেয়েটা আসতেই বসুমতী দেবী তার চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। এ আবার কে? মেয়েটার চেহারা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন এ গরীব লোকের ঘর থেকে এসেছে। একটা সস্তার শাড়ি-পরা, হাতে সেলাই করা ব্লাউজ!

বললেন—কে তুমি? কোত্থেকে এসেছ?

—বেলঘরিয়া থেকে আমি আসছি।

—বেলঘরিয়া?

বসুমতী দেবীর চোখে-মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ছবি ফুটে উঠলো।

বললেন—খোকার সঙ্গে তোমার আলাপ হলো কী করে?

মেয়েটি বললে—আমি ওঁর অফিসে চাকরি চাইতে গিয়েছিলুম। সেখানেই প্রথম দেখা—

—তারপরে? এখন চাকরি গেছে?

মেয়েটি বললে—না, চাকরি আমার হয়ই নি—

—ও, তাহলে এখন তার কাছে চাকরি চাইতে এসেছ? কিন্তু চাকরির জন্যে তো বাড়িতে দেখা করা আমি পছন্দ করি না। তোমরা কেন বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করতে আসো? একটা

মানুষ সারাদিন খেটেখুটে বাড়িতে এসে একটু যে বিশ্রাম করবে তাও কি তোমরা করতে দেবে না তাকে? তোমাদের এত বড় আস্পর্ধা যে তোমরা বাড়িতে এসে তাকে বিরক্ত করো! যাও, আর কখখনো এসো না—যাও—

মেয়েটি খানিক চুপ করে থেকে বললে—আমি কিন্তু চাকরি চাইতে আসিনি—

—চাকরি নয় তো কী করতে এসেছ?

মেয়েটি ব্যাগ থেকে কয়েকটা নোট বার করে বললে—এই টাকা ক'টা তাঁকে দিতে এসেছিলুম—

টাকা! টাকার কথা শুনেই বসুমতী দেবী যেন একটা ধাক্কা খেলেন। খোকাকে টাকা দিতে এসেছে! এমন ঘটনা তো কখনও ঘটেনি! সাধারণতঃ লোকে লোকনাথের কাছ থেকে টাকা চাইতেই আসে, লোকনাথকে টাকা দিতে কেউ কখনও আসেনি আগে! এ তো এক অভিনব ঘটনা। এ মেয়েটা লোকনাথকে টাকা দিতে এসেছে!

—কত টাকা?

—কুড়ি টাকা নব্বুই পয়সা—

বসুমতী দেবী টাকাগুলো আর খুচরো পয়সাক'টা হাতে নিলেন। তারপর বললেন—এ কীসের টাকা?

মেয়েটি বললে—জুতো কেনার—

—জুতো?

মেয়েটি আবার বললে—হ্যাঁ জুতো। লোকনাথবাবু আমাকে একজোড়া জুতো কিনে দিয়েছিলেন, সেই ধার শোধ করে দিলুম আজ—

বসুমতী দেবী আরো অবাক হয়ে গেলেন। লোকনাথ জুতো কিনে দিয়েছে এই হ্যাগার্ড মেয়েটাকে! মেয়েটা কি তাঁকে ব্লাফ দিচ্ছে নাকি?

বললেন—তোমার নাম কী?

—সরযূ। সরযূ সিকদার। বলবেন, সরযূ সিকদার তাঁকে টাকা 'ক'টা দিয়ে গেছে—

তারপর বললে—আপনার যদি মনে না থাকে তো আমি এই কাগজে আমার নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে যাচ্ছি—

বলে নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই বসুমতী দেবী তাকে থামিয়ে দিলেন।

বললেন—শোন, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি। তা এত লোক থাকতে খোকা তোমাকেই বা জুতো কিনে দিতে গেল কেন? তোমার কি জুতো কেনবারও পয়সা নেই?

সরযূ কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেল বসুমতী দেবীর কথা শুনে।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—দেখুন, আমি গরীব হতে পারি, কিন্তু ভাববেন না আমি ভিখিরী। কারো দয়ার দান ভিক্ষে করবার জন্যে আমি আপনার বাড়িতে আসিনি—

বলে আর দাঁড়ালো না, সোজা গট্ গট্ করে নিচেয় নেমে এল। আর তারপর এক মিনিটের মধ্যে সদর রাস্তায় এসে পড়লো—

পাঁচ

সে-সব দিনের কথা কারই বা মনে আছে! তা আর কারো মনে না থাক, বসুমতী দেবীর নিশ্চয়ই মনে আছে! কিন্তু তার আগে লোকনাথের কথা বলি। লোকনাথ হাঁটতে হাঁটতে এক-একদিন চলে যায় একেবারে সেই টালা। বেলগাছিয়ার পুল থেকে নেমেই বাঁ-হাতি ছোটো দোকানটার মালিকের কাছে খানিক বসতে হবে।

—এই যে ছোটবাবু, আসুন আসুন—

নিমাই-এর যখন কিছুই ছিল না, রাস্তায় মাল ফেরি করে বেড়াতো, কখনও মনিহারি জিনিস, কখনও আম কিংবা লিচু, আবার কখনও রুটি-বিস্কুট, সেই সময়ে ছোটবাবুর সঙ্গে আলাপ।

একদিন চার আনার বিস্কুট কিনে ছোটবাবু একটা আস্ত টাকা দিয়ে দিয়েছিল নিমাইকে।

বলেছিল—পরে যখন তোমার প্রফিট হবে তখন ধার শোধ করে দিও—

তা প্রফিটও হয়নি আজ পর্যন্ত, সুতরাং লোকনাথের ধারও শোধ হয়নি। শোধ করতে ব্যস্তও নয় নিমাই।

মাঝে মাঝে ছোটবাবু এলে সে তাই খাতির করবার চেষ্টা করে।

বলে—এক কাপ চা সেবা করবেন আজ্ঞে, ছোটবাবু?

লোকনাথ রেগে যায়। বলে—আমি কি তোমার কাছে ধার শোধ চাইছি হে যে তুমি আমাকে চা খেতে বলছো? তুমি কি মনে করেছ, আমি তোমার উপকারের জন্যে তোমাকে টাকা দিয়েছি? না হে, আমি কারো উপকার করি না। আজকালকার পৃথিবীতে কেউ কারো উপকার করে না। আমাকে চা খেতে বললে আমি কিন্তু চলে যাবো—

বলে উঠতে যাচ্ছিল লোকনাথ।

কিন্তু নিমাই হাত জোড় করে দাঁড়ায়। বলে—আর চা খেতে বলবো না ছোটবাবু, আপনি বসুন—বসুন—

আবার টুলটার ওপর বসে পড়ে লোকনাথ। বলে—জানো নিমাই, আমি যে তোমাকে টাকা দিয়েছিলুম না, সে আসলে তোমার সর্বনাশ করবার জন্যে—

—সে কী?

—হ্যাঁ নিমাই, আমার একটা অফিস ছিল। সেই অফিসের কারখানায় অনেক লোক চাকরি করতো। সকলে মোটা মাইনে পেত। মোটা-মোটা মাইনে দিয়ে বড় বড় ওয়ার্কস্ ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার, বিলিতী ডিগ্রিওয়ালা ইনজিনিয়ার রাখা হয়েছিল। কিন্তু একদিন সেই সব ছেড়ে দিলুম, দেখলুম তাতে কারো উপকার করছি না, উপকার হচ্ছে কেবল নিজের, আর লোককে

দেখাচ্ছি যেন আমি দেশসেবা করছি—

নিমাই অত লেখাপড়া জানে না। সে ছোটবাবুর কথা কিছুই বুঝতে পারছিল না। বললে—একটু বুঝিয়ে বলুন ছোটবাবু, আপনারা লেখাপড়া-জানা লোক, আপনাদের কথা আমি বুঝবো কী করে?

লোকনাথ বোঝাবার চেষ্টা করে।

বলে—আচ্ছা, তুমি তো বলেছিলে তুমি তোমার বাড়িতে মুরগী পুষেছ—

—আজ্ঞে হ্যাঁ ছোটবাবু, এখনও চারটে বাচ্চা রয়েছে। একটু বড় হলেই কেটে খেয়ে ফেলবো।

লোকনাথ বললে—সেই মুরগীদের কিছু খেতে দাও না তুমি?

—হ্যাঁ ছোটবাবু, খেতে দিই। চালের খুদ, ডালের খুদ, তারপরে ভাত খাওয়ার পর এঁটোকাঁটা যা কিছু পড়ে থাকে সব তাদের খেতে দিই—

—তা, কেন তাদের খেতে দাও নিমাই? তুমি তো না খেতে দিলেও পারো। তাহলে কেন খেতে দাও?

—আজ্ঞে, একবার একটা পাঁঠাও পুষেছিলুম বাড়িতে। তাকে রোজ ছোলা খেতে দিতুম, কাঁঠালপাতা খেতে দিতুম, আম কাঁঠালের ভুতুড়ি খেতে দিতুম। খাইয়ে খাইয়ে তাকে খুব গায়ে-গতরে মোটা করলুম। তারপর সেই দশ টাকায় কেনা পাঁঠাটা দেড়শো টাকায় একটা কসাই-এর কাছে বিক্রি করে দিলুম। সে আবার সেইটে কেটে মাংস বিক্রি করে প্রচুর টাকা করলে—

লোকনাথ লাফিয়ে উঠলো।

বললে—নিমাই, তুমি তো তাহলে দেখছি জানো সব। আমি যা-কিছু শিখেছি বই পড়ে শিখেছি, তুমি তো বই না-পড়েই সব শিখে গেছ দেখছি। জানো নিমাই, আমি চৌরঙ্গীর একটা তেলেভাজার দোকানে যাই, সেখানে যাদুগোপাল বলে একজন

লোক আছে, সে-দোকানের মালিক। সেও লেখাপড়া শেখেনি। কিন্তু সে কিচ্ছু বোঝে না। জানো, সেদিন একটা মেয়েকে নিয়ে এসেছে আমার সামনে। তোমার সেই পাঁঠাটার মত নধর চেহারা তার। বয়েস বাইশ-তেইশের বেশি নয়, দেখে আমার মায়া হলো খুব। ভাবলাম একে এরা কাটবে! কিন্তু যাদুগোপাল নাছোড়বান্দা! সেই মেয়েটা, তার নাম বুঝি সরযু, সেও খুব নাছোড়বান্দা, বলে—একটা চাকরি করে দেন।

আমি বললুম—চাকরি করে দিলে তোমার সর্বনাশ হবে, চাকরি কোর না—

কিন্তু মেয়েটা বলতে লাগলো—কিন্তু চাকরি আমার চাই-ই, চাকরি না দিলে আমি, বাবা-মা-ভাই-বোন, আমরা সবাই উপোস করবো—দিন করে একটা চাকরি—

নিমাই কথাটা শুনেছিল, বললে—তারপর?

—তারপর আর কী, আমার এক বন্ধুকে চিঠি লিখে দিলুম চাকরির জন্যে।

—চাকরি হলো?

লোকনাথ বললে—তুমি যেমন পাঁঠাটা কসাই-এর দোকানে বিক্রি করে মোটা লাভ করলে, আমি তা করতে চাইনি নিমাই। বিশ্বাস করো নিমাই, আমি তা চাইনি—

—তারপর? তারপর কী হলো ছোটবাবু?

লোকনাথ বললে—এখনও কিছু খবর পাইনি, কিন্তু দেখবে, একদিন ওকে সবাই জবাই করে খাবে। তুমি যেমন এখন মুরগী পুষেছ বাড়িতে, তেমনি সেই সরযূকেও তারা পুষছে, তারপরে একদিন তুমি মুরগীগুলো জবাই করবে, সরযূকেও ওরা সবাই মিলে জবাই করবে, দেখে নিও—

নিমাই ছোটবাবুর কথাগুলো শুনেও কিছু বুঝতে পারে না।

লোকনাথ নিমাই-এর দিকে চেয়ে বুঝতে পারে সে কিছুই বোঝেনি। বলে—তোমার দোষ নেই নিমাই, পৃথিবীতে কেউ-ই

আমার কথা বোঝে না। আমার মা বাবা, আমাদের চাকর গিরিধারী, আমাদের ঝি কুসুম, আমার দিদিমা বসুমতী দেবী, আমার বন্ধু-বান্ধব কেউ আমার কথা বোঝে না, জানো নিমাই। সবাই মনে করে আমি পাগল হয়ে গেছি, পাগল হয়ে গিয়ে দাড়ি রেখেছি। আমাদের গাড়ি থাকতেও গাড়ি চড়ি না, আমার টাকা থাকতেও টেরিলিন-টেরিকট পরি না, আমি পাগল না তো পাগল কে, বলো না? জানো নিমাই, আমার সাব-অ্যাকাউন্‌টেণ্ট কেদার সরকার বলে একজন ছিল, সে এখন মস্ত লেবার-লীডার হয়েছে, এখন সে গাড়ি চড়ে, আর আমি পায়ে হেঁটে বেড়াই। আমাকে দেখে সবাই বলে, তারা সবাই নাকি সুস্থ, আর কেবল আমিই নাকি পাগল—

নিমাই বলে—আপনাকে যে পাগল বলে সে নিজে পাগল ছোটবাবু—

লোকনাথ বলে—আমি যে তোমাকে পঞ্চাশ -টাকা ধার দিয়েছি, তাই তুমি আমাকে পাগল বলছো না নিমাই। যাদুগোপালও আমাকে পাগল বলে না। কিন্তু জানো নিমাই, পৃথিবীর যারা বড় বড় লোক, আমরা তাদের কাছে মুরগী—

নিমাই হেসে উঠলো—মুরগী? বলছেন কী ছোটবাবু?

—হ্যাঁ নিমাই, ঠিক বলছি। হিরোশিমার নাম শুনেছ?

—হিরোশিমা? সেটা কী ছোটবাবু?

—হ্যাঁ, এই পৃথিবীর মধ্যেই একটা জায়গা আছে, তার নাম হিরোশিমা। সেখানে তারা অনেক মুরগী পুষেছিল। লক্ষ লক্ষ মুরগী পুষেছিল জবাই করে খাবার জন্যে। এই তুমি যেমন বাড়িতে মুরগী পুষেছ, ঠিক তেমনি। তোমার মত তারাও ঠিক সেই সব মুরগীদের খেতে-পরতে দিত, তাদের থাকবার জন্যে বাড়ি করে দিয়েছিল, তেষ্টা মেটাবার জন্যে জলের ট্যাঙ্ক করে দিয়েছিল, ঠিক যেমন করে তুমি ওদের মাটির গামলায় খাবার জল দাও……

—তারপর? তারপর?

—তারপর মুরগীগুলো যেই একটু বড় হয়েছে, যেই একটু মোটা-সোটা হয়েছে, আর নিজে নিজে খুঁটে খেয়ে গায়ে-গতরে বড় হয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে—

নিমাই শা'র কয়েকজন খদ্দের এসে গেল।

—দেখি দাদা, তিনটে কড়া-চা আর তিনটে নেড়ো বিস্কুট—

লোকনাথ উঠলো। বললে—তুমি চা দাও ওঁদের নিমাই, আমি পরে একদিন আবার আসবো—

বেলগাছিয়ার পুলের তলার এই দোকানটা একদিন লোকনাথই পঞ্চাশ টাকা ধার দিয়ে তৈরি করে দিয়েছিল। এখন নিমাই দাঁড়িয়ে গেছে। এই চায়ের দোকান থেকেই এখন সে পাড়ায় একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। সংসার পেতেছে। বাড়িতে মুরগী পুষেছে। পুষুক। জবাই করে খাবার জন্যে যাদের পোষা হচ্ছে, তাদের সাহায্য করে কী উপকারই বা সে করছে? একদিন তো সবাইকেই জবাই করবে ওরা!

লোকনাথ ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে আবার চলতে শুরু করলো।

তা সেদিন অফিস থেকে সকাল-সকাল ছাড়া পেয়ে সোজা লোকনাথদের বাড়ি গেলাম। বসুমতী দেবীকে আগেই আমার যাওয়া সম্বন্ধে টেলিফোন করে দিয়েছিলাম। কত বছর পরে লোকনাথদের বাড়ি যাচ্ছি। ছোটবেলাকার সমস্ত স্মৃতিগুলো মনে পড়ছিল। লোকনাথের জন্মদিনে আমাদের নেমন্তন্ন করা। বড়লোকের ছেলেকে সস্তা কলম উপহার দিয়ে লজ্জা পাওয়া। তারপর সেই সাজানো ড্রয়িং রুমটার চেহারার কথাও মনে পড়লো। আগাগোড়া খদ্দরের কাপড় দিয়ে যেন মোড়া। জানালা-দরজায় পাতলা খদ্দরের ছাপা পর্দা। আর পায়ের তলায় মেঝের ওপর রঙিন ফুল-পাতার নক্সা আঁকা কার্পেট।

কার্তিক রায় ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ই পেতেন না। সবকিছু সম্বন্ধে মাথা ঘামাতেন এই বসুমতী দেবী।

—এসো বাবা, এসো—

আগেও এই ড্রয়িং রুমে এসেছি। কিন্তু এবার এসে সমস্ত কিছু যেন হতশ্রী মনে হলো!

—কী খাবে বলো বাবা, অফিস থেকে আসছো, একটু মিষ্টি খাও, আর সরবৎ করে দিতে বলছি।

বললাম—আচ্ছা, সেই সব ছবিগুলো কোথায় গেল দিদিমা? রাজেন্দ্রপ্রসাদ, গান্ধীজী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। তারপরে লোকনাথের দাদামশাই-এর ছবি-টবি, সে-সব কোথায় গেল?

বসুমতী দেবী বললেন—কেন, তুমি কিছু জানো না? সে-সব ছবি তো খোকা ভেঙে ফেলেছে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে—

আমি শুনে অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—কেন, ছবিগুলো কী দোষ করলো?

বসুমতী দেবী বললেন—ওই বলে কে, বলো তো। তোমরাই বলো বাবা, যাদের ছবি টাঙানো ছিল তাঁরা কি কেউ খারাপ লোক? প্রাতঃস্মরণীয় লোক সব তাঁরা। আমাদের এই ঘরে তো তাঁরা সবাই-ই এসেছেন। ওই খোকা যখন ছ'মাস বয়েসের, তখন তাঁরা অনেকে ওকে কোলে তুলে আদর করেছেন। এইখানে তুমি যে চেয়ারে বসে আছো, ওইখানে মহাত্মাজী পা তুলে বসে তক্‌লি কেটেছেন, সে-দৃশ্য এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। সেই চরকা-কাটা ছবিটাও খোকা ভেঙে ফেললে—

বললাম—কেন, কী দোষ করেছিল ছবিগুলো?

—কী জানি বাবা! আমরা তো কিছুই জানতুম না, রাত্তির বেলা আমি আমার ঘরে ঘুমোচ্ছিলুম, মেঝের ওপর আমার ঝি কুসুমও ঘুমোচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ লাইব্রেরি-রুম্‌ থেকে দুম-দাম্‌ আওয়াজ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল—আমিও ছুটলাম, কুসুমও ছুটলো। দেখলুম, সরকারবাবুও দৌড়ে এসেছে। গিরি-

ধারীও এসেছে, বৈজুও এসেছে—তুমি গিরিধারীকে চিনতে তো?

বললাম—নাম শুনেছি লোকনাথের মুখে—

—হ্যাঁ, সরকার দরজা ঠেলতে লাগলো। দাদাবাবু দরজা খুলুন—দাদাবাবু দরজা খুলুন—

—তারপর?

বসুমতী দেবী বলতে লাগলেন—হ্যাঁ বাবা, তোমরা তো ছোট-বেলা থেকে খোকাকে দেখে আসছো, বরাবরই ও ওই রকম দল-ছাড়া। অন্য লোকে যা করবে, ওর বরাবর তা থেকে অন্য রকম কিছু করবার ঝোঁক। ছোটবেলাতেই জিজ্ঞেস করতো—আকাশে চাঁদ ওঠে কেন দিদিমা? ভোর বেলা আকাশে সূর্য ওঠে কেন? কেন মানুষের জন্ম হয়, কেন মানুষ মরে? বৈজুর সঙ্গে ওকে বেড়াতে পাঠাতাম। এই বৈজু তো আমার বাড়িতে ছোটবেলা থেকেই আছে, ও সব জানে। তোমরাও তো জানো বাবা কিছু-কিছু। কোশ্চেন করে করে টীচারদের একেবারে বিরক্ত করে মারতো—

আমিও সায় দিলাম। বললাম—সে তো আমরা সবই জানি। সেই জন্যেই আমরা ওর নাম দিয়েছিলাম বুদ্ধদেব—

বসুমতী দেবী বলতে লাগলেন—তা ভাবতুম, ছোটবেলাতে তো ও-রকম স্বভাব অনেকেরই থাকে, বড় হলে হয়ত সেরে যাবে। হয়ত সেরেও যেত। ওকে যখন কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর করে দিলুম তখন ভাবলুম, আস্তে আস্তে সব কিছু হয়ত স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে গিয়েও সেই একই ধরন, সেখানকার দরোয়ান হলো রামভজন, সেই রামভজনকে একদিন আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসেছে, বলে যে তার মাইনে বাড়িয়ে দেবে। তা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কি না নিজে মাইনে বাড়াবার জন্যে আমার কাছে তাকে নিয়ে এসেছে। আচ্ছা তুমিই বলো তো, আজকাল এমনিতে এক কথায় কারো মাইনে বাড়ানো যায়? ইউনিয়নের কত ঝামেলা আছে। ওমনি কারো মাইনে বাড়ালেই হলো? আমি

যখন জিজ্ঞেস করলুম, এত লোক থাকতে কেন ওর মাইনে বাড়াবো ? তখন বলে কী জানো ? বলে—হোটেলে গিয়ে একবেলা খেয়ে দু'জনে আশি টাকা খরচ করেছে, ও আর গভর্নমেণ্টের সেলস্‌ট্যাক্স অফিসার। আর রামভজনের এক মাসের মাইনে হলো আশি টাকা! বোঝ কথা! একজন পেটি দরোয়ানের সঙ্গে তোর তুলনা ? সে সত্তর টাকা পাক আর আশি টাকাই পাক, তা নিয়ে তোর মাথা ঘামাবার দরকারটা কী বাপু ? তুই সেলস্‌-ট্যাক্স, প্রোডাকশান, ইনকাম-ট্যাক্স, তারপরে ইমপোর্ট আর এক্সপোর্ট লাইসেন্স,—এই সব নিয়ে মাথা ঘামা। আজকাল তো জানো বাবা সে-যুগ আর নেই। যদ্দিন জহরলাল নেহরু ছিল, আমি নিজে দিল্লী গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি, এখন তাঁর মেয়ে সোস্যালিজম্‌ করবে বলে চ্যাঁচাচ্ছে, এখন কি বাংলাদেশের কথা ভাববার সময় আছে তার ? এখানে এত মারামারি কাটাকাটি এর জন্যে তো সেণ্টারই দায়ী বাবা, তা আমি যদি সেই কথাটা দিল্লীতে গিয়ে বলি যে, তোমাদের জন্যেই আজ দেশের এই অবস্থা, তো আমি হয়ে গেলাম ক্যাপিট্যালিস্ট—

বলতে বলতে বসুমতী দেবী হঠাৎ থেমে গেলেন।

বললেন—যাক গে, তোমাকে আর বেশিক্ষণ আটকাবো না, তুমি সেই সকাল বেলা অফিসে বেরিয়েছ, এখনও পর্যন্ত বাড়ি যেতে পারলে না। তা যে-কথা বলতে তোমাকে ডেকেছি, সেই কথাটা বলি। তুমি তো জানো, ও কেন ফ্যাক্টরি উঠিয়ে দিলে—

বললাম—না, তা তো জানি না। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, ও কিছু খুলে বলতে চায় না—

বসুমতী দেবী বললেন—তুমি হিরোশিমা সম্বন্ধে কোনও বই পড়েছ নাকি ?

আমি তো অবাক ? হিরোশিমা!

—হ্যাঁ বাবা, সে-ঘটনা আমার এখনও মনে আছে। এক-রাত্তিরের মধ্যে ঘটনাটা ঘটলো। যখন মাঝ-রাত্তিরে এই লাইব্রেরি-

রুমের ভেতর দুমদাম আওয়াজ হচ্ছে, আমি তো ভয়ে অস্থির। রাত্তিরে তো খোকার সঙ্গে বসে এক টেবিলে খেয়েছি। তখনও ও কিছুই বলেনি আমাকে। বরাবর খাবার পরে এক গ্লাস গরম দুধ খাওয়া খোকার অভ্যেস। সেদিনও গিরিধারী গিয়ে দুধের গেলাস টিপয়ের ওপর ঢাকা দিয়ে রেখে এসেছে। তারপর আমিও শুতে গিয়েছি। খাওয়ার পর খোকা বরাবর লাইব্রেরি-রুমে বসে বসে অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়ে। বই-পড়া খোকার ছোটবেলার স্বভাব। ও একটা বই হাতে নিয়ে পড়তে বসলো। চেয়ে দেখলাম একটা লাল রং-এর বই। বইটা সেদিনই অফিস থেকে বাড়ি ফেরবার সময় চৌরঙ্গী থেকে কিনে এনেছে। কিন্তু সেই বই-ই যে আমার এমন সর্বনাশ করবে তা কে জানতো!

আমি ঘুমোবার আগে কুসুম খানিকক্ষণ আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিলে। ভাবছিলাম খোকার বিয়ের কথা। একটা খুব ভালো পাত্রী দেখেছি বাবা, খোকার জন্যে—

—পাত্রী?

—হ্যাঁ, সেই পাত্রীর কথা বলতেই তো তোমাকে আজ ডেকেছি। মেয়েটি বড় লক্ষ্মী বাবা! যেমন দেখতে, তেমনি গুণ। অমন গান গাইতে আমি কাউকে শুনিনি। আমাদের পাল্‌টি ঘর। কিন্তু মুশকিল হয়েছে খোকাকে নিয়ে। ও মেয়ে দেখতেও চাইছে না, কিছুতেই ওর মত করাতে পারছি না। তা তুমি যদি বাবা ওর মত করাতে পারো—তুমি ওর পুরনো বন্ধু, কোনও রকমে ওর মত করাতে পারো না?

আমি কী বলবো বুঝতে পারলুম না। আমার তখন লোকনাথের বিয়ের ব্যাপারে অতটা মন নেই, যতটা লোকনাথের নিজের ব্যাপারে। যে-লোকনাথ অত বড় লিমিটেড কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, সে কী করে সেই কোম্পানি ভেঙে দিলে, সেই দিকেই তখন আমার কৌতূহলটা বেশি।

জিজ্ঞেস করলাম—লোকনাথ কোন্ বইটা চৌরঙ্গী থেকে কিনে

এনেছিল ?

বসুমতী দেবী বললেন—কী একটা ইংরিজী বই।

—ইংরিজী কী বই ?

বসুমতী দেবী সে-যুগে স্বামীর মৃত্যুর পরে নিজে কিছুদিন কোম্পানি চালিয়েছেন। বাড়িতে মেম-সাহেব রেখে ইংরিজী লিখতে পড়তে শিখেছিলেন—সে-সব আমরা জানতাম।

বললেন—লাল রং-এর মলাট, মাঝারি সাইজের বই। নামটা মনে পড়ছে না। সেই বইটা পড়ার পর থেকেই লোকনাথের মাথাটা যেন কেমন বিগড়ে গেল। লাইব্রেরি-রুমের দরজা ভেঙে যখন ঘরে ঢুকলুম, তখন দেখি সে এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড—

সত্যিই সে এক ভয়াবহ কাণ্ড বটে। সমস্ত ঘরময় ভাঙা কাচের টুকরো। দেয়ালের বড়-বড় ছবিগুলো মাটিতে আছড়ে ফেলে সব ভেঙেছে। বড় বড় ছবি সব। কোনওটাতে রাজেন্দ্র-প্রসাদ, কোনওটাতে স্বামী বিবেকানন্দ, স্যার পি সি রায়, নেতাজী, মতিলাল নেহরু, মহাত্মা গান্ধী। কার্তিক রায় দেশের বিদেশের সমস্ত মহাপুরুষদের ছবি তুলিয়ে ভালো দামী ফ্রেমে বাঁধিয়ে নিজের লাইব্রেরী-রুমে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। প্রত্যেকটার সোনালি ফ্রেম। এক-একটা ফ্রেম বাঁধাতেই চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল সে-যুগে।

সরকারবাবু তখন থর-থর করে কাঁপছে। কাঁপছে দাদাবাবুর চেহারা দেখে। সত্যিই, লোকনাথেরও তখন যেন অন্য রকম চেহারা। সেও ভীষণ কাঁপছে তখন।

বসুমতী দেবী বললেন—খোকা, খোকা, ওরে খোকা, অমন করছিল কেন ? কী হয়েছে তোর ?

লোকনাথের হাতে তখন একটা লোহার মস্ত রড, সেই রড দিয়ে সে ভাঙা ছবির ওপর মারছে আর মারছে। ছবিগুলো যেন জীবন্ত সাপ। যেন ভালো করে শক্ত হাতে তাদের না মারলে ছবিগুলো তাকে কামড়ে দেবে।

বসুমতী দেবী আবার চেঁচিয়ে উঠলেন—খোকা, এ-সব কী করছিস্? এ-সব ছবি ভাঙছিস্ কেন?

লোকনাথ বললে—বেশ করবো ভাঙবো, যত সব মিথ্যেবাদী ভণ্ডের দল, যত সব শয়তান, এতদিন এই শয়তান ভণ্ডদের মিছিমিছি দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে দিয়েছ তোমরা—

বসুমতী দেবী বললেন—কিন্তু ভেঙে কী হবে? কী করেছে ওরা?

—শয়তান, শয়তান সব। সবাই শয়তান, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান শয়তান, জার্মানীর হিট্‌লার শয়তান, চীনের চ্যাং-কাইশেক শয়তান। ইণ্ডিয়ার মহাত্মা গান্ধী শয়তান। পৃথিবীর সব মানুষ শয়তান—

বসুমতী দেবী আর থাকতে পারলেন না।

সোজা গিয়ে লোকনাথের হাতটা চেপে ধরলেন।

বললেন—কী সব আবোল-তাবোল বক্‌ছিস? রাত দুপুরে তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

—হ্যাঁ, আমার মাথাই খারাপ হয়ে গেছে দিদিমা। আর তোমাদের সকলের মাথা সব ঠিক আছে, কেবল আমার মাথাটাই খারাপ হয়েছে। তোমাদের কারোর মাথা নেই দিদিমা, তাই তা খারাপও হয় না। খারাপ হতো, যদি মাথা থাকতো। নইলে হিরোশিমাতে যে-কাণ্ড হলো, এর পর তো কই পৃথিবীর কোনও কোণে তো কেউ কিছু আপত্তি করলে না। কোটি কোটি লোক তো চুপ করে সব সহ্য করছে—

—খোকা, খোকা, ও-সব কী বলছিস তুই?

লোকনাথ আরো জোরে চিৎকার করে উঠলো—বেশ করছি বলছি, বলবো না? কই তোমার গান্ধীজী তো কিছু প্রতিবাদ করেনি। সেদিন তোমার নেহেরুজী তো কিছু আপত্তি করেনি তখন! কই তোমার স্বামী বিবেকানন্দ, তোমার যিশুখৃষ্ট, তোমার বুদ্ধদেব, তোমার রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবরা কত উপদেশ তো দিয়ে

গিয়েছিল। কত শিক্ষা দিয়েছিল। তোমরা সে-সব আমাকে শেখাবার জন্যে কত টাকা খরচ করেছ, কিন্তু সে-সব যে ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে দিদিমা!

বসুমতী দেবী বললেন—আমি তোর কথার এক বর্ণও বুঝতে পারছি না খোকা, তুই ও-ঘরে ঘুমোবি চল, পাগলামি করিসনি বাবা, আমার কথা শোন্—আয়—

বলে বসুমতী দেবী লোকনাথের হাত ধরে টানলেন।

লোকনাথের যেন সম্বিত ফিরে এল। হঠাৎ কান্না বেরিয়ে এল বুক ঠেলে। দিদিমার হাত দুটো ধরে বলে উঠলো—দিদিমা, আজকে আমার জন্যে আমার ফ্যাক্টরির দু'জন লোক বিনা অপরাধে খুন হয়ে গেল, কিন্তু শুধু আমি কেন, আমার মত আর একজন লোকের জন্যে আর একটা দেশের লক্ষ-লক্ষ লোকও বিনা-অপরাধে খুন হয়ে গেল। এ দু'এর মধ্যে কোনও তফাত নেই। তুমি একবার বইটা পড়লে না, মানুষ যে মানুষের কত বড় সর্বনাশ করতে পারে, তা তো তুমি একবার জানতেও পারলে না দিদিমা। পড়লে তুমিও আমার মত পাগল হয়ে যেতে দিদিমা, আমার মত তুমিও এই ছবিগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলতে! ওদের কারো ছবি ঘরে টাঙিয়ে রাখা উচিত নয় দিদিমা। ওরা সবাই মিথ্যেবাদী, ওরা সবাই শয়তান, আমাকে এতদিন ওরা সবাই কেবল মিথ্যে কথা শিখিয়ে এসেছে—

ততক্ষণে বসুমতী দেবী খোকাকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছেন।

গিরিধারীকে ডাক্তার ডাকতে বলে দিলেন। কিন্তু ডাক্তারবাবু আসার আগে পর্যন্ত লোকনাথের সে কী আকুল আর্তি!

—দিদিমা, লোকগুলোর ওপর বোমা ফেলে এমন করে হিরোশিমা গুঁড়ো করে দিলে, আর তোমরা কিছু বললে না? তোমার স্বামী বিবেকানন্দ কিছু বললে না, তোমার যিশুখৃষ্ট, তোমার মহাত্মা গান্ধী, ওরা সবাই চুপ করে থাকবে, আর আমি

ওদের ছবি ভেঙে ফেলবো না বলতে চাও ?

ডাক্তার এল। লোকনাথকে পরীক্ষা করলে।

মনে আছে তারপর কী একটা ইনজেক্‌সন দিতেই লোকনাথ কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো। তারপর সেই অসুখ থেকে যখন সে উঠলো, তখন থেকেই লোকনাথ একেবারে অন্য মানুষ। একেবারে অন্য চেহারা তার।

সেরে উঠেই দিদিমাকে দেখে বললে—আমি অফিস তুলে দেব দিদিমা—

—কেন ? কী হয়েছে অফিসে ? লেবার ট্রাবল্ হয়েছে ? কেদার সরকার মশাইকে একবার আমার কাছে ডেকে আনিস, আমি সব ঠিক করে দেব।

লোকনাথ বললে—না দিদিমা, লেবার-লীডার বলে কেদার সরকারকে আমরা অনেক টাকা দিয়েছি, এবার আর দেব না—

—কেন ? দিবি না কেন ?

—কেন দেব ? হিরোশিমায় যখন লক্ষ লক্ষ নির্দোষ মানুষকে ওরা অমন করে নিষ্ঠুর ভাবে খুন করতে পারলে, তখন কেদার সরকারকে এত টাকা দিয়ে কী লাভ ?

বসুমতী দেবী বললেন—হিরোশিমার সঙ্গে কেদার সরকারের কী সম্পর্ক ?

—সম্পর্ক আছে দিদিমা, কেদার সরকার শুধু দু'জন মানুষকে খুন করেছে কিন্তু সারা পৃথিবীর যত শয়তান সবাই ষড়যন্ত্র করেছে আমাদের বিরুদ্ধে!

বসুমতী দেবী বললেন—তোর মাথাটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে খোকা, তুই চুপ করে থাক্। অফিস বন্ধ করবো না আমি—

—কিন্তু আমি বন্ধ করে দেব দিদিমা। আমি কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আমার সমস্ত শেয়ার ওদের আমি বিনা পয়সায় দিয়ে দেব—

বসুমতী দেবী বিরক্ত হলেন।

বললেন—তোকে এত খরচ করে লেখাপড়া শিখিয়ে তো মহা মুশকিল হলো দেখছি! কোথায় হিরোশিমা, কোন্ দূর জাপানীদের দেশে অ্যাটম বোমা পড়লো, আর এখানে ইণ্ডিয়ায় বসে তুই মাথা খারাপ করছিস?

—দিদিমা, কেদার সরকার যাদের খুন করলে তারা গরীব লোক বলে তাদের কথা তুমি ভাবছো না, আর জাপানী বলে কি হিরোশিমার লোকরাও মানুষ নয়?

—আমি কি তাই বলেছি?

—নিশ্চয় বলেছ! আমাদের এই কলকাতায় তোমার-আমার মাথায় বোমা পড়লেই বুঝি তোমার টনক নড়তো দিদিমা!

বসুমতী দেবী বললেন—তা তোর শেয়ারগুলো দিয়ে দিলে কি সেই মরা মানুষগুলো আবার বেঁচে উঠবে?

—তুমি বুঝছো না দিদিমা, আজ না-হয় হিরোশিমাতে অ্যাটম বোমা পড়েছে, কাল যদি আবার তোমার এই কলকাতায় পড়ে?

—তা অফিস বন্ধ করলেই কি কলকাতায় বোমা পড়া বন্ধ হবে?

লোকনাথ বললে—জানো দিদিমা, তুমি যে-যুক্তি দিচ্ছ, এই যুক্তি ওরাও দেয়। ওরাও বলে অন্য লোক মরে মরুক, কিন্তু আমরা তো বেঁচে থাকবো। জাপানেরও তো সব লোক মরেনি, অনেক লোক তো বেঁচেও আছে। খাচ্ছে-দাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, সন্তানের জন্ম দিচ্ছে, ভুলেও গেছে কবে হিরোশিমাতে বোমা পড়ে ক' লক্ষ লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সবাই-ই যদি তাই করে, তাহলে পৃথিবীর এই নিরীহ নির্দোষ নিরাপরাধ মানুষদের কে বাঁচাবে—?

—তা তুই ছাড়া তাদের কি আর কেউ বাঁচাবার নেই ভেবেছিস্?

—আর কে আছে দিদিমা, বলো?

—কেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, রাশিয়ার প্রেসিডেণ্ট, চীনের

লোকনাথ জিজ্ঞেস করলে,—এটা কীসের হিসেব ?

—এটা স্যার মোস্ট্ কন্‌ফিডেনশিয়াল বুক। এইতে আমাদের দু'নম্বর অ্যাকাউন্টস্ লেখা থাকে। ওই যে দেখছেন দু'জন ছেলে, ওদের একজনের নাম চৌধুরী আর একজনের নাম হালদার, ওই দু'জনই কেবল এর খবর রাখে। ওরাই পোস্টিং করে এই খাতা। ওরা ছাড়া আর কেউ জানে না এর খবর—

লোকনাথ তবু বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—কীসের পোস্টিং ? খুলে বলুন সবটা।

এবার কেদার সরকার খুলেই বললে,—ব্ল্যাকের পোস্টিং—

—তার মানে ?

—মানে, গভর্নমেন্টের কাছ থেকে আমরা যে আইরনের কোটা পাই, তার সবটা তো কাজে লাগাই না, সেগুলো বাইরে বেশী দামে ব্ল্যাকে বেচে দিই—

চৌধুরী আর হালদার দু'জন ছেলে তখনও চুপ করে পেছনে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল।

লোকনাথ বললে—আমাদের কাজে লাগাবার জন্যেই আইরন দেয় গভর্নমেন্ট, তবু সেগুলো ব্ল্যাকে বেচেন কেন ?

—বেচি কারণ ব্ল্যাকে বেচলে আমাদের লাভ বেশি। তাতে কোম্পানির মালিকের আয়টা বাড়ে, আর ট্যাক্সটাও বেঁচে যায়—

—ট্যাক্স বাঁচে মানে ?

কেদার সরকার দাঁত বার করে হাসলো।

বললে—ট্যাক্স মানে স্যার, ইনকাম-ট্যাক্স। ওই ইনকাম-ট্যাক্স নিয়েই তো স্যার যত ঝামেলা আমাদের। ইনকাম-ট্যাক্সের ওপর আছে ওয়েলথ্-ট্যাক্স, আর তার ওপর আছে ডেথ্-ট্যাক্স। যার নাম এস্টেট্-ডিউটি। একদিকে ট্যাক্সের ঝামেলা, তার ওপর সেই ট্যাক্সের হিসেব রাখবার জন্যে আবার স্টাফ্ রাখতে হয়—

লোকনাথ খানিক চুপ করে রইল।

কেদার সরকার সেই সুযোগে বললে—আপনি হয়তো ভাবছেন

স্যার, কোম্পানির মালিকই শুধু এই বেনিফিট্‌টা পায়। না, তা নয় স্যার, মিসেস রায় সেদিকে খুব সিম্প্যাথেটিক স্যার, তাঁর মত কাইণ্ড-হার্টেড্ লেডী হয় না। এই চৌধুরী আর হালদারকে তিনি এই কাজের জন্যে এক্‌স্ট্রা দু'শো টাকা করে দেন—

—তাই নাকি ?

লোকনাথ ঘাড় ফিরিয়ে চৌধুরী আর হালদারের দিকে চেয়ে দেখলে। শিড়িঙ্গে চেহারার দু'জন ছেলে! গোবেচারার মত তার দিকে চেয়ে আছে। দেখেই মনে হলো ছেলে দু'টো যেন ভারি অভাবী। দু'জনের সঙ্গে কিছু কথা বলতে ইচ্ছে হলো লোকনাথের। কিন্তু কেদার সরকার বললে—ওরা ভেরি অনেস্ট স্যার, ওদের কেটে ফেললেও ওরা আসল ব্যাপার কাউকে ফাঁস করবে না—

লোকনাথ আবার ছেলে দুটোর দিকে দেখলে। তারপর আবার বলে উঠলো—তাই নাকি!

—হ্যাঁ স্যার, ও-রকম ভালো ছেলে স্যার এ-যুগে পাওয়া যায় না। ভেরি গুড্ বয়—

লোকনাথ আর বেশিক্ষণ বসলো না সেখানে। আর বসতে ভালোও লাগলো না তার। তাড়াতাড়ি উঠলো।

কেদার সরকারের কাজ তখনও শেষ হয়নি।

জিজ্ঞেস করলে—স্যার ব্যালেন্স শীট্‌টা দেখবেন না ?

—না, আজ থাক—

বলে তাড়াতাড়ি অফিস ছেড়ে বাইরের গাড়িখানাতে গিয়ে উঠলো। তারপর ইঞ্জিনটার শব্দ করে সেদিনকার মত বাড়ি চলে গেল।

পাঁচ

কিন্তু হঠাৎ সেদিন সেই দুর্ঘটনাটা ঘটলো। সেই ভীষণ দুর্ঘটনা। বিকেল পাঁচটা পর্যন্তও কেউ জানতো না। সন্ধ্যে ছটার সময়ও কেউ টের পায়নি।

চৌধুরী আর হালদার যেমন প্রতিদিন বেশি রাত পর্য্যন্ত অফিসে কাজ করে, তেমনি কাজ করেছে। তারপর সকাল-বেলার শিফ্‌টে যখন সবাই ফ্যাক্টরিতে এসেছে, দেখে অফিসের ভেতরে দু'জন ক্লার্ক—চৌধুরী আর হালদার তাদের কামরার মধ্যে মরে পড়ে আছে।

ঝাড়ুদার কামরার ভেতরে ঢুকে দু'জনের রক্তমাখা চেহারা দেখেই আঁতকে উঠেছে! তার চিৎকারে আশে-পাশের লোক-জন ছুটে এসে ঘরের ভেতরে ওই কাণ্ড দেখে হতবাক। কে এ কাণ্ড করলে! কেন এমন কাণ্ড করলে!

সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়লো মালিকের। মালিক মানে লোকনাথ। কার্ত্তিক রায়ের নাতি! সন্তোষ রায়ের ছেলে। অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্-এর নতুন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর লোকনাথ রায়।

নতুন ম্যানেজিং ডাইরেক্টরই বটে। সবে তখন লোকনাথ কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কাজের ভার নিয়েছে। খবরটা পেয়েই দৌড়ে এল। ততক্ষণ পাড়ার থানা থেকে পুলিশ কনস্টেবল্ এসে হাজির হয়েছে। ভিড়ে ভিড় জায়গাটা। সকলের ভিড় সরিয়ে ভেতরে ঢুকে যা দেখলে, তাতেই তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরোল না।

কয়েকজন তার সামনে এসে দাঁড়ালো কিছু একটা কথা বলবার জন্যে। তাদের মধ্যে কেদার সরকার সামনে আসতেই লোকনাথ তার দিকে চাইলে।

কেদার সরকার নিজে থেকেই বললে—কী করে যে কী

হলো স্যার, কিছুই বলতে পারছি না—অথচ আপনি তো জানেন স্যার, ওরা ছু'জনই আমাদের কোম্পানির কত বড় এ্যাসেট্

লোকনাথ কিছু উত্তর দিলে না। সোজা মুখ ঘুরিয়ে আবার যেমন এসেছিল, তেমনি বাইরে বেরিয়ে এসে সোজা নিজের গাড়িতে এসে উঠলো—

দূর থেকে সরযূ লোকনাথকে দেখে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই লোকনাথ গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বাইরে রাস্তায় গিয়ে পড়লো।

পাঁচ

সেদিন গাড়ি নিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গিয়েছিল লোকনাথ, তা কেউই জানতে পারেনি। ঘটনাটা সকাল বেলার, কিন্তু কোথায় যে সে খেলে, কোথায়ই বা সে কেমন করে দিনটা কাটালে, তার হিসেবও কেউ জানতে পারলে না।

ছুপুর বেলাটা আর কাটছিল না। বসুমতী দেবী ছট্‌ফট্ করছিলেন নিজের বাড়ির ভেতরে। তাঁর ফ্যাক্টরিতে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, অথচ কারোরই দেখা নেই। না লোক-নাথের, না কেদার সরকারের।

বারবার তিনি ফ্যাক্টরিতে টেলিফোন করেও কারো হদিস পেলেন না। তখন সেখানে পুলিশ আর খুনের আতঙ্ক! কে তাঁর কথার জবাব দেবে ভালো করে!

কিন্তু লোকনাথ নয়, বাড়িতে এসে হঠাৎ হাজির হলো কেদার সরকার।

কেদার সরকার তখন হাঁফাচ্ছে!

বললে—সব মিটমাট করতে একটু দেরি হয়ে গেল, মিসেস রায়।

বসুমতী দেবী বুঝতে পারলেন না কথাটা।

জিজ্ঞেস করলেন—কী মিটমাট হলো?

কেদার সরকার তখনও হাঁফাচ্ছে। বললে—দশ হাজার টাকার মতন খরচ হয়ে গেল—

—পুলিশ কী বললে?

—পুলিশ কী আর বলবে ম্যাডাম? তুনিয়াতে সবাই-ই তো আজকাল টাকার বশ। কিছু খেসারত দিতেই হয় এসব ব্যাপারে।

বসুমতী দেবী বললেন—তা তার জন্যে কিছু না। ও-সব আমি সব আপনার ঘাড়ে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি—

কেদার সরকার বললে—কিন্তু একটা কথা মিসেস রায়—

—কী বলুন?

—মিস্টার রায়কে কিন্তু এ-সব কথা কিছু বলবেন না। উনি এখনও তো ইয়াং, এখনও সেন্টিমেণ্ট নিয়েই চলেন—

বসুমতী দেবী বললেন—ব্যবসা করতে গেলে ও-সব সেন্টিমেণ্ট-এ কি চলে?

হঠাৎ দেখা গেল লোকনাথ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ সে সব শুনেছে।

তাকে দেখেই কেদার সরকার আর বসলো না। আস্তে আস্তে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে যেন বাঁচলো।

বসুমতী দেবী বললেন—খোকা, তুই কখন এলি?

লোকনাথ বললে—দিদিমা, তু'টো লোককে খুন করার জন্যে কত টাকার খেসারত তুমি দিলে?

—তার মানে?

—তার মানে তুমি জানো না? আমি দিল্লীর পুলিশকে খবর দিয়েছিলাম যে আমাদের কোম্পানি লোহার কোটা ব্ল্যাক করে। আর সেই জন্যেই তারা এখানে আসবার আগেই মিস্টার সরকার ওই তুজনকে খুন করার ষড়যন্ত্র করলে। কিন্তু এখন যদি আমি পুলিশকে জানিয়ে দিই, তখন কোথায় থাকবে তুমি আর কোথায়

থাকবে তোমার কোম্পানি ?

—খোকা !!

—আর আমাকে খোকা বলে ডেকো না দিদিমা, আমি আর তোমাদের কেউ নই, আমি তোমাদের এ কোম্পানিরও কেউ নই। আজ থেকে আমি এ-বাড়িরও কেউ নই। আমি চললুম—

—খোকা—খোকা—

লোকনাথ আর দাঁড়ালো না সেখানে। তর-তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে সোজা সে নিজের লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে।

আর সেই রাত্রেই সে চরম দুর্ঘটনাটা ঘটলো।

বললাম—তারপর ?

বসুমতী দেবী বললেন—তারপর তো তোমরা সব জানো বাবা। সেই শুরু হলো গণ্ডগোল। শুরু হলো টো-টো করে ঘুরে বেড়ানো। কোথায় যাদুগোপাল আর নিমাই শা। যত সব ছোটলোক নিয়ে কাণ্ড। তখন থেকেই দাড়ি রাখতে শুরু করলে। আর দাড়ি কামায় না, ময়লা পাঞ্জাবি আর ওই ঢিলে পাজামা, ছেঁড়া চপ্পল—

—আর সেই বইখানা ?

বসুমতী দেবী বললেন—সেই বইখানা আমি তুলে রেখে দিয়েছিলুম বাবা। লাল রং-এর মলাট—

বলে উঠে গিয়ে আলমারির চাবি খুলে একটা লাল রং-এর বই এনে আমার হাতে দিলেন। বইখানা উল্টেপাল্টে দেখলাম। হিরোশিমার ওপর যারা বোমা ফেলেছিল তাদেরই কাহিনী। তাদেরই লেখা গল্প। কেমন করে তারা বোমা ফেললে। সেই মেজর চার্লস ডবলিউ সুইনী। সুইনী জানতো না কী করতে হবে তাকে। শুধু জানতো কোথাও গিয়ে তাকে বোমা ফেলে আসতে হবে। অথচ কোথায় যে সে-বোমা ফেলে আসতে হবে তাও পর্যন্ত আগে থেকে জানানো নিয়ম নয়। আর সে-বোমা যে কী

বোমা তাও বলা হয়নি মেজর স্যুইনীকে।

ভোর তখন ছ'টা।

সমস্ত হিরোশিমা শহর আধ-ঘুমন্ত। কত ঘুম সেদিন কত মানুষকে শান্তি দিয়েছে, কত ক্লান্তি সেদিন কত মানুষকে নবজন্ম দিয়েছে। কত মানুষ সেদিন কত আশার সমুদ্রে নৌকো ভাসিয়ে বিছানায় শুতে গিয়েছে। আশা করেছে তারা পরের দিন ভোর বেলা আবার জেগে উঠবে আরো বৃহৎ স্বপ্ন নিয়ে, আরো মহৎ বিশ্বাস নিয়ে, আরো আনন্দের বিরাট আগ্রহ নিয়ে। তারাও সবাই মানুষ, তারাও আগের রাত্রে নিজের নিজের নীড়ে ফিরে এসেছে শুধু একটু বিশ্রাম নেবে বলে।

আর ঠিক সেই সময় তিনজন মানুষ তিনখানা প্লেন নিয়ে ঠিক হিরোশিমার মাথার ওপর এসে খানিক থমকে দাঁড়ালো।

ওস্তাদ পাইলট মেজর চার্লস ডবলিউ স্যুইনী! কোথাকার আমেরিকার কোন্ দেশের এক মানুষ, আর কোন্ এক দেশের মাথার ওপর উড়ে এল। সেই দেশের মাটির ওপর যে ছোট-ছোট স্বপ্ন আর বড় বড় বাড়িগুলো মাথা উঁচু করে ঘুমিয়ে ছিল, তাদের দিকে একবার চাইলে মেজর স্যুইনী।

অন্ধকার তখনও কাটেনি ভালো করে। কুয়াশারা তখন বোরখা দিয়ে শহরের মুখ ঢেকে রেখেছে। দেখো না কেউ, দেখো না আমাদের দিকে। আমরা শহীদ হতে চলেছি। আমরা প্রমাণ করে দেব যে, তোমাদের যিশুখৃষ্টকে একদিন যেমন করে তোমরা ক্রুশে বিঁধে মেরেছিলে, আজ আবার ঠিক তেমনি করেই দ্বিতীয়বার তোমরা তাঁকে হত্যা করলে। তোমরা তোমাদের স্কুল-কলেজে যা পড়িয়েছ, তোমরা নিজেরাই সেই বই-এর কথাগুলো নিজের হাতে আজ মুছে দিলে। তোমরাই বললে—জীবন-টীবন সব বাজে কথা। আমাদের খুশী-অখুশীর খোরাক ছাড়া আর কিছু নও তোমরা। খুশী হলে আমরা তোমাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারি, আবার খেয়াল-খুশী হলে তোমাদের জবাই করতেও পারি।

পাপ?

ও-সব কথা আমরা বাইবেলে ছাপিয়েছি, কোরাণে লিখেছি, গীতায় শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে বলিয়েছি। পাপের কথা মুখে উচ্চারণ কোরো না। পাপ-পুণ্য ন্যায়-অন্যায় ওসব আমাদের তৈরী শব্দ, আমরাই ও-সব কথা আবার আমাদেরই প্রয়োজনে আজ বাতিল করে দিলুম। আজকে তোমরা আমাদের জন্যে অ্যাটম-বোমার আঘাতে প্রাণ দাও। অ্যাটম-বোমায় মরলে কেমন দেখায়, তা আমরা পরখ করে দেখতে চাই। বহুদিন পরে যখন এই হিরোশিমার ইতিহাস লেখা হবে, তখন সেখানে লেখা থাকবে তোমরা শহীদ। লেখা থাকবে শান্তির জন্যে তোমরা প্রাণ দিয়েছ। শান্তির জন্যে যেমন ভিয়েৎনামের লোকেরা মরছে, শান্তির জন্যে বাঙলাদেশের লোকরা প্রাণ দিচ্ছে, ইতিহাসে লেখা থাকবে একদিন হিরোশিমাতে ঠিক তোমরাও শান্তির জন্যে তেমনি প্রাণ দিয়েছিলে।

আড়াই হাজার বছর আগে কপিলাবস্তু নামের একটা শহর থেকে আর একজন ছেলে ঠিক এমনি করে একদিন রাত্রের অন্ধকারের আড়ালে এক রাজপ্রাসাদ থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। সে-যাত্রা ছিল তার প্রাণ আবিষ্কারের যাত্রা। প্রাণের পদযাত্রা। তার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে অমৃতপথযাত্রী রূপে তৈরি করা। উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে দুঃখ-শোক-কষ্ট-বুভুক্ষা থেকে মুক্ত করা। আর আজ এতদিন পরে আমেরিকা থেকে উড়ে আসা আর একটা ছেলে মেজর চার্লস ডবলিউ সুইনীর উদ্দেশ্য হলো মানুষকে মৃত্যুর পথ দেখানো। মানুষকে বোঝানো যে, এতদিন যা কিছু শিখেছো সব ভুল শেখা। যা কিছু জেনেছো সব ভুল জানা। যিশুখ্রীষ্টকে যে আমরা ক্রুশে বিঁধে মেরেছি, সক্রেটিসকে যে আমরা হেমলক বিষ খাইয়ে মেরেছি, গান্ধীকে যে বুলেটের গুলিতে খুন করেছি, তাতে তাঁদের কোনও যন্ত্রণা হয়নি। তাতে তাঁরা যুগে-যুগে কোটি-কোটি মানুষের দৃষ্টিতে বরং শহীদই হয়ে গেছেন। যন্ত্রণা এক মিনিটের, খ্যাতি

চিরকালের। কিন্তু না, তা নয়, আমরা আগে যা ভুল করেছি, সে-ভুল এবার আর করবো না। আমরা তোমাদের শহীদও হতে দেব না। তোমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ক্ষেত-খামারের কাজ করবার সঙ্গে আমাদের রাত্রের ঘুমের বড় ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে। আমাদের বানানো কলোনীতে আমরা তোমাদের গচ্ছিত রেখেছি আমাদের আরাম-আয়েস সুনিশ্চিত করতে। তোমরা নিয়ম মেনে কাজ করলে আমার মটরের চাকা ঠিকমত চলে, তোমরা জলে-কাদায়-বৃষ্টিতে ভিজে পাট-চাষ করলে তবে আমাদের রাজকোষে ঠিকমত ফরেন এক্সচেঞ্জ আসে। বর্ষার দিনে তোমরা সারারাত জেগে ব্যাঙ তাড়ালে তবে আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি—

সেই কবে কপিলাবস্তু নগরের কোন্ এক রাজকুমার কী বলেছিল, তা আর আজ কারো মনে নেই। রাজা-রাজত্ব-রাজস্ব ত্যাগ করা দূরের কথা, কী করে নতুন-নতুন রাজ্য-রাজত্ব আর রাজস্ব পেতে পারি, তার কলাকৌশল আয়ত্ত করতেই আমরা ব্যস্ত-সমস্ত। আমরা এক হাজার টাকার বেসিক-পে'র চাকরি পেয়ে গেলে ভাবি আমরা বিশ্ব জয় করে ফেলেছি। সেই এক হাজার টাকার মূলধনটাকে টেরিলিন-টেরিকট-বাড়ি-গাড়িতে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে যাতে অন্য লোকের মনে সেটা চার হাজার টাকার অঙ্ক বলে ধারণা করানো যায়, তার চেষ্টাতেই আমরা অহরহ বিব্রত, সুতরাং কেন আমরা অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস-এর মত শাঁসালো ফ্যাক্টরি বন্ধ করতে যাবো?

মিস্টার সরকার সেদিন এল। লেবার লীডার কেদার সরকার। তিনিও বারবার বারণ করলেন। তিনিও বললেন, ফ্যাক্টরির শেয়ার কেন আপনি ওদের বিলিয়ে দেবেন?

লোকনাথ বললে—প্রায়শ্চিত্ত করতে—

—কীসের প্রায়শ্চিত্ত?

—হিরোশিমার প্রায়শ্চিত্ত। পৃথিবীর প্রথম অ্যাটম-বোমা ফেলে লক্ষ-লক্ষ মানুষ মারার প্রায়শ্চিত্ত একজন-না-একজন কাউকে

করতেই হবে মিস্টার সরকার। আজ পর্যন্ত সে প্রায়শ্চিত্ত কেউ করছে না। বরং আরো হাজারটা হিরোশিমা তৈরি করবার রাস্তা প্রস্তুত করছে সকলে।

কেদার সরকার ছুনিয়াতে অনেকদিন লেবার-লীডারি করছে। অনেক পাগল, অনেক শেয়ানা মালিক সে দেখেছে, কিন্তু এমন পাগল মানুষ আগে কখনও দেখেনি। কিন্তু মুখে সে-কথা সে বললে না। সব শুনে চুপ করে চলে গেল। কেদার সরকার বুঝলো এখান থেকে তার অন্ন উঠলো চিরকালের মত—

কিন্তু কেদার সরকারদের সুবিধে এই যে, পৃথিবীতে সব মালিকই লোকনাথ রায় নয়। সব রাজার ছেলেরাই সিদ্ধার্থ নয়।

চৌরঙ্গীর তেলে-ভাজার দোকানের ভিড় ততদিনে আরো বেড়েছে। তেলে-ভাজার শো-কেস করতে হয়েছে তখন যাছুগোপালকে। খদ্দেরদের বসবার আরামের বন্দোবস্ত করতে হয়েছে। একদিন যে যাছুগোপালের অবস্থা ফিরবে, তা লোকনাথ বহু আগেই বলে দিয়েছিল। আজ তার কথা বর্ণে বর্ণে ফলেছে।

আর কার অবস্থাই বা ফেরেনি।

ওই যে নিমাই শা। বেলগাছিয়ার পুল থেকে পূব দিকের রাস্তায় নামতেই বাঁ-হাতি দেয়ালের গায়ে যে দোকানটা ছিল নিমাই শার, সেটাই যে আবার অত বড় হবে তা-ই বা সেদিন কে ভাবতে পেরেছিল। মাত্র পঞ্চাশটা টাকা দিয়েছিল লোকনাথ! তারপর ছিল নিমাই শা'র ভাগ্য আর হাত-যশ।

কিন্তু কলকাতার রাস্তার ট্রামে-বাসে যারা হামেশা চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়, তারা তো সবাই-ই আর ছোটবাবুর মত পাগল নয়। আর পাগল নয় বলেই হয়ত এই ছুনিয়ায় একদল গাড়ি চড়ছে, আর একদল গাড়ির তলায় চাপা পড়ছে—

সাধারণতঃ কোম্পানি বন্ধ হলে খবরের কাগজে আর কর্মী-মহলে কান্নাকাটি পড়ে যায়। আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু প্রথমে সে-সব কিছুই হতে দিলে না কেদার সরকার। তাকে মোটা টাকা দিতে হলো। মোটা টাকা অবশ্য সকলকেই দিতে হলো। প্রথম-প্রথম হাতে অনেকগুলো টাকা পেয়ে সবাই খুশী।

কিন্তু কিছু লোক খুশী হলো না। তাঁরা বসুমতী দেবীর বাড়ির সামনে স্লোগান দিয়ে মিছিল করতে লাগলো। আর চেঁচাতে লাগলো—কোম্পানি বন্ধ করে কর্মীছাঁটাই চলবে না, চলবে না—

লোকনাথ একদিন বাড়িতে ছিল। খবর পেয়েই সামনে বেরিয়ে এল।

বললে—কী চাও তোমরা?

বসুমতী দেবী খোকাকে বারণ করতে যাচ্ছিলেন, বললেন—ওরে খোকা, ওদের সামনে যাস্‌নি, ওরা তোকে অপমান করবে—

একেবারে খোদ কর্তাকে সামনে এগিয়ে আসতে দেখে কিছু লোক একটু ঝিমিয়ে গেল। কিন্তু সামনের কর্তা-ব্যক্তিরা পার্টির লোক। তারা বললে—আপনি কোম্পানি তুলে দিলেন কেন?

লোকনাথ বললে—কারণ আমি আর টাকা উপায় করতে চাই না—

—এ-সব আপনার মিথ্যেকথা, আপনি আমাদের ছাঁটাই করে নতুন স্টাফ নিয়ে নাম বদলে নতুন কোম্পানি করতে চান।

—সকলে এই রকমই করে বটে, কিন্তু আমি তা করবো না। করলে তো আপনারা তা দেখতেই পাবেন।

—কিন্তু আসলে আপনার ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর এতগুলো লোক তো উপোস করতে চলেছে।

—সে-জন্যে তো আপনাদের ইউনিয়নের সেক্রেটারি যাকে যা টাকা দিতে বলেছিলেন, আমি তা দিয়ে দিয়েছি—। আপনাদের

সেক্রেটারি কেদার সরকারের কাছে যান আপনারা।

—না, তিনি আমাদের ইউনিয়নে আর নেই। আপনাকেই এর জবাব দিতে হবে, কারণ আপনিই এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

—ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলাম বটে, কিন্তু এখন আর তা নেই। আমি এখন একজন সাধারণ লোক। আমার ফিফটি-ওয়ান পার্সেন্ট শেয়ার সব আমি আপনাদের বিলিয়ে দিতে চাই—

—ও-কথা সব মালিকই বলে, বুর্জোয়াদের ওই-ই হলো একমাত্র বুলি।

—কিন্তু আমি এই বাড়িতে জন্মে কী এমন অপরাধ করেছি যে একজন সাধারণ লোকও হতে পারবো না?

—আপনাকে কোম্পানির কাজ চালু রাখতে হবে।

লোকনাথ বললে—চালু রাখার দায়িত্ব আপনাদের। আপনারা কোম্পানি চালু রাখুন—

হঠাৎ পেছন থেকে চিৎকার উঠলো—জুলুমবাজি চলবে না, জুলুমবাজি চলবে না—

বসুমতী দেবী এতক্ষণ বাড়ির ভেতরে ছিলেন, এবার তিনি ভয় পেয়ে বেরিয়ে এলেন। সমস্ত মিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন—থামো তোমরা, থামো, যা বলবার আমাকে বলো—

সামনের কর্তাদের মধ্যে একজন বলে উঠলো—আমাদের দাবি আপনাদের মানতে হবে—

—কিন্তু তোমাদেব দাবিটা কী সেটা তো আগে আমাদের জানাতে হবে। সেইটে আগে আমাকে জানাও, তবে তো তার মীমাংসা হবে! সেই দাবিটা তোমাদের কী?

একজন কর্তা-ব্যক্তি একটা কাগজ নিয়ে এসে বসুমতী দেবীর দিকে বাড়িয়ে ধরলে। সেটা হাতে নিয়ে বসুমতী দেবী বললেন—আমি এটা পড়ে কালকের মধ্যেই জানাবো। তোমরা কাল বিকেল চারটের মধ্যেই এর জবাব পাবে।

মিছিলের লোকরা আস্তে আস্তে স্লোগান দিতে দিতে চলে গেল। কিন্তু বসুমতী দেবী আর দেরি করলেন না, সেইদিনই বৈজুকে দিয়ে সাব্-অ্যাকাউন্ট্যান্ট্ কেদার সরকারকে ডেকে পাঠালেন। কেদার সরকার যখন লোকনাথদের বাড়িতে এল, তখন সন্ধ্যে শেষ হয়ে রাত পড়েছে। দু'জনে দরজা বন্ধ ঘরে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন। তারপর কেদার সরকার যখন ঘর থেকে বেরোল, তখন ঘড়িতে রাত ন'টা বেজে গেছে। তারপর সেই যে সব চুপ হয়ে গেল, তখন থেকে আর কোথাও গণ্ডগোল নেই, কোনও মিছিল নেই, কোনও আন্দোলন নেই কর্মীদের।

বললাম—কী করে মিটিয়ে দিলেন আপনি?

বসুমতী দেবী বললেন—আমি লিখে দিলাম যে, আমাদের যত শেয়ার আছে সব ওয়ার্কারদের দিয়ে দিলাম—

তারপর থেমে বললেন—তা এ-সব তো অনেক আগেকার কথা বাবা। তোমাকে যে জন্যে ডেকেছি এখন সেই কথাই বলি। তোমার কথা হয়ত খোকা শুনতে পারে। তুমি ওকে এবার বিয়ে করতে বলো। খোকার এই এত প্রপাটি, আমি চলে গেলে এসব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে বাবা, সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। এমনিতেই তো সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। এর ওপর যদি আমি চলে যাই তো তখন এই বাড়ির ইঁট-কাঠও আর একখানাও বাকি থাকবে না। এও বোধ হয় সবাইকে বিলিয়ে দেবে! তার আগেই আমি ওকে সংসারী করে দিয়ে যেতে চাই—

—কিন্তু পাত্রী দেখতে কেমন?

বসুমতী দেবী বললেন—আমার একমাত্র নাতবৌ আমার বাড়িতে আসবে, আর তুমি কি মনে করো তাকে আমি পছন্দ না-করেই ঘরে আনবো? রায়-বাড়ির নাতবৌ করে কি আমি যাকে-তাকে আনতে পারি? আমার আক্কেল বলে কিছু নেই?

তারপর হঠাৎ যেন একটা কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। বললেন—যে-মেয়েটার সঙ্গে আজকাল খোকা মিশছে, তাকে তো

তুমি দেখেছ বাবা। তাকে কি আমি নাত-বৌ করতে পারি? তুমিই বলো?

—কোন্ মেয়ের সঙ্গে মেশে লোকনাথ? আমি তো কাউকে দেখিনি! মেয়ের সঙ্গে মিশছে?

বসুমতী দেবী অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—কেন, তুমি দেখনি মেয়েটাকে?

বললাম—কই, দেখার কথা ছেড়ে দিন, আমি তো শুনিওনি কিছু। লোকনাথের আর কোনও বদনাম থাক, মেয়েদের সঙ্গে মেশবার বদনাম তো ওর চরম শত্রুতেও দিতে পারবে না!

—কিন্তু বাবা, আমি যে নিজের চোখে দেখেছি। তোমার বোধহয় অনেকদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়নি।

বললাম—না, তা হয়নি, তবে লোকনাথ যে শেষ পর্যন্ত মেয়েদের পাল্লায় পড়বে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

—হ্যাঁ বাবা, আমরা যা সেকালে কল্পনাও করতে পারতুম না, আজকাল সংসারে তাও ঘটছে! নইলে ভাবতে পারো, আমার খোকা যে কখনও কোনও কালে একলা-একলা রাস্তায় বেরোত না, বরাবর গাড়িতে করে চলাফেরা করতো, কোনও বাজে-ছেলের সঙ্গে মিশতো না পর্যন্ত, সেই তার মতন ছেলে কিনা আজ কোথায় তেলে-ভাজার দোকানে বসে তেলেভাজা খায়, কোথায় কার চায়ের দোকানে ভাঁড়ে করে চা খায়, আর শুনলাম, একজন বললে, কোন্ বাজারের রাস্তার মোড়ে ইঁট পেতে বসে চুল ছাঁটছে। আর চেহারাখানা তো ওর দেখেছোই, ওই একমুখ দাড়ি, ছেঁড়া চটি, ময়লা-ঢোল্লা পাঞ্জাবি—

বললাম—ঠিক আছে দিদিমা, আমি ওর সঙ্গে দেখা করে সব বলবো—কিন্তু সমস্যা হলো, কখন ওর দেখা পাবো? বাড়িতে কখন থাকে ও?

বসুমতী দেবী বললেন,—বাড়িতে ওর থাকার কোনও ঠিক নেই বাবা, তুমি বাইরে কোথাও ওর সঙ্গে দেখা করতে পারো না?

—বাইরে কোথায় পাই ওকে? সেই তেলেভাজার দোকানে? প্যারাগন সিনেমার পিছনে?

—সে তো যাদুগোপালের দোকান। সেখানেও যেতে পারো, কিম্বা বেলগাছিয়ার পুলের তলায় আছে নিমাই শা' বলে একজনের দোকান, সেখানেও দেখতে পারো। খিদিরপুরে মনসাতলা লেন-এও একটা মেসের আড্ডা আছে ওর, আজকাল আবার আর একটা নতুন আড্ডা হয়েছে ওর শুনেছি—

—কোথায়?

বসুমতী দেবী বললেন—বরানগরে!

—বরানগরে কে আছে আবার? সেখানে আবার কিসের দোকান?

—দোকান নয়, শুনেছি একজনদের বাড়ি। সেখানেও নাকি একটা মেয়ে আছে।

—মেয়ে?

বসুমতী দেবী বললেন—এই জন্যেই তো আমার ভয় বাবা। এই বয়েসটাই যে খারাপ। এই বয়েসে কত মেয়েছেলে পেছনে লাগে। আর সারাদিন টো-টো করে ঘুরে বেড়ায়, কখন যে কী হয় কেউ বলতে পারে না। আজকাল খুনোখুনির মধ্যে এ-রকম টো-টো করে ঘোরা কি ভালো বাবা? তুমিই বলো। তা এও আমার কপাল, আমি আর কী করবো?

জিজ্ঞেস করলাম—কখন যায় সেখানে?

বসুমতী দেবী বললেন—তা জানা শিবেরও অসাধ্যি—। এ-সব আমার বৈজু খুঁজে খুঁজে বার করেছে—

আমি উঠলাম। বললাম—ঠিক আছে, সে আমি যেমন করে হোক খুঁজে নেব!

বলে বাড়ির বাইরে চলে এলাম।

ক্রমে ভোর সাড়ে ছ'টা বাজলো। চারদিকে সূর্যের আলো আরো ঝাপসা হয়ে এলো। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে গেলে চারদিকটা আরো স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া চাই। দেখতে পাওয়া চাই যাদের জবাই করতে যাচ্ছি, তারা ঠিক জবাই হলো কী না। মাটি থেকে কত উঁচুতে উঠেছে মেজর চার্লস ডবলিউ সুইনী! আরো এগিয়ে চলো মেজর, আরো একটু এগিয়ে চলো—

—ও আলোওয়ালা, আলোওয়ালা!

মিউনিসিপ্যালিটির একজন লোক কাঁধে মই নিয়ে এসে একটা গ্যাস-পোস্টের মাথায় উঠে দেশলাই দিয়ে বাতিটা জ্বালতেই আলোয় আলো হয়ে গেল জায়গাটা। আর সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটা একতলা বাড়ির জানলা থেকে কে একজন মেয়েলি গলায় চেঁচিয়ে উঠলো—আলোওয়ালা, ও আলোওয়ালা—

আলোওয়ালাটা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে কত মাইনে পায় কে জানে! ময়লা ছেঁড়া শার্ট গায়ে; খাটো একটা ধুতি। প্রতিদিন বিকেলবেলা রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বালিয়ে দেওয়াই তার চাকরি।

লোকনাথ আগে কখনও এ-সময়ে আসেনি এদিকে। বড় নিরিবিলি পাড়া এটা। একেবারে সোজা বেরিয়েছে সেই আমেরিকার একটা বেস থেকে। ভোরবেলাই ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়ে গেছে মেজর সুইনীর। তারপর কাঁধে ঝোলা নিয়ে চলেছে আকাশের অলি-গলি দিয়ে। চারদিকে নিস্তব্ধ, নিথর। অনেক দায়িত্ব তার মাথায়। সমস্ত কলকাতা পরিক্রমা করতে হবে তাকে। যেখানে যাবার হুকুম হয়েছে, সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই হবে তাড়াতাড়ি। আর দেরি করা চলবে না। যেখানে যত সুখী মানুষ, তাদের খুঁজে বার করো। জিজ্ঞেস করো, সুখ পাবার

অধিকার নেই জেনেও তারা সুখে থাকে কোন্ অধিকারে ? আমাদের তো হুকুম দেওয়া আছে। স্ট্যাণ্ডিং হুকুম। কেউ সুখে থাকতে পারবে না পৃথিবীতে। অন্ততঃ আমরা যতদিন আছি, ততদিন কারো সুখ ভোগ করবার অধিকার নেই। তোমাকে বলতে হবে তুমি কোন্ পার্টির লোক, ডেমোক্রাট না রিপাবলিকান, লেবার না কনজারভেটিভ! শুধু মানুষ হলে তোমার কোনও আইডেন্‌টিটি নেই।

সে বলেছিল—আমি সৎ লোক—

ওরা বলেছিল—সেটা তো তোমার আইডেন্‌টিটি নয়, তোমার মত ও-রকম সবাই বলবে তারাও সৎ লোক—

—কিন্তু আমি তো কোনও অন্যায় করিনি। কারোর কোনও ক্ষতি করিনি—

—ওটাও বড় কথা নয়, কেউ-ই কারো ক্ষতি করে না কোনও দিন, কারণ কারো ক্ষতি করবার দরকার হয় না—

—কিন্তু আমি যে সাধারণ মানুষ, এটাই কি আমার বড় পরিচয় নয় ?

—না।

—তাহলে আমি কী করবো ?

—তোমাকে একটা-না-একটা পার্টিতে যোগ দিতে হবে! হয় রিপাবলিকান, নয়তো ডেমোক্র্যাট্, হয় লিবারেল, আর নয় তো কনজারভেটিভ্—

মেজর সুইনী যখন বেস থেকে বেরিয়েছিল, তখন ওই একটা হুকুমের কথাই শুধু মনে ছিল তার। কিন্তু জীবনকে কি শুধু জীবনের আইন দিয়ে আর বিচার করা চলবে না ? তবে কেন যিশুখ্রীষ্ট প্রাণ দিয়েছিলেন ক্রুশে, কেন সক্রেটিস প্রাণ দিয়েছিলেন বিষ খেয়ে? কেন এত মানুষ এতকাল ধরে মনুষ্যত্বের ধ্যান করে এসেছে আর পুজো করেছে মনুষ্যত্বের ? কেন পৃথিবীর কবি বার-বার বলেছেন—সবার উপরে মানুষ সত্য ?

—ও আলোওয়ালা, আলোওয়ালা!

বেহারের কোন্ এক জেলা, ছাপরা না বারাউনি কে জানে, সেইখান থেকে একদিন এসেছিল কালিকাপ্রসাদ। কালিকাপ্রসাদ ঝা। এসে চাকরি নিয়েছিল সুবার্বন্ মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে। কাজও ছিল কম, মাইনেটা ছিল আরো কম। কাজ ছিল তার সন্ধ্যেবেলা আলোগুলো এক-এক করে জ্বালিয়ে দেওয়া।

সেদিনও সন্ধ্যেবেলা কালিকাপ্রসাদ মইটা নিয়ে এসে সিধু ওস্তাগর লেনের ভেতরে একটা ল্যাম্প-পোস্টের কাছে থমকে দাঁড়ালো। তারপর ল্যাম্প-পোস্টের মাথায় আলোর বাক্সটা খুলে দেশলাই কাঠি ধরালো। ধরাতেই অন্ধকার গলিটার চারদিক আলো হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়ির জানলা থেকে কে একজন ডেকে উঠলো—আলোওয়ালা—ও আলোওয়ালা—

কালিকাপ্রসাদ মইটা নিয়ে চলে যেতে গিয়েও একটু থমকে দাঁড়ালো। তারপর জানলাটার কাছে গিয়ে বললে—দিদিমণি, আমি আলোওয়ালা—

—আজ তোমার এত দেরি হলো কেন আলোওয়ালা?

—দেরি! কই, দেরি তো হয়নি দিদিমণি!

মেয়েটা বললে—বা রে, আমি দেখতে পাই না বলে তুমি কি ভেবেছ আমি টের পাই না কিছু?

কালিকাপ্রসাদ সামনে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার গালে একটা টোকা দিয়ে বললে—দিদিমণি, আমার ওপর রাগ করেছো দেখছি—

—তাহলে বলো কাল সকাল-সকাল আসবে—

—বা রে, সন্ধ্যে হবার আগে যে আলো জ্বালবার নিয়ম নেই আমার।

—কিন্তু আমি যে সেই বিকেল থেকে তোমার জন্যে জানলায় বসে থাকি—

কালিকাপ্রসাদ আবার মেয়েটার গাল টিপে দিয়ে বললে—

আচ্ছা, এবার থেকে আমি আরো সকাল-সকাল আসবো, আর রাগ করবে না তো ?

মেয়েটার মুখ আরো ফুলে ওঠে। বলে—তা তুমি দেরি করে এলে আমার রাগ হবে না ? দেরি করলে আপিসে তোমাকে বকে না ?

কালিকাপ্রসাদ বলে—আপিসে কেউ বকে না, তুমি বকো বলেই আমি ভয়ে ভয়ে সকাল-সকাল আসতে চেষ্টা করি—

—আমাকে বুঝি তুমি খুব ভয় করো, আলোওয়ালা ?

—খুব, খুব ভয় করি—

—আর আমাকে ভালোবাসো না ?

—নিশ্চয়, ভালোও খুব বাসি—

—ভালোবাসো ?

—হ্যাঁ, খুব—

—আমাকে তুমি ছাড়া আর কেউ ভালবাসে না আলো-ওয়ালা—

—কেন, তোমার মা ভালোবাসে না ? তোমার বাবা ?

—না।

—কেন ভালবাসে না ?

মেয়েটি বললে—বারে, আমি যে চোখে দেখতে পাই না, যে চোখে দেখতে পায় না, তাকে কি কেউ ভালোবাসে নাকি ? তুমি বড্‌ডো বোকা, কিছ্‌ছু বোঝ না।

ওদিকে কালিকাপ্রসাদের তখন দেরি হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত গলিটায় আরো অনেক বাতি জ্বালাতে হবে তাকে।

বললে—আমি এবার আসি দিদিমণি—আরো অনেক আলো জ্বালাতে হবে—

মেয়েটা বললে—কাল কিন্তু আরো তাড়াতাড়ি আসা চাই, তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করে বসে থাকবো—

কালিকাপ্রসাদ মইটা কাঁধে তুলে নিলে। তারপর আর

একবার মেয়েটার গালটা টিপে দিয়ে বললে—আসি দিদিমণি—

এমনি রোজ। সিধু ওস্তাগর লেনে সন্ধ্যেবেলা রোজই এই নাটকের অভিনয় হয়। রোজই মেয়েটা ডাকে—আলোওয়ালা, ও আলোওয়ালা—

আর রোজই কালিকাপ্রসাদ এসে দিদিমণির গাল টিপে দিয়ে বলে—আমি এসেছি দিদিমণি—

এমনি করেই এই কলকাতার এক শহরতলিতে এক বিচিত্র নাটক চলছিল। এমন সময় মেজর চার্লস ডবলিউ সুইনীর ওপর হুকুম হলো ভোরবেলা প্লেন নিয়ে সোজা হিরোশিমা যেতে—

কিন্তু অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্-এর কার্তিক রায় কিম্বা জামাই সন্তোষ রায়, কিম্বা বসুমতী দেবী কেউই কি কোনও দিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পেরেছিলেন যে, এই পৃথিবীতে আলো জ্বালাবার ভার পড়বে তাঁদেরই একজন বংশধরের ওপর!

লোকনাথ নিজেও তো কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি যে একদিন সারা কলকাতা হাঁটতে হাঁটতে সোজা এসে পৌঁছোবে একেবারে এই হিরোশিমার মাথার ওপর। তখনও অন্ধকার তত স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। চিৎপুর ইয়ার্ডের মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে উত্তর দিকে পড়লেই খানিক দূরে বাঁদিকে একটা রাস্তা। চলো, বাঁ দিকেই চলো। যখন সব পথই তার কাছে খোলা, তখন বাঁ-দিকে ডান-দিকে যে-কোনও দিকে গেলেই হলো। কারণ আকাশের তো আর বাঁ-দিক ডান-দিক নেই। সামনে-পেছনে নেই।

একটা মোড়ের মাথার কাছে আসতেই দেখলে একদিকে লেখা আছে সিধু ওস্তাগর লেন। সিধু ওস্তাগর! নামটা ভালোই মনে হলো। অন্ততঃ গতানুগতিক নয়। সিধু ওস্তাগর কে ছিলেন, কেনই বা তাঁর নামে রাস্তা হলো, তা জানবার আর কোনও উপায়ই নেই। পাশের বাড়ি থেকে উনুনের ধোঁয়া আসছে, তার পাশেই একটা নোনা-ধরা ইঁটের খাটা পায়খানা। নোংরা? তা হোক! লোকনাথকে যেমন চৌরঙ্গীতে যাদুগোপালের তেলে-

ভাজার দোকানে যেতে হবে, তেমনি বেলগাছিয়ার নিমাই শার দোকানেও যেতে হবে। তেমনি খিদিরপুরের মনসাতলা লেনেও যেতে হবে। আবার তেমনি বরানগরের সিধু ওস্তাগর লেনেও যেতে হবে। হিরোশিমা কি এখানে ?

—আলোওয়ালা, ও আলোওয়ালা।

লোকনাথ আওয়াজটা শুনেই দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখলে একটা লোক বাঁশের মই কাঁধে করে নিয়ে এসে একটা ল্যাম্প-পোস্টের মাথায় উঠে বাক্সটা খুলে আলো জ্বেলে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গে পাশের একতলা বাড়ির জানলা থেকে একটা ছোট পাঁচ-কি ছ' বছরের ফ্রক-পরা মেয়ে ডেকে উঠলো—আলোওয়ালা, ও আলোওয়ালা—

মেয়েটা বললে—তুমি এত দেরি করে এলে কেন আলো-ওয়ালা—

আলোওয়ালা মইটা কাঁধে নিয়ে মেয়েটার কাছে এগিয়ে গেল। আস্তে আস্তে জানলার ভেতরে হাত গলিয়ে মেয়েটার গাল টিপে দিলে। বললে—তুমি আমার ওপর রাগ করেছে দিদিমণি—

—রাগ করবো না ? তুমি আজকে দেরি করে এলে কেন ?

আলোওয়ালা বললে—তুমি কী করে বোঝ দিদিমণি যে, আমি দেরি করে এসেছি ? তুমি ঘড়ির শব্দ শোন বুঝি ?

মেয়েটি বললে—বা রে, তুমি আলো না-জ্বালালে যে সব অন্ধকার লাগে আমার কাছে, আমি দেখতে পাই না বলে তুমি ভেবেছ আমি কিছু বুঝতেও পারি না ?

আলোওয়ালা হেসে উঠলো। হেসে মেয়েটার গালটা টিপে দিলে। বললে—আমি চলি আজ দিদিমণি—

মেয়েটা বললে—আর একটু দাঁড়াও না আলোওয়ালা, আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটু গল্প করো না—

—না দিদিমণি, আরো অনেক লোক যে অন্ধকারে রয়েছে,

তাদের জন্যে আলো জ্বালাতে হবে যে—

—আচ্ছা, তাহলে তুমি যাও আলোওয়ালা—আমি তোমাকে আটকে রাখবো না,—তুমি যাও, কালকে একটু তাড়াতাড়ি এসো—

আলোওয়ালা মইটা কাঁধে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। লোকনাথ লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বললে—শোন ভাই,—

কালিকাপ্রসাদ বললে—আমাকে বলছেন বাবুজী ?

লোকনাথ জিজ্ঞেস করলে—ওই মেয়েটি কে ভাই ? তোমার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিল, আমি শুনছিলুম—

—ও, ওই ছোট্ট মেয়েটা বাবুজী ? অন্ধ কিনা, চোখে কিছু দেখতে পায় না। কিন্তু আলো জ্বাললেই বুঝতে পারে। রোজ আমি এই সময়ে আলো জ্বালাতে আসি, আর ও জানলার ধারে আমার জন্যে বসে থাকে। আমি আলো জ্বাললেই ও ঠিক বুঝতে পারবে, আমাকে আলোওয়ালা বলে ডাকবে—এই আলো-ওয়ালা, আলোওয়ালা—আমার আসল নাম ও জানে না, তাই আলোওয়ালা বলে ডাকে—

লোকনাথের খুব ভালো লাগলো লোকটাকে। চলতে চলতে আলোওয়ালার খবর নিতে লাগলো। কত মাইনে পায় সে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে। ক'বছরের চাকরি, কোথায় দেশ, কী নাম। কালিকাপ্রসাদ একটা করে ল্যাম্প-পোস্টে গিয়ে উঠে আলো জ্বেলে দেয় আর মইটা তুলে নিয়ে আর একটা ল্যাম্প-পোস্টে গিয়ে সেটা লাগায়। মাঝখানে যেতে যেতে লোকনাথের সঙ্গে নানা গল্প করে। কালিকাপ্রসাদ ছাপরা জেলা থেকে এসে এতদিন এই আলো জ্বালাচ্ছে, এমন করে কেউ আগে তাকে এত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেনি। কেউ এমন করে তার সঙ্গে কথাও বলেনি।

এবার কালিকাপ্রসাদের পালা। জিজ্ঞেস করলে—আপনার দেশ কোথায় বাবুজী ?

—দেশ? দেশ তো কলকাতায়।

—কী করেন? নোক্‌রি?

লোকনাথ বললে—না, নোক্‌রি করি না—

—তাহলে দেশে ক্ষেতি-জমিন্‌ আছে বুঝি?

—না।

—তাহলে?

লোকে নোকরি না করে, ক্ষেতি-জমিন না করে কী করে পেট চালায়, তা কালিকাপ্রসাদের মাথায় আসে না। সে কেবল একটা কাজই জানে, একটা কাজই সে মন দিয়ে শিখেছে! তা হলো আলো জ্বালানো, আর অন্ধকার দূর করা। সন্ধ্যে হবার আগেই সে তার বস্তি-বাড়ি থেকে বেরোয় মইটা কাঁধে নিয়ে। দফ্‌তর থেকে দেশলাই নিয়ে হিসেব করে খরচ করে। হিসেব করে খরচ না করলে যদি আলো না জ্বলে? যদি অন্ধকার দূর না হয়? যদি বকুল আলো না দেখতে পায়?

বকুল সারাদিন ওই সন্ধ্যেটুকুর জন্যে হাঁ করে বসে থাকে। যাদুগোপাল যেমন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই হাঁ করে বসে থাকে খদ্দেরের জন্যে, নিমাই শা'ও রাত চারটের সময় ঘুম থেকে উঠেই দোকানের ঝাঁপ খুলে উনুনে আগুন দেয়।

আসলে সবারই প্রতীক্ষা!

সবাই প্রতীক্ষা করে থাকে শেষ দেখবার জন্যে। আজকের খদ্দের তো এল, কিন্তু কাল? আজকের হিসেব-নিকেশ তো ভালোই হলো। আয়ের ঘরে অঙ্কের ডিভিডেণ্ড ভালোই জমা পড়লো। কিন্তু কাল? আজকে তো এই বোমা তৈরি হচ্ছে। এতদিনকার সমস্ত মানুষের সমস্ত অধ্যবসায়ের, সমস্ত গবেষণার অবসান হয়েছে। তিনটে জাহাজ যাবে, তিনটে উড়ো জাহাজ! একটা যদি ব্যর্থ হয় তো অন্যটা, আর সেটাও যদি বোমা ফেলতে না পারে, তো বাকি প্লেনটা। বি-৯১। কিন্তু তা তো হলো, কাল কী হবে? কাল সকালে ১৯৪৫-এর ৫ই আগস্ট। মাসের প্রথম রবিবার!

আলোওয়ালা আসবে তো ?

না, তা ঠিক নয়। একজন যাচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত আলো নিভিয়ে দিতে, আর একজন যাচ্ছে আলো জ্বালাতে। এখানে কে জিতবে ? কিম্বা কে হারবে ?

কন্‌ফারেন্স টেবিলে বসেছেন পৃথিবীর তিনজন প্রধান নায়ক।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানই এ-পৃথিবীর নায়ক নম্বর ওয়ান।

এক পাশে স্যার উইনস্টন্ চার্চিল, আর তার অন্যপাশে কমরেড যোশেফ স্টালিন।

আর কনফারেন্স-রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে গুপ্ত পার্শ্বচররা। তারা শুধু হুকুম পালন করবে। তাদের যদি বলা হয়—যাও ভিয়েৎনামে গিয়ে কাল থেকে বোমা ফেলে এসো, তো তারা তাই-ই ফেলবে। কেন বোমা ফেলবে, কাদের ওপর বোমা ফেলবে, তা তাদের জিজ্ঞেস করবার নিয়ম নেই। তারা হুকুমের চাকর ছাড়া আর কিছু নয়। মিউনিসিপ্যালিটির চাকর কালিকাপ্রসাদের মতই তারা হুকুমের চাকর। তফাত শুধু ওই একটাই। তারা আলো নেভাবে, আর কালিকাপ্রসাদ শুধু আলো জ্বালাবে।

কালিকাপ্রসাদ যখন ছোট, তার মায়ের কোলে চড়ে কলকাতার কালিঘাটের মন্দিরে এসেছিল। পাণ্ডা ছিল—কালীচরণ। কালী-চরণ পাণ্ডা বললে সারা ইণ্ডিয়ার ধর্মভীরু মানুষ এক ডাকে চিনে ফেলতো।

মা-কালীর মন্দিরের একেবারে ভেতরে কালীমায়ের পায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে মা বলেছিল, আমার লেড়কাকে আশীর্বাদ করুন পাণ্ডাজী—

পাণ্ডাজীর অত সময় নেই যে একঘণ্টা ধরে সব যজমানকে আশীর্বাদ করে সে। তার আরো অনেক যজমান, আরো অনেক কাজ আছে। সবাইকে ছিটে-ফোঁটা আশীর্বাদ করেই তার পেট চালাতে হয়। তবু মায়ের পীড়াপীড়িতে পাণ্ডামশাই কালিকা-প্রসাদের মাথায় ফুল চড়িয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করেছিল—তোর বেটা

কিছুই বললেন না? এত কোটি-কোটি লোক নিঃশব্দে মারা যাবে শুনেও কিছু বললেন না? কিন্তু কেনই বা বলবেন? জাপানীরা তো এনিমি। ওরা তো শত্রু। ওরা বাঁচলেই বা কী, আর মরলেই বা কী!

কিন্তু লোকনাথের মনে হতো হিরোশিমাতেও যারা মরেছে, আবার ইংলণ্ডেও যারা মরেছে, তাদের মধ্যে কোনও তফাত থাকবে কেন? তাদের মধ্যে কোনও বিরোধই-বা থাকবে কেন? আবার এক বছর পরে যারা ভিয়েৎনামে মরছে, মরছে ঢাকায়, বরিশালে, নারায়ণগঞ্জে, কলকাতায়, বেলেঘাটায়, যাদবপুরে, বেহালায়, তাদের মধ্যেও তো মূলে কোনও তফাতই নেই।

সেদিনও ঠিক সময়ে লোকনাথ গিয়ে হাজির হয়েছে সিধু ওস্তাগর লেন-এ। আশে-পাশে পুকুর, ডোবা, মধ্যিখানে সরু খোয়া-পেটা রাস্তা। নোনা-ধরা ইঁট বার-করা দু-একটা বাড়ি। ওই জায়গাতেই একটা কোণাকুণি জায়গার ওপর ল্যাম্প-পোস্টটা দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক সময়েই কালিকাপ্রসাদ এল। সেই কাঁধে মই আর ফতুয়ার পকেটে দেশলাই। লোকনাথকে দেখে একটা ছোট নমস্কার করেই মই লাগিয়ে আলো জ্বালাতে উঠলো। তারপর আলো জ্বেলে আবার চলতে লাগলো। কিন্তু জানলাতে কেউ ডাকলো না আজ তাকে। কেউ বললে না—এই আলোওয়ালা, আলোওয়ালা—

কালিকাপ্রসাদ চলে যাচ্ছিল। লোকনাথ ডাকলে—কালিকা-প্রসাদ, আজকে তোমাকে কেউ ডাকলো না তো—

কালিকাপ্রসাদের তখন বেশী সময় নেই হাতে। বললে—দিদিমণির বোধ হয় অসুখ হয়েছে বাবুজী—আমি কাল এসে খবর নেব, আজ সময় নেই—

সময় তো থাকবেই না। যার মাথায় সারা রাস্তাটার আলো জ্বালাবার ভার, তার সময় না-থাকবারই কথা। আজকে সময় না-থাকলেও কাল একটু আগে এসে না হয় সে খবর নিতে পারবে।

লোকনাথের হাতে কিন্তু অনেক সময়। সে সময়ের সঙ্গে লড়াই করবে না বলেই সময় তার কাছে হার মেনেছে আজ। আর সেইজন্যেই আজ সবাই-এর সঙ্গে রাস্তায় এসে নেমে দাঁড়িয়েছে সে। সে সেখানেই থমকে দাঁড়ালো খানিকক্ষণ! এমন তো হয় না কখনও, এমন তো হবার কথা নয়। সে আবার ডাকলে—কালিকাপ্রসাদ—

নির্জন গলিটাতে সন্ধ্যে হতে-না-হতেই নির্জনতা নেমে এসেছে। তার গলার আওয়াজটা অনেক দূর দৌড়ে গিয়েও কালিকাপ্রসাদের নাগাল পেল না। কালিকাপ্রসাদের তখন অনেক কাজ। আরো অনেক আলো জ্বালাতে হবে তাকে। বিশাল পৃথিবীর আরো অনেক বকুল তার জন্যে প্রতীক্ষা করে বসে আছে!

লোকনাথ একতলা বাড়িটার সামনে গিয়ে সদর দরজায় কড়া নাড়তে লাগলো।

—কে?

ভেতর থেকে মেয়েলি গলার প্রশ্নটা লোকনাথের কানে এসে বিঁধলো।

—একবার দরজাটা খুলবেন দয়া করে, বকুলের সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

দরজা খুলতে গিয়েও অচেনা গলা শুনে রাণু একটু থমকে গিয়েছিল। অজয় বলে দিয়েছিল সদর-দরজা কেউ ঠেললেও আজকাল খোলা উচিত নয়। দিনকাল খারাপ হয়ে গেছে বড়। বাড়িতে পুরুষ মানুষ যখন কেউ নেই, তখন যাকে-তাকে দরজা খুলে দেওয়া বিপজ্জনক।

তাই গায়ের কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলে—কে আপনি? কোথা থেকে আসছেন?

—আপনি আমাকে চিনবেন না ঠিক! আমি বকুলকে চিনি।

—কিন্তু বকুলের তো জ্বর হয়েছে, সে শুয়ে আছে।

লোকনাথ বললে—আমি তাকে একটু দেখতে পাবো?

রোজই দেখি এই সময় জানলার ধারে বসে থাকে, আজকে দেখতে পেলুম না, তাই এসেছি—

এতক্ষণে রাণু দরজা খুলে দিলে। লোকনাথের মুখের দিকে চেয়ে লোকনাথের স্বভাব-চরিত্র বোঝবার চেষ্টা করলে।

লোকনাথ সবিনয়ে বললে—আমি নেহাত দায়ে পড়ে এসেছি, এই বাড়ির জানলায় রোজ বকুল বসে থাকে, আর রাস্তার বাতিটা জ্বলে উঠতেই সে 'আলোওয়ালা', 'আলোওয়ালা' বলে ডাকে। কিন্তু আজকে তো ডাকলো না—

—বললুম তো, কাল রাত থেকে ওর খুব জ্বর হয়েছে।

—ডাক্তার দেখছে কেউ ?

—না, ডাক্তারকে এখনও খবর দেওয়া হয়নি—

লোকনাথ জিজ্ঞেস করলে—জ্বর কত ?

রাণু বললে—আমাদের বাড়িতে থার্মোমিটার নেই—

—সে কী! আপনাদের বাড়িতে ছোট মেয়ে রয়েছে আর থার্মোমিটার পর্যন্ত নেই! দাঁড়ান, আমি এখ্খুনি একটা থার্মোমিটার নিয়ে আসছি—

বলে লোকনাথ বেরিয়ে গেল। রাণু অবাক। এ আবার কে ? এ ভদ্রলোক এখানে এলোই বা কেন ? বকুল একে চেনে নাকি ! অন্যদিন এতক্ষণ অজয় এসে পড়ে অফিস থেকে। সে এলে আর কোনও ভয় থাকে না। কিন্তু ওভার-টাইমের টাকাটা কি তুচ্ছ জিনিস ? তিন ঘণ্টা বেশি খাটলে আরো সাতটা টাকা ঘরে আসে। সাত টাকায় এক সপ্তাহের রেশন হয়ে যায়।

লোকনাথ চলে যাবার পর দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল রাণু। একটা দিক সামলালে তো আর তার চলবে না। ওদিকে রান্না চড়িয়েছে, ভেতরে বকুলের জ্বর, তারপর ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে কাঁথা সেলাই, চণ্ডীপাঠ—সব কাজ একলা তাকেই করতে হবে।

খানিক পরেই আবার দরজায় কড়া নড়ে উঠলো।

রাণু তাড়াতাড়ি দৌড়লো দরজা খুলতে। ভদ্রলোক বোধহয়

থার্মোমিটার নিয়ে এসেছে।

—ওমা, তুমি? আমি বলি···

অজয় বাড়ির ভেতরে পা দিয়ে বললে—আমি নয় তো কাকে ভেবেছিলে?

—আমি ভেবেছিলাম সেই ভদ্রলোক—

—সেই ভদ্রলোক মানে? আর কারো আসবার কথা ছিল নাকি?

—হ্যাঁ, আমি তাঁকে চিনি না। একটু আগেই এসেছিলেন। বকুলকে নাকি তিনি চেনেন। বকুলের জ্বর শুনেই ছুটে গেছেন থার্মোমিটার আনতে—

—থার্মোমিটার? জ্বর দেখবার জন্যে?

—হ্যাঁ।

—তা কোত্থেকে থার্মোমিটার আনবে?

—তা জানি না।

—কিন্তু কে লোকটা? চেনা নেই, শোনা নেই, অমনি বকুলের জন্যে থার্মোমিটার কিনে আনবে?

অজয় আজ তেইশ বছর কলকাতায় আছে, এমন অদ্ভুত ঘটনা কখনও শোনেনি কারো কাছে। বকুল তার কে? সে-ই বা আমাদের কে যে এত দরদ! এত দরদ তো ভালো কথা নয়! তুমি যাকে-তাকে দরজা খুলে দিতে গেলেই বা কেন? যদি চোর-ডাকাত কেউ হয়! আমি বাড়ি নেই, ঠিক সেই সময়ে বাড়িতে আসা, এটা তো ভালো জিনিস নয়।

—তা সে-ভদ্রলোক তো আবার আসছে বলে গেল, থার্মোমিটার নিয়ে আসছে···

—আর এসেছে! তুমিও যেমন! চোর-ডাকাত সবাইকে ভালো লোক বলে বিশ্বাস করে বসে আছো! এইরকম করেই কোন্ দিন তোমাকে কেউ খুন করে রেখে গয়না-গাঁটি নিয়ে চলে যাবে দেখছি—

কথাটা বলেও অজয়ের সন্দেহ গেল না। সংসারে যারা ছাপোষা মানুষ, তাদের ভালো জিনিসেও ভয় করে। অনিশ্চিতের সঙ্গে যারা পাঞ্জা লড়তে পারে, তারা আর যে-জাতের মানুষই হোক, অজয়ের জাতের মানুষ নয়। অজয় এমন এক প্রাণী যে একটা ফুশকুড়ি হলে সেটাকে ক্যানসার ভেবে ভয়ে সব সময়ে সিটিয়ে থাকে। সেই রকম মানুষের পক্ষে একটা অন্ধ মেয়ের বাপ হওয়া যে কী যন্ত্রণাকর, তা অজয় ছাড়া আর কারোর পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তেমন লোকের বাড়িতে অচেনা একটা মানুষের আবির্ভাবে সব যেন গোলমাল হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলে—বকুল কেমন আছে ?

—বললাম তো জ্বর! সেই কাল রাত থেকেই বিছানায় শুয়ে আছে, একবারও ওঠেনি।

বাইরে থেকে ঠিক তখনই সদর-দরজার কড়া নড়ে উঠলো, আর রাণু অজয়ের দিকে চাইলে। বললে—ওই! ওই বোধহয় সেই ভদ্রলোক এলেন—

অজয় দরজা খুলে দিতেই দেখলে দু'জন ভদ্রলোক।

লোকনাথ বললে—আমি ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি—কই, বকুল কোন্ ঘরে ?

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই হতবুদ্ধি! যেন মানুষ নয়, মেশিন। মেশিনের মতই অজয় দু'জনকে শোবার ঘরে নিয়ে গেল।

পাঁচ

হিরোশিমার আকাশে তখন সকাল। ১৯৪৫ সালের ৫ই আগস্ট। শেষ রাত্রের দিকে যারা হিরোশিমার আকাশ লক্ষ্য করে উড়ে গিয়েছিল, তাদের ঘড়িতে তখন ভোর সাড়ে সাতটা। আর খানিকক্ষণ পরেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের চোখের সামনে থেকে সূর্যের আলো চিরকালের মত নিভে যাবে। পৃথিবীর প্রথম

অ্যাটম-বোমা। যে-বোমা অনেক অর্থব্যয়ের ফলশ্রুতি, যাকে ফেলার জন্যে যত্নের ত্রুটি নেই প্রেসিডেণ্ট টুম্যানের। বিশেষ করে যখন সম্মতি দিয়েছে চার্চিল আর স্ট্যালিন!

ভোরের উদার আকাশের তলায় মাটির মানুষ তখন ঘুম থেকে উঠেছে। প্রতিদিনের পরিক্রমা শুরু করবার আগে সূর্য-প্রণাম সেরে নাও তোমরা! প্রত্যেকে নতুন সূর্যের আলোয় স্নান করে পবিত্র হয়ে নাও। হিন্দুরা বলি দেবার আগে পাঁঠাকেও যেমন স্নান করিয়ে নেয়, তেমনি করে তোমরাও স্নান করো। আমরা তিনজন এসেছি তোমাদের বলি দিতে—

তা নাম বললে চিনতে পারবে এমন মানুষ অজয় সরকার নয়। আর যে-রাস্তায় সে থাকে, তাও এমন কিছু নামজাদা রাস্তা নয়। নামজাদা রাস্তায় যারা থাকে, তাদের জগৎ আলাদা। ভগবানই বোধহয় তাদের ভালো-মন্দের ভার নিয়ে নেয়। তাদের দেখা-শোনা করবার জন্যে মিউনিসিপ্যালিটিও ভালো ল্যাম্প পোস্ট বসায়, ঝাড়ুদারও তাদের পাড়ার রাস্তা ভালো করে ঝাঁট দেয়। কোথাও এতটুকু কিছু ত্রুটি হলে ফাইন হয়ে যায় স্টাফের।

কিন্তু অজয় সরকার তাদের দলে নয়। একদিন ঘটনাচক্রে যেমন সবাই পৃথিবীতে জন্মায়, তেমনিই একদিন সে জন্মেছিল। তারপর যেমন সকলের বিয়ে হয়, তেমনি বিয়েও হয়েছিল। আর চাকরি? আরো দশজন ঠিক যে ভাবে হাজার জনের পায়ে ধরনা দিয়ে চাকরি পায়, তেমনিই একটা চাকরিও পেয়ে গিয়েছিল। তারপর সিধু ওস্তাগর লেনের একটা বাড়ির একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে সে সংসার চালাচ্ছিল।

সেই অজয় সরকারের জীবনে যে এমন অতি-নাটকীয় ঘটনা ঘটবে, তা কে ভাবতে পেরেছিল। পাড়ার ডাক্তার পরদিনও এসেছিল। এতদিন এ-পাড়ায় অজয় সরকার আছে, কোনও দিন ডাক্তার ডাকার দরকার হয়নি তার। ডাক্তার ডাকতে গেলেই তো

নগদ টাকা লাগবে। পশুপতি ডাক্তার তো বিনা পয়সায় চিকিৎসা করবে না কারো।

পশুপতি ডাক্তার সেদিন স্পষ্টই জিজ্ঞেস করে ফেললে—আচ্ছা, ও-ভদ্রলোক আপনার কে হয় বলুন তো ?

—কোন্ ভদ্রলোক ?

—ওই যে লোকনাথবাবু। লোকনাথ রায়। আমি খবর নিয়েছি, খুব বড়লোক মশাই, অটো-ইনজিনিয়ারিং ওয়ার্কস-এর কার্তিক রায়ের নাতি—

অজয়ও অবাক হয়ে গিয়েছিল। বললে—তাই নাকি ? ওঁরা কি অনেক বড়লোক ?

—নিশ্চয়! তাই তো জিজ্ঞেস করছি, মিস্টার রায়ের সঙ্গে আপনার আলাপ হলো কী করে ?

অজয় কিন্তু-কিন্তু করছিল ক'দিন ধরে। বললে—আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি লোকনাথবাবুকে জীবনে কখনও চিনতামও না। একটা পয়সা পর্যন্ত খরচ করতে দেন না আমাকে বকুলের জন্যে! এই দেখুন না, এত আঙুর-বেদানা-আপেল কিনে দিয়ে গেছেন—

বিছানার পাশেই ফলগুলো সাজানো ছিল। পশুপতি ডাক্তার সেদিকে চেয়ে দেখলেন।

—আপনি ডাক্তারবাবু আপনার ফিস্ পাচ্ছেন তো ঠিকমত ? আমি তার জন্যে খুব লজ্জিত হয়ে আছি—

পশুপতি ডাক্তার বললেন—না না, অজয়বাবু, আপনার লজ্জা করবার কোনও কারণ নেই, আমি ঠিক টাকা পেয়ে যাচ্ছি, এই দেখুন না—

বলে পকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বার করে দেখালেন। বললেন—এই টাকা জোর করে আমাকে গছিয়ে দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন সকালে বিকালে সন্ধ্যেয় তিনবার করে বকুলকে দেখতে—

পশুপতি ডাক্তার সাধারণতঃ আট টাকা নিয়ে থাকেন। একবার রোগীর বাড়িতে এলে ওই টাকাটাই আগাম নিয়ে থাকেন তিনি। এ-জন্যে বরানগরের পাড়ায় পশুপতি ডাক্তারের বদনামও আছে। লোকে বলতো—পশুপতি ডাক্তার, ডাক্তার নয় তো, চশমখোর—

সেই পশুপতি ডাক্তার পর্যন্ত ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেছেন। এমন লোকও তুনিয়ায় আছে তো! আত্মীয় নয়, স্বজন নয়, এক পাড়াতেও থাকে না। কোথায় কোন্ গড়পারের কোন্ ঠিকানায় থাকে, আর টো-টো করে ঘুরতে আসে এই বরানগরে। এ কেন আসে? কীসের লোভ? এক-একবার মনে হয়, তবে কি অজয় সরকারের বউটার জন্যে। বউটারও বয়েস কম। দেখতেও আঁট-সাঁট চেহারা।

তু'একজন বসে থাকে ডিস্‌পেনসারিতে। তারা গভীর গবেষণা করে। বলে—ডাক্তারবাবু, ব্যাপারটা কিছু জানতে পারলেন?

পশুপতি ডাক্তার কিছুই জানতে পারেন নি। সত্যি এ-যুগে এ এক অপরিসীম বিস্ময়! অত বড়লোকের ছেলে হয়ে এই বাড়ির একটা অন্ধ মেয়ের জন্যে এত টাকা খরচ করা, এর পেছনে কী রহস্য থাকতে পারে, কেউ গবেষণা করে করেও বার করতে পারে না।

সেদিনও ডাক্তারবাবু এলেন। বললেন···দেখি, জিভ দেখি?

বকুল জিভ বার করলে।

টর্চের আলোটা দিয়ে বকুলের মুখের ভেতরটাও দেখলে। না, কোথাও গলদ নেই। স্টেথিস্‌কোপ্‌টা দিয়ে বুকটাও ভালো করে পরীক্ষা করে নিলেন। তারপর ইউরিন, স্টুল, স্পুটাম, সব পরীক্ষা করতে হবে।

অজয় সরকার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

জিজ্ঞেস করলে—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

পশুপতি ডাক্তার স্টেথিস্‌কোপ্‌টা গুটিয়ে বললেন—কোথাও কোনও গলদ নেই—

—তাহলে আর কালকে আসতে হবে না তো আপনাকে ?

পশুপতি ডাক্তার বললেন—আপনি না আসতে বললে হবে কী অজয়বাবু, মিস্টার রায় তো ছাড়বেন না। তাকে গিয়ে রিপোর্ট দিতে হবে আজও—এই একটু পরেই আমার চেম্বারে আসবেন—

বলে ডাক্তারবাবু চলে গেলেন।

কিন্তু মন থেকে সন্দেহটা গেল না। রোগীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে চেম্বারে গিয়ে বসতেই দেখলে লোকনাথ রায় অন্য রোগীদের ভিড়ের মধ্যে বসে আছে।

লোকনাথ বললে—কেমন দেখলেন বকুলকে ?

পশুপতি ডাক্তার বললেন—আর তো কোনও ট্রাবল নেই পেশেন্টের—

লোকনাথের তবু ভয় যায় না। বললে—তা হোক, তবু আপনি রোজ একবার করে বকুলকে দেখে আসবেন।

বলে আবার একটা একশো টাকার নোট বার করে ডাক্তারের দিকে এগিয়ে দিলে।

বললে—এইটে ধরুন।

পশুপতি ডাক্তার টাকাটা নিয়ে পকেটে পুরে ফেললেন। প্রতিদিন নিয়ম করে ডাক্তারবাবু বকুলকে দেখে আসছেন। আগে বুকের দোষ ছিল, সর্দি-কাশি-হাঁফানির টান ছিল। শুধু ডাক্তার নয়, নার্সও রেখে দিয়েছে লোকনাথ।

অজয় বলেছে—আপনার অনেক টাকা খরচ হচ্ছে বকুলের জন্যে—

রাণুও সঙ্কোচের সঙ্গে বলেছে—আমাদের জন্যে আপনার অনেক টাকা নষ্ট হচ্ছে লোকনাথবাবু—

—আপনাদের জন্যে ?

লোকনাথ মনে মনে হাসে! ওরা জানে না, সে বকুলের চিকিৎসা করছে না, চিকিৎসা যদি করে থাকে কারো, তো সে

নিজেরই। নিজের চিকিৎসার জন্যেই সে এত টাকা খরচ করছে। দরকার হলে আরো খরচ করবে সে!

যেদিন আবার বকুল ভাত খেলে, সেদিন আবার লোকনাথ এল। তখন ঠিক বিকেল হবো-হবো। আর একটু পরেই সন্ধ্যে হবে। আর একটু পরেই কালিকাপ্রসাদ আসবে।

লোকনাথ বললে—বৌদি, বকুলকে জামা পরিয়ে দিন—বেশ ভালো করে চুল আঁচড়ে, মুখে পাউডার দিয়ে, চোখে কাজল পরিয়ে দিন—

একটা মেয়ে, তাও আবার অন্ধ। লোকনাথের মুখের দিকে চেয়ে রাণুর চোখে একটা জিজ্ঞাসা সজল হয়ে উঠলো। যেন বলতে চাইলে—আর কেন দাদা, কার জন্যে সাজাবো, কে দেখবে ওকে?

লোকনাথ ধমক দিয়ে উঠলো। বললে—কাঁদবেন না, আমি যা বলছি তাই করুন—

লোকনাথেরই কিনে দেওয়া একটা ফ্রক বকুলকে পরিয়ে দিলে রাণু। চোখে কাজল লাগিয়ে দিলে, চুলটা আঁচড়ে দিলে চিরুনি দিয়ে।

বকুল বলে উঠলো—আমাকে ভালো দেখাচ্ছে মা?

মার হয়ে লোকনাথই উত্তর দিলে—হ্যাঁ, তোমাকে খুব ভালো দেখাচ্ছে দিদিমণি। এইবার চলো আমার সঙ্গে জানলার ধারে—

বলে জানলার ধারে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলে। অসুখের সময়ে জানলার ধারে আসতে পারেনি সে। আগে প্রতিদিন মেয়েকে সাজিয়ে-গুজিয়ে মা বসিয়ে রেখে যেত ওখানে। বসিয়ে রেখে রান্না করতে যেত। রান্নাবান্না সেরে চুল বেঁধে গা ধুয়ে তখন আবার মেয়ের কাছে আসতো। মা আসতেই বলতো—মা, আলোওয়ালা এসেছিল?

মা বলতো—তোমার আলোওয়ালা রোজ আসবে—

মেয়ে জিজ্ঞেস করতো—কেন মা? আলোওয়ালা রোজ আসে

কেন মা ?

মা বলতো—বা রে, আলোওয়ালা না এলে যে সব অন্ধকার হয়ে যাবে—

তা বটে। ছোট পাঁচ বছরের মেয়ে। তবু সেও বোঝে অন্ধকার জিনিসটা খারাপ, আর আলো জিনিসটা ভালো।

তারপর হঠাৎ এক সময়ে বুঝতে পারে, চোখের সামনের কালোটা কেমন একটু আবছা সাদার মতন হয়ে উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠতো—ওই আলোওয়ালা এসেছে, আলোওয়ালা—

তা সেদিনও নতুন জামা-জুতো পরিয়ে মা মেয়েকে জানালার ধারে বসিয়ে দিলে। হঠাৎ একটু পরেই বকুলের মুখটা আনন্দে-খুশিতে ঝলমল করে উঠলো।

বলে উঠলো—ওই আলোওয়ালা এসেছে, আলোওয়ালা—

কালিকাপ্রসাদও দেখতে পেয়েছে। মই থেকে নেমে এসে জানলার সামনে দাঁড়ালো।

—দিদিমণি, দিদিমণি! তুমি ভালো হয়ে গেছ ?

কালিকাপ্রসাদ জানলার ভেতরে হাত বাড়িয়ে দিলে। গাল টিপে দিলে বকুলের। বকুলও হাত বাড়িয়ে দিলে কালিকাপ্রসাদের মুখের দিকে।

বললে—তুমি আবার কাল আসবে তো আলোওয়ালা ?

তারপর কালিকাপ্রসাদের মুখে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। বললে—তোমারও দাড়ি আছে বুঝি আলোওয়ালা। জানো, আমার কাকাবাবুরও দাড়ি আছে, আমার বাবারও দাড়ি আছে। শুধু মার দাড়ি নেই—

অত গল্প করবার তখন সময় নেই কালিকাপ্রসাদের। তাকে আরো অনেক জায়গায় আলো জ্বালতে যেতে হবে, আরো অনেক বকুল তার জন্যে পথ চেয়ে বসে আছে। সে বকুলের গাল টিপে দিয়ে চলে গেল।

দুই

সেদিন অসময়ে সদর দবজার কড়া নাড়বার শব্দ হতেই রাণু একটু অবাক হয়ে গেল। এমন অসময়ে তো কেউ দরজা ঠেলে না। সকালবেলা ঝি এসে সংসারের কাজ-কর্ম করে দিয়ে অনেকক্ষণ চলে গেছে। কিন্তু না, ঝি নয় লোকনাথ।

—লোকনাথ ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললে—বৌদি, বকুলকে জামা-কাপড় পরিয়ে দিন।

—সে কী? কেন?

—বকুলকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো আজ।

—কীসের ডাক্তার? ডাক্তারবাবু তো এই সেদিন দেখে গেছেন। তিনি যে বললেন—সব ঠিক আছে।

লোকনাথ বললে—না, এ সে ডাক্তার নয়, চোখের ডাক্তার। কলকাতার সবচেয়ে বড় চোখের ডাক্তারের কাছে বকুলকে নিয়ে যাবো আমি—

রাণু বললে—কিন্তু ওকে কী করে নিয়ে যাবেন আপনি?

—ওর জন্যে তো গাড়ি এনেছি।

—গাড়ি! রাণু জানলার বাইরে উঁকি মেরে দেখলে রাস্তার ওপর একটা বিরাট গাড়ি দাঁড়িয়ে, তার সামনে ড্রাইভার বসে আছে একজন।

—ওটা কাদের গাড়ি?

—আমাদের।

—আপনার?

বিস্ময়ে রোমাঞ্চে রাণু লোকনাথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখলে। যেন তাজমহল দেখছে সে। এ আবার কেমন মানুষ! কিন্তু অত কথা ভাববারও সময় দিলে না লোকনাথ। তার অত নষ্ট করবার মত সময় নেই। রাণু তাড়াতাড়ি বকুলকে ফ্রক পরিয়ে দিলে, জুতো

পরিয়ে দিলে। চুল আঁচড়ে দিলে। লোকনাথ তাকে কোলে করে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলো। গাড়িতে উঠতেই গাড়ির ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিলে। তারপর গাড়িটা যখন রাস্তার বাঁদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখনও খানিকক্ষণ সেই দিকে চেয়ে রইল রাণু। মনটায় কেমন একটা আশাও হলো। খুকুর চোখ ভালো হয়ে যাবে! খুকু অন্য সব মেয়েদের মত চোখে দেখতে পাবে।

সন্ধ্যেবেলা অজয় সব শুনলো।

জিজ্ঞেস করলে—তারপর?

রাণু বললে—তারপর বেলা যখন বারোটা, তখন আবার গাড়িটা ফিরে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম লোকনাথবাবুকে—ডাক্তার কী বললে? এ চোখ সারবে? তা লোকনাথবাবু কিছু বললেন না—

অজয় বললে—তার মানে সারবে না—

রাণু বললে—আজকে সন্ধ্যেবেলা তো আবার আসবেন তিনি। তুমি একবার জিজ্ঞেস কোর না ডাক্তার কী বলেছে—

ছোট-ছোট আশা-আকাঙ্ক্ষা আর ছোট-ছোট কামনা-বাসনার মানুষ এরা। এই অজয় আর রাণু। অফিসের চাকরিতে পাঁচ টাকা ইন্‌ক্রিমেণ্ট কিম্বা কুড়ি টাকার একটা শাড়ি, এতেই এদের জীবনে স্বর্গলাভ হয়। সেই ছোট সংসারে এসে হাজির হয়েছে লোকনাথের মত একটা মানুষ। তাকে বুঝতে পারে, তার পরিধি জানতে পারে, সিধু ওস্তাগর লেনে এমন লোক কেউ নেই।

তা পরের দিন সত্যিই আবার এলো লোকনাথ। আবার রাস্তায় সেই বিরাট গাড়ি। আবার বকুলকে নিয়ে যাবে সে। এবার অন্য ডাক্তারের কাছে।

—জামা পরিয়ে দিন বৌদি, জুতো পরিয়ে দিন!

বকুল আগের দিন জামা-জুতো পরে গাড়ি চড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। এমন করে বেড়ানো আগে কখনও তার কপালে

জোটেনি। প্রতিবার বেড়িয়ে এসেই মার কাছে গল্প করে কত দূরে সে গিয়েছিল, কাকাবাবু তাকে কী-কী খেতে দিয়েছে।

মেয়ে বলে আর মা শোনে, বাবা শোনে।

মেয়ে বলে—তোমরা জানো না, তোমরা কেউ জানো না গাড়ি চড়তে সে কী আরাম! তোমরা আমাকে কখ্খনো গাড়ি চড়াওনি। কাকাবাবু আমাকে কত আদর করে। কত ল্যাবেনচুষ কিনে দেয়—

যদি পাড়ার কেউ জিজ্ঞেস করে—তোমায় সবচেয়ে কে বেশী ভালবাসে খুকু?

খুকুরাণী বলবে—কাকাবাবু—

—তারপর আর কে?

—আলোওয়ালা।

তারা অবাক হয়ে যায়। ওমা, এ মেয়ে বলে কী! তাহলে তোমার বাবা মা? তারা ল্যাবেনচুষ কিনে দেয় না?

লোকনাথ যে কখন হঠাৎ আসে, আর কখন খুকুকে নিয়ে কোথায় চলে যায়, অজয় কিছুই টের পায় না। দেখাও হয় না কখনও। শুধু বাড়ি এসে রাণুর কাছে শোনে, লোকনাথবাবু এসেছিল। এসে বকুলকে চোখের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

অজয় জিজ্ঞেস করে—ডাক্তাররা কী বলে? সারবে? অপারেশন করলে সারবে?

রাণু বলে—কি জানি, কিছুই তো বলেন না লোকনাথবাবু—

—তুমি কিছু জিজ্ঞেস করো না কেন?

—জিজ্ঞেস করতেই তো ভয় করে। যদি শুনি আর সারবে না—

সেদিনও লোকনাথ ঠিকসময়ে এসে হাজির হলো সিধু ওস্তাগর লেনে। যারা লোকনাথকে চিনে গেছে, তারা বললে—ওই ছাখ, সেই লোকটা আসছে—

চায়ের দোকানের ভেতর থেকে ছেলেরা চেয়ে দেখলে, সেই

মাথায় উস্কখুস্ক চুল, একমুখ এলোমেলো দাড়ি, কাঁধে ঝোলা একটা, আর পায়ে চপ্পল। তারা জানে, লোকটা যেদিন ষোল নম্বর বাড়ির অন্ধ মেয়েটাকে নিয়ে ডাক্তারের বাড়ি যায়, সেদিন গাড়ি চড়ে আসে, আবার ডাক্তারকে দেখিয়ে গাড়ি করে মেয়েটাকে বাড়িতে মার কাছে ফেরত দিয়ে চলে যায়। কিন্তু অন্য সময়ে আসে পায়ে হেঁটে। পায়ে হেঁটে এসে ষোল নম্বর বাড়িটার সামনে দাঁড়ায়। আর তখন আসে মিউনিসিপ্যালিটির আলোওয়ালা। আর তখন ষোল নম্বর বাড়ির জানলা থেকে বাড়ির ছোট্ট মেয়েটা চেঁচিয়ে ডাকে—আলোওয়ালা, ও আলোওয়ালা—

এ-সব ঘটনা পাড়ার ছেলেদের দেখা। তাই সেদিনও যখন লোকনাথ হাঁটতে হাঁটতে এলো, ছেলেরা লক্ষ্য করলে, কিন্তু কিছু বললে না। কালিকাপ্রসাদ যথারীতি মই দিয়ে ল্যাম্প্-পোস্টের ওপরে উঠে আলো জ্বালালো। আলো জ্বালাতেই সে সেই সুদূর ছাপরা থেকে কলকাতায় এসেছে। যেই আলো জ্বলে উঠলো, আর বকুলও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—আলোওয়ালা, ও আলোওয়ালা—

কালিকাপ্রসাদ লোকনাথকেও দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে—আমার আর চাকরি থাকবে না হুজুর,—আমি আর আলো জ্বালাতে পারবো না—

—কেন? কী হয়েছে?

—সবাই আলো নিভিয়ে দিচ্ছে হুঁজুর।

—কই? কখন নিভিয়ে দেয়

—এই এখন তো আলো জ্বেলে দিয়ে গেলুম, একটু রাত হলেই সব ঢিল ছুঁড়বে আলোতে। তারপর সব নিভে যাবে—

সেদিন রবিবার। অজয় সরকার লোকনাথকে দেখে নমস্কার করলে।

বললে—আপনার সঙ্গে আমি দেখাই করতে পারিনি লোকনাথবাবু। আপনি কিছু মনে করবেন না। অফিসে এখন বাজেট তৈরি করা চলছে—

লোকনাথ বললে—ওর জন্যে আপনি ভাববেন না, আমি তো আপনার জন্যে আসি না, বকুলের জন্যে আসি।

অজয় বললে—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, বকুলের চোখ কি সত্যিই ভালো হবে? ডাক্তাররা কী বলছে?

—তাঁরা বলছেন, ইণ্ডিয়াতে ভালো করতে পারবে না কেউ। এ করতে গেলে বাইরে যেতে হবে। বকুলকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে—

—বাইরে? বাইরে মানে?

লোকনাথ বললে—বাইরে মানে হয় আমেরিকা, নয় লনডন, নয় ভিয়েনায়—

অজয় অবাক হয়ে গেল। বললে—আপনি ফরেনে নিয়ে যাবেন বকুলকে?

কথাটা যেন বিশ্বাস হলো না তার। এ কথা কাউকে বললেও যে সে বিশ্বাস করবে না। পাড়ার লোকেরা অবাক হয়ে যাবে, সবাই যখন জানতে পারবে। তার মেয়ে বিলেতে যাবে। জাহাজে করেও বিলেতে যাওয়া যায়, আবার প্লেনেও যাওয়া যায়। এ শুনলে পাশের বাড়ির লোকরাও অবাক হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ সন্দেহও করবে হয়ত। ডাক্তার পশুপতি সরকার নিজেই তো একদিন সন্দেহ করে বসেছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন—উনি কে হন আপনার বলুন তো?

সত্যিই তো, লোকনাথ রায় অজয় সরকারের কে হয়! কেউ না হলে কি কারো উপকার করতে নেই? সংসারে স্বার্থটাই কি সব? তাহলে পাড়ার সব লোক লোকনাথ রায়কে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন? সে আমার উপকার করে কী অন্যায়টা করেছে!

অজয় সরকার বলে—জানেন লোকনাথবাবু, আপনি যে বকুলের চোখ সারিয়ে দেবার জন্যে ওকে বিলেতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন, সে কথা শুনে কেউ বিশ্বাস করতে চাইছে না।

রাণু বলে—সত্যি দাদা, আপনার সঙ্গে আগে আমাদের কোনও

জানাশুনোও ছিল না, তাও কেউ বিশ্বাস করতে চায় না—

অজয় বলে—জানেন, এত বছর এ-পাড়ায় আছি, এতদিন কেউ আমাদের খোঁজ-খবরও নেয়নি। কিন্তু আজকে আপনি যেই আসেন, অমনি সবাই হাঁ করে চেয়ে দেখে। রান্না ফেলে, কাজকর্ম ফেলে, দৌড়ে রাস্তায় দেখতে আসে। আপনার গাড়িটা দেখেও হিংসে হয় লোকের। তারা বলে—লোকনাথবাবু যদি অত বড়লোক, লোকনাথবাবুর যদি অত বড় গাড়ি, তো তিনি হেঁটে বেড়ান কেন ?

এসব কথা লোকনাথ শুনতে চায় না। বলে—আমার কাছে ও-সব প্রসঙ্গ না-ই বা তুললেন। ও-সব আলোচনা করতেও আমার ঘেন্না হয় অজয়বাবু—

বলে লোকনাথ বাইরে পা বাড়ায়।

কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একটা সুযোগ এসে গেল। এমন সুযোগ সচরাচর কারোর জীবনে আসে না। লোকনাথ বললে—আর বিলেত যেতে হবে না অজয়বাবু, এবার শুনছি একজন ডাক্তার কলকাতায় এসেছেন ভিয়েনা থেকে—

—কলকাতায় এসেছেন ?

লোকনাথ বললে—শুনছি তো তাই। এখনও দেখা করিনি। শুনছি এক বড়লোক মারোয়াড়ী ভদ্রলোকের চোখ অপারেশান করতে এসেছেন—আজ ভাবছি একবার সেখানে যাবো—

বলে লোকনাথ চলে গেল।

পাঁচ

বসুমতী দেবীর কথাগুলো আমার মনে ছিল। জীবনে তিনি অনেক দেখেছেন। অনেক ভোগও করেছেন। সৌভাগ্যের শীর্ষে উঠে বছরের পর বছর সেই উচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠান করেছেন। জামাই-এর মৃত্যুর পর যতদিন লোকনাথ সাবালক হয়নি, ততদিন ফ্যাক্টরির ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের কাজ করেছেন। ইণ্ডিয়ার যত বড়

বড় নামজাদা লোক, সবাই তাঁর বাড়িতে এসেছেন। কে আসেন নি? মহাত্মা গান্ধী, সি-আর-দাশ থেকে শুরু করে নেতাজী সুভাষ পর্যন্ত সবাই এই বসুমতী দেবীর সঙ্গে মিশেছেন। বসুমতী দেবী নিজের হাতে তাঁদের পরিবেশন করে খাইয়েছেন। কংগ্রেস ফাণ্ডে চাঁদা দিয়েছেন লক্ষ লক্ষ টাকা। সেই বসুমতী দেবী শেষ জীবনে নাতির জন্যে বড় মনোকষ্ট পেলেন। স্বামীর হাতে-গড়া ফ্যাক্টরি সেই নাতি ছেড়ে দিলে। একমাত্র সন্তান মেয়ে, সে অল্প বয়সে মারা গেল। উপযুক্ত জামাই ছিল, তার ওপরও তিনি অনেক ভরসা করেছিলেন। সেও চলে গেল চোখের সামনে। বাকি ছিল শুধু নাতি। ভেবেছিলেন সেই নাতি বিয়ে করবে, সংসার করবে। আবার তাদের নিয়ে তিনি উঠে দাঁড়াবেন।

অফিসের কাজে রোজ বেরনো হয় না। কিন্তু একটু সময় পেতেই অফিসে যাবার আগেই সেদিন সোজা চলে গেলাম লোকনাথদের বাড়িতে। ভাবলাম, লোকনাথ তো বাড়ি থেকে সকাল-সকালই বেরোয়, তার আগেই গিয়ে ধরবো। তার দিদিমার কথাটা বলবো। বিয়ের কথা বলবো। বিয়ে করা যে এমন কিছু অন্যায় কাজ নয়, সেইটেই বুঝিয়ে দেব তাকে।

কিন্তু বাড়ির সামনে গিয়ে অবাক।

দেখি অসংখ্য লোকজন ঘোরাফেরা করছে বাড়ির সামনে। চার পাঁচখানা খালি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

কী ব্যাপার? একজনকে জিজ্ঞেস করলাম—এখানে এত ভিড় কেন? কী হয়েছে?

একজন ড্রাইভার গোছের লোক দাঁড়িয়ে ছিল।

বললে—মেমসাহেবের অসুখ!

মেমসাহেব? মেমসাহেব কে?

মেমসাহেব যে কে, এ বাড়িতে আবার মেমসাহেব কে এলো বুঝতে পারা গেল না। লোকনাথদের সেই পুরনো চাকর গিরিধারীর সঙ্গে দেখা হলো। সে আরো অথর্ব হয়ে গেছে। সে

তখন কাঁদছে। আমাকে দেখে কান্না আরো বেড়ে গেল।

বললাম—কী হয়েছে গিরিধারী?—কার অসুখ?

গিরিধারী কাঁদতে কাঁদতে বললে—কর্তা-মায়ের—

—কী হলো কর্তা-মা'র হঠাৎ?

গিরিধারী যা বললে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, রাত্তির বেলা হঠাৎ ছুটোর সময় কর্তা-মা অজ্ঞান হয়ে যান। তারপর থেকে আর জ্ঞান ফেরেনি তাঁর। এখন ডাক্তারবাবুরা এসে দেখছেন—জানি না কী হয়—

এমন সময়ে দেখলাম দু'চারজন ডাক্তার বসুমতী দেবীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। সঙ্গে লোকনাথ। আমাকে লোকনাথ দেখতে পেতেই চোখের ইঙ্গিতে বললে—আসছি—

একসঙ্গে চার-পাঁচজন ডাক্তার দেখছিল বসুমতী দেবীকে। তাদের মধ্যে দু'চারজন চলে গেলেন। বাকি ছিল আরো দু'তিনজন। ডাক্তারদের গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে লোকনাথ আবার আমার কাছে ফিরে এল।

জিজ্ঞেস করলে—কেমন আছিস?

বললাম—তোর কাছেই এসেছিলুম—

—আমার কাছে? আমি কী করেছি?

সমস্ত বক্তব্যটা বুঝিয়ে বলবার মত অবস্থা নয় তখন। আর বসুমতী দেবী, যাঁর কথামত লোকনাথের কাছে এসেছিলাম, তিনি নিজেই তো মৃত্যুশয্যায়। আমার কথার ওপর যাঁর ভালোমন্দ নির্ভর করছে তিনিই যখন দেখতে পাবেন না, তখন কথাটা লোকনাথকে বলেই বা কী হবে?

—তোর দিদিমার খুব ইচ্ছে ছিল তুই বিয়ে করিস।

লোকনাথ বললে—যাঁর ইচ্ছের কথা বললি, তিনি আজকের দিনটাও আর বাঁচেন কিনা সন্দেহ—

—ডাক্তাররা কী বলেন?

—বলবে আবার কী! তারা তো ম্যাজিক জানে না। শুধু

মারবার বিদ্যেটা ডাক্তাররা জানে, বাঁচাবার বিদ্যে জানে না—

—ছিঃ, একথা বলিস নি তুই। ওরকম বলা অন্যায়।

একথার উত্তরে লোকনাথ আর কিছু বললে না। এতদিন পরে দেখা। অথচ লোকনাথের প্রাত্যহিক সমস্ত খবরই কোন-না-কোন সূত্রে কানে এসে পৌঁছোয়। যে লোকনাথ সম্বন্ধে এত কথা, এত কাহিনী শুনে এসেছি, তাকে আজ আবার ভালো করে চোখের সামনে দেখলাম।

বললাম—তোকে বোধহয় আটকে রাখছি—

লোকনাথ বললে—তুই আমাকে বিয়ে করবার কথা বলতে এসেছিস, কিন্তু আমি কী করে বিয়ে করি বল?

বললাম—সে তো বটেই, দিদিমার এই অবস্থা, এ সময়ে ওসব ভাবাই যায় না—

—না—

লোকনাথ হঠাৎ যেন বড় কঠোর হয়ে বললে—না, তা নয়, দিদিমার অসুখ, তাতে আমি বিচলিত হইনি। দিদিমা মারা গেলে ভাববো, দিদিমা কোনওদিন ছিলই না। আমার মা, বাবা একদিন মারা গেছে, তাতে কোনও ক্ষতি হয়েছে? বরং লাভই হয়েছে অনেক! দিদিমা মারা গেলেও আমার অনেক লাভই হবে—

আমি চমকে উঠলাম। এসব কী বলছে লোকনাথ!

লোকনাথ আমার মনের কথাটা ধরে ফেললে। বললে—দুনিয়ায় সত্যি কথা কেউ শুনতে চায় না। এখানে যে কেউ সত্যি কথা বলতে চেষ্টা করেছে, তাকেই সবাই খুন করেছে। সকলের ধারণা সত্যি কথাগুলো শুধু বইতেই লেখা থাকুক, স্কুলে-কলেজে ছেলেমেয়েরা শুধু সেগুলো পড়ুক।

তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল যে দিদিমা তখনও মারা যায়নি। আমার দিকে চেয়ে বললে—চলি, পরে একদিন তোর সঙ্গে দেখা করবো—

আমি হঠাৎ বলে উঠলাম—সরযূ বলে কোনও মেয়েকে তুই

চাকরি দেবার জন্যে বিকাশকে চিঠি দিয়েছিলি ?

লোকনাথের মনে করতে যেন একটু কষ্ট হলো। যেন অনেক পুরনো ঘটনা।

বললে—নামটা মনে নেই। তবে মনে আছে, একটা মেয়েকে চাকরি করে দেবার জন্যে একদিন যাদুগোপাল খুব ধরেছিল আমাকে। আমি বোধহয় তার জন্যে বিকাশকে একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলুম—তা বিকাশ তাকে চাকরি দিয়েছিল ?

—হ্যাঁ, দিয়েছিল। কিন্তু তুই চিঠি না দিলেই ভালো করতিস।

—কেন ?

—সে পরে একদিন তোকে বলবো। এখন সে-সব বলে তোর মন-খারাপ করিয়ে দেব না।

—কী বললি ?

লোকনাথ চলে যেতে-যেতে তাড়াতাড়ি ফিরে দাঁড়ালো। বললে—কী বললি তুই ? মন খারাপ করবো ? মন-খারাপের বাকিটা কী আছে বলতে পারিস ? বলতে পারে তোর ওই সরযূ, ওই বিকাশ ? ওই মহাত্মা গান্ধী, ওই মতিলাল নেহরু, ওই সি-আর-দাস, ওই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ওই স্বামী বিবেকানন্দ ? ওঁদের সকলের ছবি টাঙানো ছিল আমাদের ড্রয়িং-রুমের দেয়ালে, তা জানিস তো ? সকলের ছবি আমি পা দিয়ে লাথি মেরে গুঁড়ো করে ফেলেছি, কেন জানিস ? ওরা সব মিথ্যে কথা বলে গেছে।

বলতে বলতে লোকনাথের মুখের চোখের চেহারা অন্য রকম হয়ে গেল। চোখ দুটো জ্বলতে লাগলো, কান দুটো আর নাকটা লাল হয়ে উঠলো। বলতে লাগলো—সরযূ আমার কী ক্ষতি করবে, কতটুকু ক্ষতি করতে পারে সরযূরা ? আমি তো তাকে বলেইছিলুম, আমি তার চাকরি করে দিলে তার সর্বনাশ হবে। যাদুগোপাল, নিমাই শা তাদেরও তাই বলেছি। আমি যাদেরই ভাল করতে গিয়েছি তাদেরই কেবল সর্বনাশ হয়েছে। কেদার

সরকার বলে একজন লোক আমাদের ফার্মে সাব-অ্যাকাউন্টেন্ট ছিল। আমি তার ভাল করবার জন্যে তাকে চৌদ্দ হাজার টাকা দিয়েছিলুম, ভাবলুম, এ লোকটা হয়ত আর ঘুষ খাবে না, টাকা পেয়ে লোকটা বেঁচে গেল—কিন্তু সেদিন দেখি চাকরি গিয়ে সে আরো বড়লোক হয়ে গিয়েছে, আরো একটা বিরাট গাড়ি কিনেছে—

আমি চিনতে পারলাম। বললাম—সেই লেবার-লীডার কেদার সরকারের কথা বলছিস? সে তো এখন আমাদের অফিসের লেবার ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট—

—তাহলে তো তাকে তুই চিনিস্। তোর চেনা লোক। আমাদের অটো-ইনঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ ওকে মাসে মাসে দু' হাজার টাকা দিত স্টাফকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে। সেইজন্যেই আমাদের ফার্মে কখনও স্ট্রাইক হয়নি। আমার বাবাই কেদার সরকারের এই সর্বনাশটা করেছিল। কেদার সরকারকে ঘুষখোর বানিয়েছিল আমারই বাবা—

বললাম—এখন তো সেই কেদার সরকারই সরযূর বস্—

—অ্যাঁ?

—হ্যাঁ, সরযূর মাইনে এখন পনরো শো টাকা মাসে। এখন সিঁথিতে একটা চারতলা ফ্ল্যাট-বাড়ি করেছে সে। মাসে মাসে তেরো শো টাকা বাড়িভাড়া পায়। বুড়ো বাবা-মাকে দমদমের বস্তি থেকে আনিয়ে ওই ফ্ল্যাট-বাড়িতে রেখেছে···

লোকনাথ হো-হো করে হেসে উঠলো। পাগলের হাসির মতন শোনালো তার হাসির আওয়াজটা। বললে—তাহলে সত্যি-সত্যিই আমার কথা ফলে গেছে? সত্যি-সত্যিই মেয়েটার সর্বনাশ হয়েছে? তা যাদুগোপাল কি এ খবর জানে?

বললাম—তা জানি না। যাদুগোপাল জানে কিনা জানি না—

লোকনাথ বললে—তুই যাদুগোপালকে চিনিস তো? প্যারাগন সিনেমার পেছনে তেলেভাজার দোকানের মালিক। তাকে বলে আসিস, আমার ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে।

হঠাৎ কর্তা-মার ঝি-র গলার আর্তনাদ শোনা গেল। যেন সে কেঁদে উঠেছে কোনও অবধারিত আতঙ্কে। গিরিধারী হাঁফাতে হাঁফাতে এসে লোকনাথের কাছে দাঁড়ালো। কথা বলতে যেন তার গলা বন্ধ হয়ে আসছে।

লোকনাথ তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—কী হলো গিরিধারীদা, কর্তা-মা মারা গেছেন ?

গিরিধারী এ-কথার উত্তরে ভেঙে পড়লো লোকনাথের সামনেই।

লোকনাথ বললে—যাই ভাই, চারদিকের দুঃখের খবরের মধ্যে এই আমার গিরিধারীদাই একটা সুখের খবর দিলে যা'হোক। যাই, এখন আবার শ্মশানে যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে—চলি—

বলে লোকনাথ আমার কাছে বিদায় নিয়ে বসুমতী দেবীর শোবার ঘরের দিকে চলে গেল।

কার্তিক রায়ের বাড়িতে এইটে হলো চতুর্থ মৃত্যু। বাড়িটা যেন সেই অতীতের সমস্ত মৃত্যুর বোঝা বয়ে বয়ে বড় বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই এবার সে বসুমতী দেবীর মৃত্যুতে আর একটুও কাঁদলো না। শুধু স্তব্ধ-বিস্ময়ে চুপ করে এক জায়গায় স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে দম ফেলতে লাগলো।

কোথা দিয়ে যেন সব কী হয়ে গেল। বেশ যুদ্ধ চলছিল ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে। পৃথিবীর মানুষ আশা করে এক, ঘটে অন্যরকম। এক-একটা দল এদেশ থেকে ওদেশে গিয়ে বোমা ফেলে আসতো। সে দেশে সাইরেন বাজতো, লোকগুলো ট্রেঞ্চের তলায়, ব্যাফল-ওয়ালের আড়ালে লুকোত। আবার অল-ক্লিয়ার সিগ্‌ন্যাল বাজলেই সবাই পিল-পিল করে বাইরে বেরোত।

হিরোশিমার ওপরেও সেদিন সকাল সাড়ে সাতটার সময় তেমনি তিনটে প্লেনকে দেখা গেল। সাইরেন বেজে উঠলো। না, ওটা

কিছু নয়। খানিক পরেই অল-ক্লিয়ার বেজে উঠলো। ঘড়িতে তখন সকাল সাতটা একত্রিশ—

তিনটে প্লেন উড়ে চলেছে ঠিক ওই দিকেই। রেডিও টেবিলের ওপর উঠে বসলো পল টিবেট্স্। মিলিটারি কোড-এ খবর দেওয়া-নেওয়া চললো। আর পেছনে আর একটা প্লেনে আছে মেজর সুইনী, আর ও-পাশে নম্বর বি-৯১।

সাতটা পঞ্চাশ।

রেডিয়োতে হুকুম চেয়ে নিতে হলো। প্যাসিফিক-এর ওপর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে এখন চলেছি। আমরা তিনজন। ওয়েদার খুব ভালো। নিচেয় সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—জানাও, এবার কোন্‌দিকে যাবো ?

উত্তর : হিরোশিমা !

ঘড়িতে তখন সকাল সাতটা পঞ্চান্ন।

ছ'মাস। ছ'মাস ধরে অপেক্ষা করেছে ওরা। জাপানের ওপর অ্যাটম-বোমা ফেলা হবে কি হবে না ! ছ'মাস সময় দেওয়া হয়েছে তাকে ভাববার। কিন্তু এবার ইউনাইটেড স্টেট্স-এর সর্বময় কর্তা হুকুম দিয়ে বসে আছেন। হ্যাঁ, বোমা পড়বে।

কলকাতা শহরেও তখন দিন আসে, দিন যায়। রাত আসে, রাত যায়। সাউথ ইস্ট এশিয়ার কম্যাণ্ডের হেড-কোয়ার্টার তখন কলকাতা। হিরোশিমায় যখন সকাল আটটা বেজে ষোল, তখন সেই অশুভ মুহূর্তে অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টার সন্তোষ রায়ের বাড়িতে তার একটি সন্তান হলো।

একদিকে যখন পৃথিবীর ইতিহাসের চরমতম ঘটনাটি ঘটে গেছে, ঠিক তখনই পৃথিবীর আর এক প্রান্তে, সাউথ-ইস্ট-এশিয়া কম্যাণ্ডের হেড-কোয়ার্টারে নতুন করে আর এক কালাপাহাড়ের জন্ম হলো ! তা, কালাপাহাড়ই বৈকি ! কালাপাহাড় না হলে অত দিনের কোম্পানির, অত লাভের কোম্পানির শেয়ার সমস্ত কিনা স্টাফদের বিলিয়ে দেয়। কালাপাহাড় না হলে অত বড় বংশের

ছেলে হয়ে যাদুগোপালের মত একটা নোংরা তেলেভাজার দোকানে গিয়ে বসে; মনসাতলা লেনের একটা মেসবাড়িতে গিয়ে সময় কাটায়? না কি বেলগাছিয়ায় নিমাই শা'র চায়ের দোকানে কাঠের ময়লা বেঞ্চিতে গিয়ে আড্ডা দেয়।

সিঁথির চারতলা বাড়ির ফ্ল্যাটের ভেতর দু'জন বুড়ো-বুড়ীও তাই বলে। বলে—এর চেয়ে তো সেই তখনই ভালো ছিল গো, যখন সরযূর চাকরি ছিল না—

যখন সরযূর চাকরি করে দেয়নি লোকনাথ, তখন কিন্তু সিঁথির এই বাড়িটা হয়নি। দমদম ক্যান্টনমেন্টের বস্তিতে তখন ওদের বাস। ওরা তখন দু'বেলা পেট ভরে খেতেও পেত না। লোকে বলতো—বিপিনবাবুর মেয়েই একদিন বাপকে ডোবাবে—

মেয়ে তখন সকালবেলা বাসিমুখে পান চিবোতে চিবোতে ট্রেনে চড়ে কলকাতায় চলে যেত ধান্দায়, আর ফিরতো সেই রাত কাবার করে।

বিপিনবাবু মেয়েকে কাছে ডাকতো। জিজ্ঞেস করতো—এত রাত হলো কেন মা তোর?

সরযূ বলতো—চাকরির চেষ্টা করছি বাবা—

—তা চাকরির চেষ্টা করলে কি সকাল-সকাল ফেরা যায় না?

সরযূ বলতো—সকলের পায়ে তেল দিতে দিতেই যে সময় কেটে যায় বাবা। অফিসের দরোয়ানগুলো যে ভেতরে ঢুকতেই দেয় না।

—কিছু আশা-টাশা দিচ্ছে কেউ?

—হ্যাঁ বাবা, আশা দিচ্ছে, যাদুগোপাল বলে একজন লোক আছে, সেও আমাদের ফরিদপুরের লোক, সে বলছে একটা হিল্লে করে দেবে, একজন মস্তবড় লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে বলেছে।

—মস্ত বড় লোক মানে?

—মানে তিনি একটা চিঠি লিখে দিলেই নাকি চাকরি হয়ে যায়।

—তা সে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেছিস ?

—দেখা করবো কী, তার যে দেখা পাওয়াই ভার ! সারাদিন কেবল টো-টো করে কলকাতায় রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই তো সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত ওই তেলেভাজার দোকানে বসে থাকি—অথচ যা শুনলুম তাতে মনে হলো আমরা এক কলেজে একই ক্লাশে বোধহয় পড়েছি।

বিপিনবাবু বললে—তাই নাকি ? তাহলে তো আর কিছু ভাবনা নেই—

কিন্তু তারপর একদিন মেয়ে এসে বললে—সে ভদ্রলোক চিঠি দিয়েছে বাবা—

বিপিনবাবু বললে—কাকে চিঠি দিয়েছে ? কী চিঠি ?

সরযূ বললে—তাঁর এক বন্ধুকে, নাম বিকাশ সরকার। তাঁরও নাকি চাকরি দেবার ক্ষমতা আছে—

তারপরে একদিন চাকরিও হলো সরযূর। বিপিনবাবুর স্ত্রী পাড়ার শেতলাতলার মন্দিরে পুজোও দিয়ে এলো। মেয়ের চাকরি হয়েছে সে খবরটাও রটে গেল চারদিকে। সরযূর দেখাদেখি সে-পাড়ার সব মেয়েরাই কলকাতায় ছুটোছুটি শুরু করে দিলে। সরযূর গায়ে দামী-দামী শাড়ি-ব্লাউজ উঠলো, হাতের কব্জিতে ঘড়ি, পায়ে এক-একদিন এক-এক রঙের চপ্পল। একদিন তাও ছাড়িয়ে গেল। শেষকালে আর ট্রেনে নয়। এক-একদিন রাত্রে বিরাট একটা গাড়ি এসে দাঁড়াতো বিপিনবাবুর টিনের বাড়ির সামনে। সেই গাড়ি থেকে ঝলমল করে নামতো সরযূ। কু-লোকে বলতো, সরযূর গা থেকে নাকি তখন মদের গন্ধ পাওয়া যেত !

বিপিনবাবুও এক-একদিন গন্ধ পেতেন। বিপিনবাবুর স্ত্রীও পেত।

মা শুধু বলতো—হ্যাঁ রে খুকী, তোর গা থেকে হোমোপ্যাথি ওষুধের গন্ধ বেরোচ্ছে কেন রে ?

—কই মা, আমার গা থেকে তো আতরের গন্ধ বেরোচ্ছে,

আমি তো আতর মেখেছি—

তারপরে ব্যাগ ভর্তি টাকাও আনতে লাগলো মেয়ে। একদিন পঞ্চাশ, আবার কোনওদিন একশো। আবার হয়তো তিরিশ কোনওদিন। অফিসে কি রোজ-রোজ মাইনে দেয় নাকি রে তোদের ?

মা বাবার কেমন অবাক লাগলো। কিন্তু ও নিয়ে কিছু বলতে ইচ্ছে হলো না মেয়েকে। আর যাই হোক, টাকা তো ঘরে আসছে।

এমনি করেই চলছিল।

একদিন হঠাৎ মেয়ে বাড়ি এসে বললে—মা, একটা জমি কিনেছি—

—জমি কিনেছিস মানে ?

—বাড়ি করবার জমি। সেই জমির ওপর আমাদের বাড়ি হবে।

বিপিনবাবু তামাক খেতে খেতে হুঁকোটা মুখ থেকে নামিয়ে নিলেন। মেয়ের কথাগুলো শুনে মাথাটা কেমন ঘুরে গিয়েছিল।

বললেন—বাড়ি যে করবি, সে টাকা কে দেবে ?

সরযূ বললে—কেন, আমি টাকা দেব !

—কত টাকা লাগবে বাড়ি করতে তা জানিস ?

সরযূ বললে—চারতলা বাড়ি, আটাশখানা ঘর, আটটা ফ্ল্যাট, দেড় লাখ টাকার কমে হবে না।

দেড় লাখ টাকা !! সর্বনাশের মাথায় পা।

কিন্তু তাতে সরযূ দমলো না। সত্যিই সে বাড়ি হলো একদিন। একদিন শুভতিথি শুভক্ষণ দেখে গৃহপ্রবেশও হলো। বিপিনবাবু আর তাঁর স্ত্রী এসে উঠলেন সে বাড়িতে। বাড়ি দেখে তাঁদের চোখ আকাশে উঠলো। কোথায় সেই তাঁদের ফরিদপুরের বাড়ি, আর কোথায় সেই দমদমের বস্তি, আর কোথায় এই সিঁথির চারতলা ফ্ল্যাট বাড়ি।

কিন্তু তখন সরযূ উড়তে উড়তে একবারে আকাশের বোধহয় শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল। একদিন অনেক রাত্রে যখন বাড়ি ফিরলো, তখন তার আর দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই। গাড়ির ড্রাইভার তাকে ভালো করে জড়িয়ে ধরে ফ্ল্যাটে তুলে দিয়ে গেল।

বিপিনবাবু মেয়ের দিকে চেয়ে হতবাক হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ ধরে মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করে করে যখন সে এলো, তখন যে এমন অবস্থায় ফিরবে তা তিনি কল্পনা করেননি।

সরযূ বাপ-মার দিকে চেয়ে কাঁদতে লাগলো।

মা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। বললে—এ তোর কী দশা হলো মা? এমন দশা কে করলে তোর? কেন তুই এমন সর্বনাশ করলি?

এ-সব কথার উত্তর দেবার তখন সময় বা ক্ষমতা কিছুই ছিল না সরযূর।

বিপিনবাবু বললেন—এক কাজ করো গো, তুমি ওর মাথাটা নিচু করে ধরো বেসিনের ওপর, আমি মাথার জল ঢেলে দিচ্ছি—মাথায় জল ঢাললে শুনেছি নেশা কেটে যায়—

তা তাই-ই করা হলো। বিপিনবাবু সেই রাত বারোটার সময় মেয়ের মাথায় বালতি বালতি জল ঢালতে লাগলেন। তবে সরযূ একটু সুস্থ হলো—

এ সব কতকাল আগেকার ঘটনা। কিন্তু সেই প্রথম হলেও সেই-ই শেষ নয়। তারপর কত রাত্রেই কাদের গাড়ির ড্রাইভার সরযূকে দু'হাতে ধরে নামিয়ে দিয়ে গেছে, আর তারপর কত রাত্রেই তার মাথার বালতি-বালতি জল ঢালতে হয়েছে। সে-সব এতদিনে গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে বিপিনবাবু আর তাঁর স্ত্রীর। গা-সওয়া হওয়ার কারণ চারতলা বাড়ি, আর সে বাড়ির ছাদ দিয়ে বর্ষার জল না-পড়া। আরও কারণ, বিপিনবাবুর ইচ্ছেমত বাজার থেকে মাছ-মাংস-দই-রাবড়ি কেনবার ক্ষমতা পাওয়া। সেও কি

কম! আর কম নয় বলেই বিপিনবাবু ছাতাটা নিয়ে বুক ফুলিয়ে রাস্তায় বেরোন। ষোল টাকা কিলোর একটা আস্ত ইলিশ মাছ হাতে ঝুলিয়ে রিকশা করে বাড়ি ফেরেন। পঁচিশ টাকা জোড়া দামের জুতো পরে মশ-মশ করে রাস্তায় হাঁটেন, আবার কখনও বা গিন্নীকে নিয়ে ট্যাক্সি চড়ে সিনেমা দেখতে যান।

কিন্তু হঠাৎ সেদিন থানা থেকে লোক এল।

—বিপিনবাবু বাড়ি আছেন? বিপিনচন্দ্র সিকদার?

বিপিনবাবু বেরিয়ে এলেন। বললেন—হ্যাঁ আমি। আমার নাম বিপিনচন্দ্র সিকদার? কী দরকার?

—আমি থানা থেকে আসছি। থানার বড়বাবু আমাকে পাঠিয়েছে, আপনাকে এক্ষুনি একবার বড়বাবুর সঙ্গে থানায় দেখা করবার হুকুম দিয়েছেন—

বিপিনবাবুর বুকটা কেঁপে উঠলো। বললেন—কেন থানায় যাবো কেন? আমি কী করেছি?

—তা জানি না, আপনাকে এক্ষুনি যেতে হবে—

বিকাশ সরকার কয়েকদিন পরেই আমাকে টেলিফোন করেছে। ভাবলাম, হয়ত লোকনাথের খবরটা আমাকে জানাবে। ভেবেছে লোকনাথের দিদিমা বসুমতী দেবীর মৃত্যু-সংবাদটা আমি জানি না।

বিকাশের গলা শুনেই বললাম—বসুমতী দেবী মারা গেছেন, আমি জানি রে।

বিকাশ অবাক হয়ে গেল। বললে—তুই কী করে জানলি? এখনও তো কাগজে খবরটা বেরোয়নি—

সমস্ত ব্যাপারটা বললাম। বিকাশ বললে—কিন্তু অন্য একটা খবর বেরিয়েছে, দেখেছিস? ডাক্তার বেয়ার্ড, চোখের ডাক্তার, কলকাতায় এসেছে, সেই খবর?

বিকাশের কথাতেই খবরের কাগজ খুলে দেখলাম। অনেক খুঁজে পেলাম খবরটা। পেছনের পাতার এক কোণে খবরটা বেরিয়েছে। ডাক্তার বেয়ার্ড নামে বিখ্যাত চোখের সার্জেন এক বড়লোক মারোয়াড়ী ভদ্রলোকের চোখ অপারেশন করতে ইণ্ডিয়ায় এসেছেন। তিনি ভদ্রলোকের অপারেশনের পর কলকাতা ছেড়ে স্বদেশে ফিরে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস-এর এক্স-ম্যানেজিং ডাইরেক্টর লোকনাথ রায় তাঁর নিজের মেয়ের চোখ অপারেশনের জন্যে তাঁকে আরো ছ'দিন কলকাতায় থাকতে রাজী করিয়েছেন।

খবরটা ছোট। এ খবর কেউ পড়ুক, এটাও বোধহয় খবরের কাগজের সম্পাদক চাননি। খবরের মধ্যে যে ভুল তথ্যটুকু আছে, তা সংশোধন করবার মত গুরুত্বও দেয়নি কাগজের সংবাদ-সম্পাদক। মনে হলো, নিশ্চয় এর মধ্যে কোনও গোলমাল আছে।

বিকাশ বললে—লোকনাথের আবার মেয়ে কবে হলো বল্ দিকিনি! ওর তো বিয়েও হয়নি—

কথাটা ভাববার মত। এ সম্বন্ধে কার কাছেই বা খবর নেওয়া যায়! বসুমতী দেবীর মৃত্যুর পর আর কোনও খবর নেওয়া হয়নি। আর খবর নেবই বা কার কাছে! লোকনাথ কি বাড়িতে থাকে! বাড়িতে থাকার মত ছেলেও তো সে নয়। কোথায় প্যারাগন সিনেমার পেছনে কোন্ এক যাদুগোপালের তেলেভাজার দোকান আছে, সেখানে যেতেও তো ঘেন্না হয়। যা নোংরা দোকান। আর নয়তো যেতে হয় সেই মনসাতলা লেনের কোন্ এক মেসবাড়িতে। আর নয়তো বেলগাছিয়ায়।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম—কেন, তুই যাকে চাকরি করে দিয়েছিলি সেই মেয়েটা? মিস্ সিকদার, না কী নাম! তাকে জিজ্ঞেস কর না, সে হয়তো জানে!

বিকাশ বলে উঠলো—আরে সেই সরযু? সে তো কবে

চাকরি ছেড়ে দিয়েছে—

—সে কী! আজকালকার বাজারে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে? কেন? কুলোচ্ছিল না?

বিকাশ বললে—না না, আমরা ওকে তো ছ'শো টাকা করে পে দিয়েছিলাম—

—ছ'শো টাকা? ছ'শো টাকা দিচ্ছিলি? অত টাকা কেন?

বিকাশ বললে—সে ভাই পছন্দ-অপছন্দের কথা। আমাদের প্রাইভেট্-সেক্টর, মাইনে বাড়তে যেমন, আবার কমতেও তেমন, ও নিয়ে ওপর-মহলে কথা ওঠানো নিয়ম নয়—

—সামান্য লোকনাথের চিঠিতেই একেবারে ছ'শো টাকা পে?

—আরে, প্রথমেই কি ছ'শো? একশো দশ দিয়ে স্টার্ট হয়েছিল, কিন্তু যা পাকা মেয়ে, ও একেবারে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়ে আমাকে কলা দেখিয়ে দিলে। কলা দেখিয়ে এক ডাইরেক্টরের খপ্পরে গিয়ে পড়লো। তখন থেকে উন্নতি, আর তখন থেকেই পতন—

—তার মানে?

—ওর তো সেখানেও পোষালো না। লেবার লীডার কেদার সরকারকে চিনিস তো? সে তো আমাদের এ-অফিসেরও ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। সরযূ সিক্‌দার ডাইরেক্টরকে ছেড়ে তার কাঁধে চাপলো। তারপর থেকে একেবারে ইণ্ডিয়ান টপ্ গাইদের সঙ্গে মেলামেশা। শুনলুম, সে নাকি একটা চারতলা বাড়ির ওনার।

—এ-সব কী করে হলো বল্ তো?

বিকাশ সরকার বললে—যা করে আমাদের হলো, তাই করেই হলো।

বললাম—কিন্তু আমরা তো চারতলা বাড়ি দূরে থাক, একতলা বাড়িও তো করতে পারিনি।

—পারিনি, কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা পুরুষ মানুষ হয়ে জন্মেছি, এ-যুগে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালে আমাদেরও ও-রকম চারতলা-পাঁচতলা বাড়ি হওয়া আটকাতো না—

বলে বিকাশ নিজেই হো-হো করে হেসে উঠলো। তারপর বললে—ঠিক আছে, পরে আবার কথা হবে—

আমি বললাম—যদি সম্ভব হয় লোকনাথের মেয়ের চোখ অপারেশনের খবরটা নিস তো একবার—

কথাটা বিকাশকে বললাম বটে। কিন্তু খবরের কাগজটা পড়ার পর থেকে ভাবনার আর শেষ রইলো না। এ কেমন করে হলো? হলে তো তার দিদিমা বসুমতী দেবী জানতে পারতেন? কারো-না-কারো কাছে আমরাও শুনতে পেতাম! লোকনাথকে আমরা সেই ছাত্রজীবন থেকে দেখে আসছি। প্রথম জীবনে সে আমাদের সঙ্গে মিশতো না, আমরা তার তুলনায় ছোট বলে। আর শেষ জীবনে সে আমাদের সঙ্গে মিশতো না, আমরা বড়লোক বলে। আসলে বড়লোক যে আমরা কীসে, তা আমরা বুঝতে পারতাম না। ঘটনাচক্রে অনেক তেল খরচ এবং অনেক তদ্‌বির করে আমরা টেরিলিন-টেরিকট্ পরে হাতে সিগ্রেটের টিন নিয়ে আর গাড়ি চড়ে ওপর-তলার মানুষ হিসেবে ঘোরাফেরা করি। বাইরে আমাদের চাকরির খাতিরে শো বজায় রাখতে হয় বলে আমরা অন্যলোকের চোখে বিত্তবান। কিন্তু আমরা নিজেরা জানি, আমরা কী! আমাদের ক্লায়েন্টের পয়সায় ড্রিঙ্ক করে প্রতিদানে পার্টিকে কিছু কনট্রাক্ট পাইয়ে দিই বলে আমরা বিনাখরচে আধুনিক হবার গৌরব অর্জন করি। তাই লোকনাথের মত ছেলের কাছে আমরাও বর্জনীয়। তাই আমরা যখন অফিসের গাড়ি চড়ে সকলকে ছোট মনে করতাম, যখন পার্টির পয়সায় চৌরঙ্গী আর পার্ক স্ট্রীটের এয়ার-কনডিশনড্ বার-এ বসে ড্রিঙ্ক করতে করতে টালিগঞ্জ বেহালা আর বেলেঘাটার কথা বেমালুম ভুলে যেতাম, তখন লোকনাথ আমাদেরই ছোট মনে করতো, আর টালিগঞ্জ বেলগাছিয়া

বেলেঘাটার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সেখানকার লোকের সঙ্গে একাকার হতে চাইতো।

পরে শুনেছি ডাক্তার বেয়ার্ডও নাকি বকুলকে দেখে প্রথমে জিজ্ঞেস করেছিলেন—কিন্তু এ গার্ল তোমার কে?

লোকনাথ বলেছিল—ধরে নিন, আমার মেয়ে। কিম্বা আমার মেয়ের চেয়েও বড়।

—তার মানে? মেয়ের চেয়ে বড় মানে কী?

লোকনাথ স্বীকার করলে—না ডক্টর, আমি নিজে আন্‌ম্যারেড, আমার কী করে মেয়ে হবে?

—তবে এ কে? এর ফাদার কে?

লোকনাথ বললে—এর ফাদার আছে। তার নাম অজয় সরকার।

—তার সঙ্গে তোমার কী রিলেশন?

—নো রিলেশন্‌শিপ! কোনও আত্মীয়তা নেই।

ডাক্তার বেয়ার্ড ইন্টারন্যাশন্যাল খ্যাতির ডাক্তার। চোখের অপারেশনের জন্যে তাঁকে সারা পৃথিবী ঘুরতে হয়। পৃথিবীর সব জায়গায় তাঁর গতিবিধি। প্রথমে দেখাই করতে চাননি লোকনাথের সঙ্গে। হোটেলের রিসেপ্‌শনিস্ট টেলিফোন করতে তিনি বললেন—আমার সময় নেই, আমি এখনই ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি—

কিন্তু লোকনাথ হতাশ হলো না।

জানালো—আমি শুধু আপনার পাঁচ মিনিট সময় নেব—

শেষ পর্যন্ত রাজী হলো সাহেব। বললে—অল্‌ রাইট্‌, কাম্‌ টু মাই রুম—

ঘরে যাবার পর সব শুনে সাহেব বললে—এ কে? দিস গার্ল?

লোকনাথ বললে—মনে করুন, কেউ না। কেউ নেই এর। আমিও এর কেউ নই। পৃথিবীতে সকলের সবাই থাকে না।

সাহেব চটে গেল। বললে—ওয়েল, আমার তো এত কথার উত্তর দেবার সময় নেই, আমি এখুনি ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে যাবো,

চার ঘণ্টা পরে আমার প্লেন ছাড়বে এয়ারপোর্ট থেকে—

লোকনাথ সাহেবের সামনে হাতজোড় করলে—এই গার্লের চোখটা আপনি দয়া করে অপারেশান করে দিন, এর জন্যে আমি আপনার কাছে সারাজীবন গ্রেটফুল থাকবো—

ডাক্তার বেয়ার্ড বললে—আমার সময় কোথায় ?

—আপনি সময় করে নিন্! এই ব্লাইণ্ড গার্লের জন্যে একটু সময় করে নিন্ আপনি !

—কিন্তু সারা ওয়ার্লডে অনেক ব্লাইণ্ড পার্সন যে আমার জন্যে ওয়েট করে আছে। আমি এখান থেকে যাবো নাইরোবি, সেখান থেকে অপারেশান সেরে যাবো লেবানন, তারপর ফিরে আসবো হংকং-এ, তারপর যাবো টোকিওতে—টোকিওতে থাকবো তিনদিন—

সাহেবকে অনেক দূর পাড়ি দিতে হবে। অনেক প্রোগ্রাম তাঁর। পৃথিবীর সমস্ত লোকের আলো চাই। সবাই আলো চায়। আমরা সবাই অপেক্ষা করে আছি আলোর জন্যে। আমাদের আলো দাও, আলো। সিধু ওস্তাগর লেনের অন্ধ মেয়েটার মত আমরা সবাই আলোওয়ালার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছি। আলোওয়ালার আলো জ্বালাতে দেরি হলে বকুল রাগ করবে, অভিমান করবে। কিন্তু এই বকুলেরও তো আলো দরকার। এ মেয়েটা গরীব বলে কি এ চিরকাল অন্ধকারের মধ্যেই আত্মহননের উপায় আবিষ্কারে ব্যস্ত থাকবে ?

ডাক্তার বেয়ার্ড বড় ব্যস্ত মানুষ। কলকাতার ধনী মারোয়াড়ী ভদ্রলোক তাঁর পেশেণ্ট। ভদ্রলোকের অনেক মিল, অনেক ফ্যাক্টরি, অনেক টাকা। তাঁর টাকা দিয়ে তিনি কলকাতার সমস্ত মানুষকে কিনতে পারেন। তিনি বড় হয়ে জন্মেছিলেন, তারপর নিজের চেষ্টায় আরো বড়লোক হয়েছেন। কিন্তু ছোটর চেয়েও যেমন ছোট আছে, তেমনি বড়র চেয়ে তো আরো বড় আছে। আরো বড়র দিকে তিনি যদি হাত বাড়াতে চান, তো কে তাঁকে আটকাবে ?

তিনি বিদেশ থেকে ডাক্তার এনেছেন, অনেক টাকা খরচ করে তাঁকে দিয়ে চোখ অপারেশান করিয়েছেন। উদ্দেশ্য আরো ভোগ, আরো যোগ, আরো জীবন, আরো যৌবন, আরো ফ্যাক্টরি, আরো মিল, আরো স্লেভ্। কিন্তু এ তো তা নয়, এই বকুল। এ শুধু চোখ মেলে দেখতে চায়, দেখতে চায় আকাশ, দেখতে চায় এ কোন্ দেশ, এ কেমন পৃথিবী। যে-পৃথিবীর মাটিতে সে নিঃশ্বাস ফেলে, দেখতে চায় সেই মাটির রঙ, যে-ফুলের গন্ধ সে পায়, দেখতে চায় সে ফুলের চেহারা কেমন। চোখ মেলে দেখতে চায় সেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে, যা তাকে সৃষ্টি করেছে। আর দেখতে চায় তাকে, সেই কালিকাপ্রসাদকে, ছাপ্‌রা জেলার কালিকাপ্রসাদ ঝা'কে, যে রোজ তার বাড়ির সামনে এসে আলো জ্বালিয়ে দেয়।

—কিন্তু আপনি? এর জন্যে আপনার এত মাথা-ব্যথা কেন?

লোকনাথ বললে—আমি? আমিও তো অন্ধ ডক্টর। আমিও তো ব্লাইণ্ড। আমিও এই পৃথিবীতে জন্মাবার পর থেকেই দেখছি, আমরা সবাই অন্ধ। কেউ আলো দেখতে পায় না। সবাই ভাবে তারা আলো দেখতে পাচ্ছে। একটা ভালো চাকরি পেলে, কিম্বা একটা বাড়ি কি গাড়ি পেলেই তারা ভাবছে, তাদের চোখ আছে। কিন্তু চোখ থাকলেই কি দেখা অত সহজ ডক্টর? টাকাই তাদের কাছে চোখ, টাকাই তাদের দৃষ্টি, টাকাই তাদের দর্শন। কিন্তু তারা জানতেও পারে না যে তারা অন্ধ। তারা অন্ধ বলেই বুঝতে পারে না যে, তারা যা দেখছে তা সম্পূর্ণ দেখা নয়, আংশিক দেখা। অংশকে দেখে তারা পূর্ণকে দেখবার ভান করে। তাই তাদের সব দেখা ভুল দেখা। আমি সেই দৃষ্টি চাই যা পেলে দৃষ্টির আড়ালের দৃশ্যকেও দেখতে পাবো—

ডাক্তার বেয়ার্ড এতক্ষণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন লোকনাথকে।

জিজ্ঞেস করলেন—হঠাৎ তোমার এ-সব কথা মনে এলো কেন?

এমন তো হয় না।

লোকনাথ বললে—ডক্টর, মনে এলো একটা বই পড়ে—

—বই? কী বই?

—হিরোশিমার ওপরে বোমা ফেলা নিয়ে একটা বই। বইটা পাব্‌লিশাররা আউট্‌-অব-প্রিন্ট করে দিয়েছে। আর ছাপা হচ্ছে না, হয়ত হবেও না—

—কেন, আর ছাপা হচ্ছে না কেন?

লোকনাথ বললে—কী জানি, তবে মনে হয়, ভয়ে।

—কীসের ভয়?

—ভয় এই যে, সেই বই পড়লে আজকের জেনারেশন্‌ জানতে পারবে, পৃথিবীর মানুষের চোখ থেকে আলো নেভার জন্যে কারা দায়ী। ট্রুম্যান, চার্চিল আর স্ট্যালিনের ওপর তাদের ঘেন্না হবে!

ডাক্তার বেয়ার্ড কিছু উত্তর দিলেন না। এক অদ্ভুত ইয়াংম্যানের সামনে বসে যেন নতুন জেনারেশানের অশান্তির কারণটা কিছু বুঝলেন।

বললেন—ঠিক আছে, আমি এখনই আমার যাওয়া ক্যান্‌সেল করে দিচ্ছি, কিন্তু আমার চার্জ তুমি দিতে পারবে? আমার ফিস্‌ থ্রি থাউজ্যান্‌ড ডলার্স—

লোকনাথ বললে—দেব। আপনি যা চাইবেন তা-ই দেব—

—ঠিক আছে, আজকেই ব্যবস্থা করছি, তুমি পেশেন্টকে নিয়ে পি-জি-হস্‌পিট্যালে ডাক্তার সিন্‌হার কাছে চলে যাও, আমি টেলিফোন্‌ করে দিচ্ছি, হি উইল্‌ অ্যারেঞ্জ এভরিথিং—

—থ্যাঙ্কিউ, ডক্টর—

বলে লোকনাথ উঠলো।

পঁচাত্তর

সিঁথি থানার ও-সির টেবিলের ওপরকার টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো।

—হ্যাল্লো। ও-সি স্পিকিং—

লালবাজার পুলিশ-হেডকোয়াটার্সের টেলিফোন। অত্যন্ত জরুরী। আরজেণ্ট।

—ইয়েস স্যার!

—মিস সিকদার কি আপনার লক্-আপ-এ আটক আছে নাকি?

একেবারে খোদ কর্তার গলা। আই-জির গলা।

—হ্যাঁ স্যার, মিস সিক্দার আমার থানাতেই আটক আছে, স্যার।

—তাঁকে এখ্খুনি ছেড়ে দিন, ইমিডিয়েটলি।

—ভেরি গুড স্যার, অল্ রাইট স্যার—

বলেই হঠাৎ আবার একটা কথা মনে পড়লো।

—স্যার, আমি তার ফাদারকে এখ্খুনি ডিউটিকে দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলাম স্টেট্মেণ্ট নেবার জন্যে, তিনি এলে কী বলবো?

—ডেকে ভালোই করেছেন, তাঁর হাতেই মেয়েকে তু... দিন। একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবেন, যেন কারো ইজ্জৎ নষ্ট না হয়, দেখবেন—

বলে আই-জি রিসিভারটা রেখে দিলেন।

এদিকে সিঁথি থানার ও-সিও রিসিভারটা রেখে দিলে। রেখে দিলে বটে, কিন্তু চাকরিতে ঘেন্না ধরে গেল তাঁর। ইণ্টারন্যাশন্যাল স্মাগলিং ধরবার ব্যাপারে যেখানে তাঁর রিওয়ার্ড পাবার কথা, সেখানে নিজের থুথু নিজেই গিলতে হবে। পুলিস অফিসার হয়ে এর চেয়ে বড় লজ্জা আর কিছু নেই। ছি ছি নিজেরই ওপর লজ্জা হলো ও-সি'র। স্টাফের কাছে মুখ দেখাতেও

লজ্জা হলো। এস-আই ব্যানার্জিকে ডাকলে—ব্যানার্জি, লক্-আপ্ খুলে আসামীকে রিলিজ করে দিন—

—কেন? এস-আই ব্যানার্জি চম্‌কে উঠলো।

—আই-জি'র অর্ডার। এখ্‌খুনি টেলিফোন এসেছিল।

—আর আসামীর বাবাকে যে ডেকে পাঠানো হয়েছে স্টেট্‌মেণ্ট নেবার জন্যে?

—তাঁকে আদর আপ্যায়ন করে বসিয়ে সন্দেশ-রসগোল্লা পান-সিগারেট খাওয়াবার হুকুম হয়েছে!

—বলেন কী স্যার?

—আর বলি কী! এবার চাকরি ছেড়ে হিমালয়ে চলে যেতে হবে দেখছি। এর পর যখন ওয়াগন-ব্রেকারদের ধরতে পারা যাবে না, তখন কিন্তু লম্বা কড়া নোট আসবে হেড-কোয়ার্টাস থেকে।

এস-আই ব্যানার্জি যে কেসটা ছ'মাস ধরে জাল পেতে ধরেছিল, সে ধপাস্ করে বসে পড়লো চেয়ারটার ওপর! বললে—এর চেয়ে তো স্যার ঘুষ নেওয়া ভালো ছিল আমাদের শশী দাসের মত। এতদিনে বালিগঞ্জে দু'খানা বাড়ি করে ফেলা যেত। এ দেখছি সেই বদনামও হলো, অথচ ওপর থেকে বকুনি। কিন্তু কেন এমন হলো স্যার? আই-জি তো এমন করেন নি কখনও—

ও-সি বললে—আরে, আই-জি কী করবে। আই জি'র বাবা যে পেছনে আছে—

—আই-জি'র বাবা?

—হ্যাঁ, হোম-মিনিস্টার নিজে টেলিফোন করে দিয়েছে আই-জি'কে। এখন যান, রিলিজ করে দিন আসামীকে।

হেড্-কনস্টেবল-এর সঙ্গে বিপিন সিক্‌দার মশাই তখন থানাতে ঢুকলেন, ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। যেন হাড়িকাঠে বলি দেবার জন্যে একটা পাঁঠাকে কালীমন্দিরে আনা হয়েছে। কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি, কী তাঁর অপরাধ।

তিনি অফিসে ঢুকতেই থানা অফিসার দাঁড়িয়ে উঠলেন।

—বসুন, বসুন, মিস্টার সিকদার।

বিপিন সিকদার মশাই তো অবাক। আমি কী এমন পুণ্য করেছি যে পুলিস আমার এত খাতির করতে শুরু করেছে!

তিনি চেয়ারে বসলেন। কিন্তু বসেও স্বস্তি পেলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—আমাকে ডেকেছিলেন আপনি?

ও-সি বললেন—আপনার মেয়েকে—মিস সিকদারকে আজ ধরে এনে আমাদের হেফাজতে রাখা হয়েছিল: তাঁকে আপনার কাছে হ্যাণ্ড-ওভার করে দেব এখনই—

—আমার মেয়ে? সরযূ? কেন? সে এখানে এলো কী করে?

ও-সি বললেন—সে অনেক কথা বিপিনবাবু, আপনার মেয়ের কাছেই সব শুনবেন। একদল অ্যান্টি-সোস্যাল এলিমেণ্ট তাকে খুন করে ফেলতো, যদি আমরা তাকে না উদ্ধার করে আমাদের হেফাজতে আনতাম—

—তার মানে?

ততক্ষণে সরযূ সিকদার শাড়িতে সিল্কে গয়নার সান-গ্লাসে ঝল্‌মল্‌ করতে করতে এসে হাজির হলো বাবার সামনে।

বললে—কই, একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলেন না?

ওদিকে দিল্লীতে কলকাতাতে বোম্বাইতে তখন ট্রাঙ্ক-কল চালাচালি চলছে। এ চাইছে তাকে, আবার সে চাইছে ওকে। সব পি-পি আর্জেণ্ট কল। এক্সপ্রেস। এখনি দিতে হবে। ভেরি ভেরি আর্জেণ্ট। ইয়েস্‌, সি থি লক-আপ। নো, মিনিস্ট্রি ফল করিয়ে দেব। ইমিডিয়েটলি রিলিজ করতে হবে। কিন্তু হোয়াই, কেন আমার লোককে অ্যারেস্ট করা হবে? আমি এখনি জুট-মিলে স্ট্রাইক-কল করবো। তাতে আমার কোনও ক্ষতি নেই, ক্ষতি ইণ্ডিয়ার। ফরেন এক্সচেঞ্জ নষ্ট হবে ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের। নো, না, আমি এখুনি রিলিজ চাই। আন-কনডিশনাল রিলিজ! এর আগে

কত গোলড স্মাগ্লারকে আপনারা রিলিজ করে দেননি? তাহলে সি-বি-আই বড়, না ইণ্ডিয়ার হোম মিনিস্ট্রি বড়? আমি জানি কার-কার টাকা সুইস-ব্যাঙ্কে জমা আছে। শুধু আমি নই, হোম-মিনিস্ট্রিও জানে। যাদের-যাদের ফরেন-ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে, তাদের সব্বাই টাকা রেখেছে সুইস ব্যাঙ্কে। একশো সাতষট্টিজন ইনড্রাসট্রিয়ালিস্ট সেই দলের মধ্যে আছে, কই, তাদের কাউকে তো সি-বি-আই ধরছে না……

হঠাৎ চারদিকে লাল আলো জ্বলে উঠতেই সব শান্ত। অপারেশন থিয়েটারে অ্যাপ্রন পরে ঢুকেছেন ডাক্তার বেয়ার্ড। ক্যালকাটাতে এইটেই তাঁর দ্বিতীয় অপারেশন। খবরের কাগজে খবরটা আগেই ছাপা হয়ে গেছে। অনেকে দেখতে এসেছে, অনেকে শুধু ডাক্তারের চেহারাটাই দেখতে এসেছে। ইণ্টার-ন্যাশনাল খ্যাতির মানুষ। যে-দেশ থেকে তিনজন মানুষ বোমা ফেলতে বেরিয়েছে, বেরিয়ে হিরোশিমার দিকে গেছে, আবার সেই দেশেরই আর একজন মানুষ এই অপারেশন থিয়েটারে ঢুকেছে। সঙ্গে আছে ডাক্তার সিন্হা। আছে আরো কয়েকজন নার্স।

কেদার সরকার তখনও ট্রাঙ্ক-কলে কথা বলে চলেছে—আপনি তো জানেন, আমরা হরতাল ডাকলে কারো সাধ্যি নেই সে-হরতাল আটকায়?

দিল্লীর ট্রাঙ্ক-লাইনে বড় নরম সুর। বলে উঠলো—না, না, দয়া করে স্ট্রাইক ডাকবেন না মিস্টার সরকার।

কেদার সরকার বললে—কিন্তু না-ডেকে উপায় কী বলুন, আপনারা হঠাৎ আমাদের না-বলে-কয়ে আমাদের পার্টি-ওয়ার্কারকে অ্যারেস্ট করবেন, এর পর হরতাল ডাকা ছাড়া আর কী করতে পারি বলুন।

—কিন্তু হরতাল ডেকে কার লাভ? সাধারণ গরীব মানুষেরই তো ক্ষতি।

—দেখুন, গরীব লোকের লাভ-ক্ষতির কথা আপনাদের মুখ থেকে আমরা শুনতে নারাজ, এ-কথা আপনাদের মুখে শোভাও পায় না।

—সে-যাই হোক, আমি তো ওয়েস্ট-বেঙ্গলের হোম-সেক্রেটারিকে অর্ডার দিয়ে দিয়েছি।

—কী অর্ডার দিয়েছেন?

—আপনি খবর নিলেই জানতে পারবেন। মিস্ সিকদারকে ইমিডিয়েটলি ছেড়ে দিতে বলেছি। তাহলে হরতাল সম্বন্ধে কী ডিসিশন নেবেন?

কেদার সরকার বলে উঠলো—দেখুন, মিস্ সিকদারের সঙ্গে দেখা না করে আমরা এ-সম্বন্ধে কোনও ডিসিশনই নিতে পারি না—

বলে টেলিফোন-রিসিভারটা রেখে দিলে।

সঙ্গে সঙ্গে লাল আলোটা নিভে গেল। অপারেশন-থিয়েটারের সদর-দরজা খুলে যেতেই ডাক্তার বেয়ার্ড বেরিয়ে এলেন। এবারে সবাই আলো দেখতে পাবে। আর কারো ভয় নেই। ডাক্তার বেয়ার্ড অ্যাপ্রন খুলে আবার তাঁর স্বাভাবিক পোশাক পরে নিয়েছেন। তারপর হাসপাতালের পোর্টিকোতে গাড়ি এসে দাঁড়াতেই তাতে উঠে পড়লেন।

—বললেন—হোটেল—

অটো-ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস-এর মালিকের অতদিনকার আদি বাড়ি। সে-কালে কার্তিক রায় অনেক শখ্ করে বাড়িটা করিয়েছিলেন। সাহেব-কোম্পানির কন্ট্রাক্টার দিয়ে তৈরি করানো বাড়ি। বসুমতী দেবী নিজে দেখতে আসতেন, তদ্বির-তদারক করতে আসতেন।

তারপর এই বাড়িতেই কার্তিক রায় মারা গেছেন। শুধু কার্তিক রায় নয়, একে-একে অনেকেই মারা গেছেন এ-বাড়িতে। এইখানেই বিলেত থেকে সন্তোষ রায়ের মৃতদেহ এসে উঠেছে। আর তারপর লোকনাথের মা। কার্তিক রায়ের একমাত্র সন্তান। আর সকলের শেষ মৃত্যু—বসুমতী দেবীর মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যু হয়েছে কি এখানে শুধু এই চারজনেরই? আরো কত মহাপুরুষের মৃত্যু হয়েছে এখানে। এখানেই যিশুখৃষ্টের মৃত্যু হয়েছে, বুদ্ধদেব, মহাত্মা গান্ধী, সক্রেটিস, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, মতিলাল নেহরু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বোস—সকলের মৃত্যু হয়েছে এখানে। সকলের মাথায় জুতো মেরে পা দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে লোকনাথ। ভেঙে-চুরে তচ্‌নচ্‌ করে দিয়েছে তাঁদের সকলকে।

সেই, সেই বাড়িটারই আজ অন্যরকম চেহারা হয়ে গেছে। বাইরের দেয়ালের জায়গায়-জায়গায় সিমেন্ট বালি খসে পড়ছে। আগে প্রতি বছর দুবার করে সারানো হতো। বসুমতী দেবীর আমল থেকেই সে-সব উঠে গেছে। যিনি বাড়িটা বাঁধা রাখতে রাজী হয়েছিলেন, তিনি এসে ঘুরে-ফিরে সব দেখলেন।

বেশ পছন্দ হলো বলে মনে হলো।

ভদ্রলোক কারবারী। সিনেমার সঙ্গে জড়িত। হিন্দী ফিল্ম আনেন আর দেখান। কিন্তু লাভের অংশটা আর সিনেমায় খাটান না। সেটার বেশীর ভাগ লাগান লোহা আর ইস্পাতের শেয়ারে। ফাট্‌কাও খেলেন। আবার ছোটখাটো স্থাবর সম্পত্তি সস্তায় পেলে মর্টগেজও রাখেন মোটা সুদের বিনিময়ে।

বললেন—মেটিরিয়ালগুলো সবই ফার্স্ট ক্লাস—

লোকনাথ বললে—আমি সে-সব চিনি না, কোন্‌টা ফার্স্ট ক্লাস মেটিরিয়্যাল, কোনটা থার্ড ক্লাস, সে-সব চিনি না, চিনতে চাইও না—আমার টাকার বিশেষ দরকার, তাই আপনার কাছে মর্টগেজ রাখছি—ব্যাঙ্ক তো দেবে না।

—আপনার হঠাৎ টাকার দরকার হলোই বা কেন?

—হঠাৎই দরকার আজ রাত্রের মধ্যে। রাত দশটার মধ্যে।

—সে কী! ফাট্‌কা খেলবেন নাকি? আমাদের ও-রকম টাকার দরকার হয় মাঝে-মাঝে, তখন হুণ্ডিতেই মাসে দশ পার্সেণ্ট সুদে টাকা নিতে হয়—

লোকনাথ বললে—আপনি যা সুদ চাইবেন দেব, আমার টাকাটা এখ্‌খুনি দরকার—

—কিন্তু একটা কথা। আমার কিছু দু' নম্বর টাকা আছে!

লোকনাথ বুঝতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে—দু' নম্বর মানে?

—দু' নম্বর মানে ব্ল্যাক্।

লোকনাথ বললে—আমি ব্ল্যাক-ফ্ল্যাক্ বুঝি না, আমার এখ্‌খুনি টাকা চাই, যত সুদ লাগে কেটে নেবেন—

সেই কথাই পাকা হয়ে গেল। দলিল ছিল সঙ্গে। সেই সব কিছু নিয়ে সোজা পার্টির অফিসে যেতে হলো। হিন্দী ফিল্মের ব্যবসা। সিনেমা-হাউসও আছে। সামনে দলিল লেখা হলো। ভদ্রলোক বললেন—আমাদের কারবারে যে নিয়ম চালু আছে, সেই নিয়মই রাখলুম, এই দেখুন, আপনাকে আমি দিচ্ছি তিরিশ হাজার, কিন্তু লেখা রইলো চল্লিশ—

লোকনাথ স্ট্যাম্পের ওপর সই করতে করতে বললে—সে আপনি যা ইচ্ছে লিখুন, আমার কোনও আপত্তি নেই—

দলিলে সই করে টাকাটা গুণে নিয়ে লোকনাথ উঠলো। সে তার কর্তব্য করেছে। এর বেশি আর কিছু চায় না সে। সারা কলকাতা শহর তখন মিছিলে-মিছিলে টলমল করছে। সকলের সব চাই। সকলের সব দাবি মানা চাই। সকলের সব আর্জি পেশ করা চাই। নইলে চিরকাল বিপ্লব চলবে। আর তা ছাড়া দাবি মানলেই যে বিপ্লব থামিয়ে দেব তা নয়। এই বিপ্লব এখন চললো। অনাদি, অনন্ত, অনাগতকাল ধরে চললো। এখন কাজ থাক, এখন প্রোডাকশন থাক, এখন ট্রাম বা ট্রেন-প্লেন সব থেমে থাকুক। ও-সব

পরে কোনও একদিন চললে চলতে পারে। কিন্তু এখন বিপ্লব চলুক। বলো—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক। আমাদের মৃত্যু হয় হোক, কিন্তু বিপ্লবের যেন মৃত্যু না হয়, ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

ডাক্তার বেয়ার্ড তখনও বসেছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন লোকনাথের জন্যে।

টাকাগুলো নিলেন। গুণে দেখলেন। তারপর পোর্ট-ফোলিওর মধ্যে সেগুলো রেখে দিলেন। একখানা কার্ড এগিয়ে দিলেন লোকনাথের দিকে।

বললেন—হিয়ার ইজ মাই অ্যাডড্রেস—এখানে এই ঠিকানায় আমাকে জানিও, পেশেণ্ট কেমন থাকে—

লোকনাথ উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করলে। তার তখন আর দাঁড়াবার সময় নেই। অনেক দূরে যেতে হবে তাকে। চৌরঙ্গী থেকে কোথায় উত্তর কলকাতা ছাড়িয়ে সুবার্বন মিউনিসিপ্যালিটির সিধু ওস্তাগর লেন। সেখানে ছাপরা জেলার একজন কালিকা-প্রসাদ প্রতিদিনের মত মই নিয়ে এসে আলো জ্বালিয়ে দেবে, আর তার পাশের একতলা বাড়ির জানলার ওপর বসে রাস্তার দিকে চেয়ে আনন্দে বিবশ হয়ে উঠবে। ডাকবে—আলোওয়ালা—ও আলোওয়ালা—

কিন্তু সেদিনও বকুলের চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ডাক্তার সিন্‌হা ঠিক দিনে এসে চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলে দিয়ে যাবে। অজয় আর রাণু, সেই দিনটার প্রতীক্ষায় প্রহর গোণে।

মেয়েটা বলে—মা, আমার চোখ খুলে দেবে না?

রাণু বলে—আর দুদিন সবুর করো, ডাক্তারবাবু এসে তোমার চোখের ঢাকা খুলে দেবে—

—ঢাকা খুলে নিলে আমি সব দেখতে পাবো?

—হ্যাঁ, একেবারে সব দেখতে পাবে।

—তোমাকে দেখতে পাবো?

—হ্যাঁ।

—বাবাকে ?

—হ্যাঁ, বাবাকেও দেখতে পাবে।

—কাকাবাবুকে ?

—হ্যাঁ।

—সব, সব কিছু দেখতে পাবো ?

হ্যাঁ, যেদিন পৃথিবী থেকে হিংসা চলে যাবে, যেদিন থেকে সবাই সবাইকে ভালোবাসবে, সবাই সবাই-র দুঃখে কাতর হবে, কারো বিরুদ্ধে কারো কোনও রাগ থাকবে না, যেদিন কেউ কাউকে ঠকাবে না, সেদিন তুমি সকলকে দেখতে পাবে। তোমার দৃষ্টি সেদিন স্বচ্ছ হবে, তোমার পথ তুমি নিজেই দেখে নিতে পারবে। তখন আর তোমাকে ধরে বসিয়ে দিতে হবে না।

—হ্যাঁ মা, আজকে আলোওয়ালা এসেছিল ?

—হ্যাঁ, সে তো রোজই আসে।

—আমার কথা জিজ্ঞেস করেছিল ?

—হ্যাঁ, আমি তাকে বলেছি দিদিমণির চোখে অপারেশন হয়েছে। ব্যাণ্ডেজ খুলবে যেদিন, সেদিন আবার দিদিমণিকে জানলায় বসিয়ে দেব। সেদিন সে তোমাকে দেখতে পেয়েই আবার ডাকবে—আলোওয়ালা—ও আলোওয়ালা—

তারপর রাত আরো বাড়লো। হঠাৎ সিধু ওস্তাগার লেন প্রতি রাত্রের মত মুখর হয়ে উঠলো। বোমা ফাটতে লাগলো। কালিকা-প্রসাদের অত কষ্টে জ্বালানো আলোগুলো সব ফট্-ফট্ করে নিভে গেল হঠাৎ। আর সমস্ত সিধু ওস্তাগর লেন, সমস্ত বরানগর, সমস্ত কলকাতা, সমস্ত ইণ্ডিয়া, সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল। এক নিমেষে সমস্ত মানুষ অন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সবাই ব্লাইণ্ড হয়ে গেল!

ঠিক হিরোশিমার মাথার ওপর তখন তিনটে প্লেন ঘুরে ঘুরে বোমা ফেললে—ক্লিক্—ক্লিক্—ক্লিক্—

ট্রুম্যান তখন ডিনার খাচ্ছেন। রাত আটটা, ওয়াশিংটন টাইম।

হঠাৎ ক্যাপটেন ফ্র্যাঙ্কলিন এইচ গ্রাহাম এসে স্যালিউট করে দাঁড়ালো।

—স্যার, মেসেজ—

খেতে খেতেই প্রেসিডেণ্ট চোখ তুললেন—কী মেসেজ?

ক্যাপটেন মেসেজটা সামনে রেখে দিলে। প্রেসিডেণ্ট পড়লেন—'Big bomb on Hirosima, August five at seven fifteen p.m Washington time First reports indicate complete success'

সিধু ওস্তাগর লেনের জানলা বন্ধ, অন্ধকার ঘরের মধ্যে মা-র বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে মেয়ে তখন থর-থর করে কাঁপছে। বললে—মা, আমার বড় ভয় করছে মা—

মা অভয় দিলে—ছিঃ, ভয় কী, ও তো বোমার আওয়াজ, পাড়ার বদমাইস্ ছেলেরা বোমা ফাটাচ্ছে, কালকে যখন তোমার চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলে দেবেন ডাক্তারবাবু, তখন আর ভয় করবে না, তখন আবার তুমি আলো দেখতে পাবে—

—সেই আলোওয়ালা আবার আসবে মা?

—হ্যাঁ, নিশ্চয় আসবে।

প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ডিনার খেতে খেতে হঠাৎ বলে উঠলেন—It is the greatest event in the history of the world

পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে বড় ঘটনা আর কখনও ঘটেনি—

ঠিক সেই সময় ষষ্ঠীতলা রোডে দুটো দলের মধ্যে বোমা মারামারি চলছিল। সেই রাস্তায় চলতে চলতে একটা বোমার টুকরো এসে পড়লো লোকনাথের মাথায়। পড়তেই লোকনাথ সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ওপর পড়ে গেল। মুখ দিয়ে শুধু একটা শব্দ

বেরোল—আঃ—

কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্টের চেয়ে আরো এক বড় প্রেসিডেন্ট তখন আর এক লোকে আর এক জগতে আর এক দৃশ্যের অবতারণা করছেন। সেখানে জীবন নেই, মৃত্যুও নেই, পাপ নেই, পুণ্যও নেই, শান্তি নেই, অশান্তিও নেই।

—প্রভু!

হঠাৎ যেন নৈঃশব্দের সমুদ্রে একটা ছোট বুদবুদ উঠলো।

প্রভু বললেন—এ কে?

কারা যেন পাশে এসে দাঁড়ালো। লোকনাথ চারদিকে তাকিয়ে চেয়ে দেখলে। এ কোথায় এসেছে সে। জীবনের পরপারেও কি জীবন আছে! বুদ্ধির অগোচরেও কি বোধ আছে! তবে এ কোন্ জগৎ। এতদিন সে সমস্ত সাহিত্য মন্থন করে জ্ঞানের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছে মনে করেছিল। ভেবেছিল সে কল্যাণ করতে এসেছে পৃথিবীতে। একদিন কার্তিক রায় যে কর্মের সূত্রপাত করে ভেবেছিলেন তিনি মানুষের কল্যাণ করলেন, লোকনাথ সেই কর্মকে ত্যাগ করেই ভেবেছিল, আরো এক মহত্তর কল্যাণ সে করলো। ভেবেছিল, মানুষকে সে বন্ধন থেকে মুক্তি দিলে। সংসারের সবাই যখন বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির আস্বাদ খুঁজে হয়রাণ হয়ে যাচ্ছে, তখন সে বন্ধনহীনতার মধ্যেই মুক্তির স্বাদ খুঁজতে চেয়েছিল। তাই সে একে একে সমস্ত কিছু পাওয়াকে না-পাওয়া মনে করে সব কিছু ত্যাগ করে পরিত্রাণ পেতে চাইলে। মনে করলে, আরামের মধ্যেই অসম্মান, তাই কাদা বাঁচিয়ে, ময়লা বাঁচিয়ে, ধুলো বাঁচিয়ে না চলে সত্য বাঁচিয়ে, ধর্ম বাঁচিয়ে চলতে চাইলে। তাই সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে তাদেরই সন্ধান করতে চেয়েছিল, যারা প্রবঞ্চিত, যারা পরিত্যক্ত, যারা পরাজিত। সেই প্রবঞ্চিত, পরিত্যক্ত, পরাজিতদের মধ্যেই সে তার আপন সত্তাকে খুঁজে পেয়ে তাদের ভালবাসা, তাদের সুখ, তাদের দুঃখ-কষ্ট-বেদনাকে ভাগ করে ভোগ করতে চেয়েছিল। তাই সে

অন্যের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করে তার আরোগ্যের মধ্যে সর্বস্ব পণ করেছিল, তাই তো সে আড়াই হাজার বছর আগেকার আর একজন মানুষের মতই আবৃত্তি করেছিল :

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং।
ত্বক্‌অস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু॥
অপ্রাপ্য বোধিং বহু কল্প দুর্লভাং।
নৈবাসনাৎ কায়মতঃ চলিষ্যে॥

আমি এই আসনে বসলাম। যতক্ষণ না আমার বোধি লাভ হয়, ততক্ষণ আমার কোনও শান্তি নেই, ততক্ষণ আমার অন্য কোনও কামনা নেই। ততক্ষণ আমার সাধনা বন্ধ হবে না—

—প্রভু! ষষ্ঠীতলা রোড থেকে একে নিয়ে এসেছি। ওখানে দু'দলে মারামারি চলছিল, এ তাদের থামাতে গিয়েছিল, সংঘর্ষ থামাবার জন্যে নিষেধ করতে গিয়েছিল।

সর্বশক্তিমান সব কথাগুলো শুনলেন। আসামীর সমস্ত কুলজী আদ্যোপান্ত পাঠ করে শোনালে একজন। এ বর্ধিষ্ণু বংশের সন্তান, লেখাপড়া জানা সুশিক্ষিত মানুষ, এ অন্য মানুষের ভালো করবার ভান করে নিজেকে প্রবঞ্চিত করছিল—

সর্বশক্তিমান জিজ্ঞেস করলেন—আর কী অপরাধ ?

—আর প্রভু, এই আসামী নিজের ঘরের দেয়ালে যত মহাপুরুষের ছবি ছিল, সবগুলো মেঝের ওপর ফেলে পায়ের জুতো দিয়ে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে।

এবার সর্বশক্তিমান গর্জন করে উঠলেন—কেন ?

লোকনাথ বললে—গুড়িয়ে দিয়েছিলাম, কারণ, তারা মিথ্যে কথা বলেছিল—

—সে কী! আমি যে সেই সব মহাপুরুষদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলাম আমার মহিমা প্রচার করতে। আর আমারই পাঠানো সেই সব সেন্টসদের তুমি পদাঘাত করেছিলে ?

—হ্যাঁ করেছিলাম! আমি স্বীকার করছি, তা করেছিলাম।

—কিন্তু কেন করেছিলে? আমি বুদ্ধদেবকে পাঠিয়েছিলাম, যিশু খৃষ্টকে পাঠিয়েছিলাম, সক্রেটিসকে পাঠিয়েছিলাম, মহম্মদকে পাঠিয়েছিলাম, আমার পাঠানো সেন্ট্‌সদের তুমি বিশ্বাস করতে পারলে না? তুমি তাদের মিথ্যেবাদী বলছো?

—হ্যাঁ বলছি। কারণ, আপনি যেমন বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ, সক্রেটিসকে পাঠিয়েছিলেন, তেমনি আবার তাদের সঙ্গে তিনজন শয়তানকেও পাঠিয়েছিলেন কেন?

—তিনজন শয়তান? তারা কারা?

—কেন, ট্রুম্যান, চার্চিল, স্ট্যালিন। আপনার পাঠানো সেন্টদের তো তারাই সবচেয়ে প্রথমে অসম্মান করেছে। তাদের যত কিছু মহত্ত্ব সব তারা আলকাতরা দিয়ে মুছে দিয়েছে। আমি শুধু ওঁদের ছবির ওপর জুতো মেরেছি, কিন্তু আপনার পাঠানো শয়তানরা সেই সব মহাপুরুষদের আরো চরম অপমান করেছে, তা জানেন?

—সে কী? কী বলছো তুমি?

—হ্যাঁ, আপনি গিয়ে দেখে আসুন হিরোশিমায়। আপনার পাঠানো শয়তান তিনজন কী করেছে। হিরোশিমার সাধারণ গৃহস্থ মানুষ, তারা প্রতিদিনকার জীবনে শুধু দু-বেলা দু-মুঠো ভাত খেয়ে শান্তিতে বাঁচতে চেয়েছিল, তাদের ওপরে তারা কী অত্যাচার করেছে, এ চোখে না দেখলে আপনার বিশ্বাস হবে না। আমারও হতো না, কিন্তু সে-অত্যাচারের নিখুঁত বর্ণনা ওদের দেশের লোকেরাই লিখে গেছে—আসলে ওরা আপনাকেই ব্ল্যাকমেল করেছে।—সে-বই আমি পড়েছি—

সর্বশক্তিমানের চোখে ক্রোধের বহ্নি জ্বলে উঠলো।

অত্যাচার! অসম্মান! অপমান! ব্ল্যাকমেল! কথাগুলো যেন চারদিকে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো। লোকনাথের মনে হলো পৃথিবীর সমস্ত ঘটনাগুলো যেন তার চোখের সামনে আবার ভেসে উঠছে। সে আবার বলতে লাগলো—আর হিরোশিমাই কি ভেবেছেন প্রথম আর শেষ? চেকোশ্লোভাকিয়াতেও কি সেই

একই ব্ল্যাকমেল হয়নি ? ভিয়েৎনামেও কি সেই একই ব্ল্যাকমেল হচ্ছে না ? আর এই যে আমাদের পাশের বাংলাদেশ, এখানেও কি আপনার শয়তানরা আপনার নাম নিয়ে আবার আপনাকে ব্ল্যাকমেল করছে না ? আমি তাদের চেয়ে কি বেশি কিছু অপরাধ করেছি যে, আমাকে আপনি আজ শাস্তি দিতে এখানে ডেকে নিয়ে এসেছেন ? এই হিরোশিমার ঘটনা দেখেই তো জেনারেল আইসেনহাওয়ার বলেছিল—It is something so terrible and destructive that future wars may be impossible. It may blackmail the world into peace.

কিন্তু কই, সেই হিরোশিমার পর কেন আবার সেই ঘটনা ঘটলো চেকোশ্লোভাকিয়াতে, টিবেট্-এ, সুয়েজ ক্যানেলে, ভিয়েৎনামে ? কেন সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে আজ আবার এই পাশের দেশ বাংলাদেশে ? তার জবাব দিন ?

সর্বশক্তিমান ক্রোধে গর-গর করতে লাগলেন।

লোকনাথ তবু থামলো না। তেমনি সুরেই আবার বলতে লাগলো—আর আমি ? আমি কী করেছি, তারও জবাব দিচ্ছি। আপনি কতকগুলো লোককে স্লেভ্ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। তাদের কাউকে পাঠিয়েছিলেন কেরানী করে, কাউকে টাইপিস্ট করে, আবার কাউকে বা পিওন করে। তারা কেউ পেত আশি টাকা, কেউ দেড়শো, কেউ আড়াইশো, কেউ বা তিন-শো টাকা। সেই টাকা পেয়েই হয়ত তারা তাদের জীবন কাটিয়ে দিত। আমি যে তাদের সবাইকে মালিক করে দিয়েছি ! তার বেলায় ? আমার কোম্পানির ফিফটিওয়ান পার্সেণ্ট শেয়ার আমি ওয়ার্কারদের সবাইকে বিনা পয়সায় বিলিয়ে দিয়েছি ! এখন তো তারাই সেই ফ্যাক্টরির মালিক। কই, সে-জন্যে তো আমি আপনার কাছ থেকে কোনও বাহবাও চাইছি না। আর আপনি যে বিজ্ঞান সৃষ্টি করেছেন, সে কি মানুষের ভালোর জন্যে, না মানুষের সর্বনাশের জন্যে ? আমি একটা অন্ধ মেয়ের চোখে আলো দিতে

চেয়েছিলাম। আমার নিজের মস্ত বাড়িটা আমি সস্তায় বেচে দিয়ে সেই টাকায় বিদেশী ডাক্তার দিয়ে তার চোখ অপারেশন করিয়েছিলাম। কিন্তু তার চোখ তো কই সারলো না। সে যে আরো অন্ধ হয়ে গেল! আগে তার চোখে ঝাপসা আলো ধরা পড়তো, এখন যে আর তাও ধরা পড়ে না। এখন যে সে তার আলোওয়ালাকেও আর দেখতে পায় না। এখনও যে সে তার জানালার ধারে বসে থাকে তার আলোওয়ালার জন্যে, আলোওয়ালাও আসে, কিন্তু তবু সে তা জানতে পারে না কেন? কেন সে আরো অন্ধ হয়ে গেল? এও কি আমার অপরাধ? আপনার পাঠানো শয়তানরা যে-পাপ করলো, তার শাস্তি ভোগ করবো আমি আর আমার মত পৃথিবীর যত সাধারণ লোক? এই-ই কি আপনার বিধান? এই-ই কি আপনার জাস্টিস? এরই নাম কি ডিভাইন জাস্টিস?

আর থাকতে পারলেন না সর্বশক্তিমান। হঠাৎ রোষে ক্ষোভে তীব্র গর্জন করে উঠলেন। সেই গর্জনে যেন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থর-থর করে কেঁপে উঠলো।

—থামো!

লোকনাথও গর্জন করে উঠলো। বললে—কেন থামবো? আমি কী করেছি যে আমি থামবো? কী আমার অপরাধ?

সর্বশক্তিমান বললেন—কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ সে-বিচার করবে ইতিহাস। আমি পাঠিয়েছি সেন্টদের, আবার আমিই পাঠিয়েছি শয়তানদের—

লোকনাথ কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে উঠলো। বললে—ওসব বুর্জোয়া যুক্তি আমি শুনতে চাই না—

—তোমাকে শুনতে হবে।

—না, আমি শুনবো না।

—শোন।

লোকনাথকে চারপাশ থেকে ক'জন এসে চেপে ধরলো। আর

সে নড়তে পারলে না।

—তোমার সবচেয়ে বড় অপরাধ তুমি আস্থা হারিয়েছ!

—কার ওপর আস্থা? কীসের ওপর আস্থা?

—তোমার বাবার ওপর, তোমার মার ওপর, তোমার অতীতের ওপর, তোমার বর্তমানের ওপর, তোমার ভবিষ্যতের ওপর, তোমার দেশের ওপর, তোমার জাতির ওপর, তোমার সমাজের ওপর, তোমার সংস্কৃতির ওপর, আর সবচেয়ে বড় কথা তুমি আস্থা হারিয়েছ তোমার নিজের ওপর—

—আস্থা যদি হারিয়েই থাকি তো তার জন্যে কি আমি দায়ী?

—হ্যাঁ, তুমিই দায়ী, আমার এই বিরাট বিশ্বসৃষ্টি, আমার নিজের হাতে তৈরি এই বিরাট পাণ্ডুলিপি, এর শেষ পৃষ্ঠায় আমি সব কিছু বিধান লিখে রেখেছি, তা দেখবার আগে তুমি আমার বিচার করবার কে?

তারপর হঠাৎ যেন বায়ুমণ্ডলে একটা ঝড়ের সৃষ্টি হলো। সেই ঝড়ে দ্যুলোক-ভূলোক সমস্ত তোলপাড় হয়ে গেল। সর্বশক্তিমান চিৎকার করে উঠলেন—যাও—দূর হও—

তখনও হাওড়া স্টেশনে ট্রেন পৌঁছতে দেরি আছে। মনে বড় অশান্তি হতে লাগলো। শেষ পৃষ্ঠাটা পাওয়া গেল না। শেষ পৃষ্ঠাটা পাওয়া গেলে হয়ত সঠিক জানা যেত। কিন্তু সঠিক সংবাদই বা কাকে জিজ্ঞেস করবো?

আমি অনেক দিন গাড়িতে যেতে যেতে দেখেছি, লোকনাথ কখনও বড় রাস্তা আবার কখনও বা গলি দিয়ে কাঁধে ঝোলা নিয়ে আপন মনে চলেছে। অনেকবার তাকে জোর করে গাড়িতে উঠিয়েছি। অনেকবারই আবার ওঠেনি। উঠতে চায়নি। বলেছে—

দূর, আমি হেঁটেই যেতে পারবো।

এমনি করে হাঁটতে হাঁটতে কখনও যেত খিদিরপুরে মনসাতলা লেনের একটা মেসে। সেখানে সে মেলা-মেশা করতো সাধারণ রেলের কেরানীদের সঙ্গে। আবার কখনও যাদুগোপালের তেলেভাজার দোকানে। আবার কখনও বেলগাছিয়ার নিমাই শা'র চায়ের দোকানে। আবার কখনও বরানগরের সিধু ওস্তাগর লেনের একতলা বাড়িতে। তাকে অনেকবার বলেছি, আজকালকার দিনে এমনভাবে রাস্তায় রাস্তায় একলা একলা ঘোরা ঠিক নয়। কিন্তু কে কার কথা শুনছে। শুধু আমি নই, বিকাশও অনেকবার বলেছে। আর শুধু আমরাই নয়, তার দিদিমাও বলেছে।

হঠাৎ কোন্নগরে এসে ট্রেনটা থেমে গেল।

আমরা ক'জন যাত্রী এদিক-ওদিক দেখতে লাগলাম। একজন ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে বাইরে গিয়ে কাকে যেন জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপারটা কী মশাই!

যা খবর তিনি সংগ্রহ করলেন, তা ভেতরে এসে আমাদের জানালেন।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম—কিছু জানতে পারলেন?

ভদ্রলোক বললেন—সর্বনাশ হয়েছে মশাই। বালি স্টেশনে ফায়ারিং চলছে। মিলিটারি এসে কুড়িটা লোককে খুন করে একেবারে শেষ করে দিয়েছে।

আমরা জিজ্ঞেস করলাম—কী হয়েছিল?

ভদ্রলোক বললেন—কী জানি, কী হয়েছে। আর হবেই বা কী মশাই, কলকাতায় রোজ যা হয় তাই হয়েছে। যত সব হামলাবাজি—

—তা ট্রেন কখন যাবে?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন—সে কেবল ভগবান বলতে পারে মশাই, মাথার ওপরে যে ভগবান থাকে, সেই ভগবান—

আমরা আর কী করবো। সবাই দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে

রইলাম। কিন্তু আমার মনে হলো, ট্রেন না-ই বা চললো। ক্ষতি কী! আজ যদি ট্রেন এই কোন্নগরে পড়েই থাকে, তাহলেই বা কী ক্ষতি! সব জিনিসেরই কি শেষ থাকতে হবে। পথের তো কই শেষ নেই। শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে? জীবনেরই কি শেষ আছে? মৃত্যুরও তো শেষ নেই। যেমন জীবনের পর ইহজীবন, তারপর মহাজীবন, তেমনি। থিসিস থেকে অ্যান্টিথিসিস, অ্যান্টিথিসিস থেকে সিন্‌থিসিস। এই তো সাইকল্‌। সার্কেল। বৃত্ত। বৃত্তেরও তো শেষ থাকে না। কেন আমি মিছিমিছি শেষ পৃষ্ঠার জন্যে হাঁকপাঁক করছি! মন্দিরের দেবতাকে দর্শন করতে হলে অবশ্য প্রথম ধাপ থেকে এক দুই করে সিঁড়ি ভেঙে শেষ ধাপে পৌঁছাতে হয়। কিন্তু শিল্পের দেবতা? তার বেলায় আর সে-নিয়ম নেই। বলতে গেলে কোনও নিয়ম-কানুনই তার নেই। তুমি মাঝপথ থেকে আরম্ভ করতে পারো, আবার আরম্ভ করতে পারো শেষ থেকেও। সংবাদপত্রের পক্ষে শেষ পৃষ্ঠা যতখানি সত্য, জীবন-শিল্পের পক্ষে শেষ পৃষ্ঠা ঠিক ততখানিই মিথ্যে। শিল্পের দেবতা বলে—আরম্ভের আগেও যেমন আরম্ভ আছে, শেষের পরেও তেমনি আছে শেষ। অর্থাৎ আরম্ভটাও আরম্ভ নয়, শেষটাও শেষ নয়—শুধু মাঝখানের এই জীবনটাই এক মহা-শিল্পকর্ম। এ-কথা তো আমি আমার আর একটা কাহিনীতেও লিখেছি। আর আমাদের এই লোকনাথই তো সেই জীবন-শিল্পী।

আজ এতদিন পরে তাই ভাবছি : কোথায় গেল সেই লোকনাথ! সেই লোকনাথ রায়! যে লোকনাথের সঙ্গে আমরা এক ক্লাশে পড়েছি! আর যাদুগোপাল! সেই যাদুগোপালও তো আর সে-রকম যাদুগোপাল নেই। সেই তেলেভাজার দোকানও আর সেই তেলেভাজার দোকান নেই আগেকার মত। সে দোকানের ভেতরে এখন চোলাই মদ বিক্রি হয়। ভেতরে ঢুকে লুকিয়ে লুকিয়ে চোলাই মদ খাবার জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। আর মনসাতলা লেনের মেস? সেখানে বাবুদের রেসের ঘোড়া নিয়ে রিসার্চ চলে

রাত এগারোটা বারোটা পর্যন্ত। আর নিমাই শা। নিমাই শা দোকানটাকে আরো বাড়িয়েছে। কোথা থেকে ছেলেরা আর মেয়েরা এসে জোড়ায়-জোড়ায় তার ভেতরে ঢোকে, আর সামনে থেকে পর্দা ঢাকা দিয়ে দেয়। আর সিঁথিতে? সিঁথিতে অনেক রাত করে একটা বিরাট গাড়ি আসে আর গাড়ি থেকে টলতে টলতে নামে সরযূ। সরযূ সিকদার। বাড়ির ভেতরে পৌঁছলেই বাপ বিপিন সিকদার মেয়ের মাথায় বালতি বালতি জল ঢালে নেশা ভাঙাবার জন্যে।

এ সব ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক।

কিন্তু সব চেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে সিধু ওস্তাগর লেনের একতলা বাড়িটার জানলার ধারে। সেখানে রোজকার মত ছাপরা জেলার কালিকাপ্রসাদ ঝা এসে মই লাগিয়ে ল্যাম্প-পোস্টের মাথায় ওঠে। দেশলাই কাঠি দিয়ে আলোটা জ্বেলে দিতেই জায়গাটা আলোয় আলোয় আলোময় হয়ে যায়। কিন্তু জানলার ধারে বসে বকুল কিছুই দেখতে পায় না। তার চোখে এখন সব ঝাপ্‌সা, সব অন্ধকার। সে রোজই সন্ধ্যেবেলা জানলার ধারে তেমনি করে বসে থাকে। তেমনি করে আলোওয়ালার জন্যে প্রতীক্ষা করে। ঠিক আগেকার মত রোজ তার মা তাকে সেখানে বসিয়ে রেখে দিয়ে যায়। কিন্তু কখন আলোওয়ালা আসে, কখন আলোওয়ালা এসে আলো জ্বেলে দিয়ে যায়, কিছুই সে টের পায় না। তার চোখে আগে যে-টুকু আলো ছিল, তাও কেড়ে নিয়ে গেছে আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতা। তার চোখ থেকে আলোর শেষ-বিন্দুটি পর্য্যন্ত মুছে দিয়ে তাকে যেন নিষ্প্রাণ করে ফেলে রেখে গেছে। কিন্তু তার আলোর পিপাসা সে কেড়ে নিতে পারেনি। তাই বকুল মা'কে কেবল জিজ্ঞেস করে—আলোওয়ালা এলো না কেন মা, আলোওয়ালা কখন আসবে?